কাকে বলে ইতিহাস ?

কাকে বলে ইতিহাস?

ই এইচ কার

দ্বিতীয় সংস্করণ

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

অনুবাদ : স্নেহোৎপল দত্ত   সৌমিত্র পালিত

সম্পাদনা বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

কনক বাগচী কর্তৃক কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
থেকে প্রকাশিত ও ফটো টাইপ এন্টারপ্রাইজ ৩০, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ও অফসেট প্রসেস ৬/৩ এন সি ঘোষ লেন হাওড়া ৭১১ ৬০১ থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

আমার প্রায়ই ভাবতে অদ্ভুত লাগে
যে বিষয়টি এত নীরস হবে,
কারণ এর অনেকটাই
নিশ্চয়ই মন-গড়া।

ইতিহাস প্রসঙ্গে ক্যাথরিন মোরল্যান্ড
('নর্দাঙ্গার অ্যাবি', অধ্যায় ১৪)

পারিভাষিক শব্দসূচি

অতিপ্রত্যয়, অতিপ্রত্যয়ী	fanaticism, fanatic
অনুভাবন	persuation
অধিক্রান্ত	superseded
অনাস্থাবাদ, অনাস্থাবাদী	cynicism, cynic
অনুশোধিত	modified
অন্তরের বাধা	inhibition
অবতারবাদ	messianism
অভিজ্ঞতাবাদ	empiricism
অভিপ্রেরণা	motive
আরোহ	induction
উপনিমিত্ত	factor
একরূপতা	uniformity
একান্তর	reciprocal
কল্পরাজ্য	utopia
ক্রমিকবাদ	gradualism
গঠনমূলবাদ	structuralism
ঘরানা	school
তথাভিহিত	alleged
দীপায়ন	enlightenment
নির্বিকল্প / চূড়ান্ত / ধ্রুবক	absolute
নিয়মানুগ, নিয়মানুগতা	regular, regularity
পরিচলন / সঞ্চলন	transmission
পরিণতিবাদ, পরিণতিমূলক	teleology, teleological
পরিনির্বাণতত্ত্ব	eschatology
পরিমার্গ	approach
পরোৎকর্ষ	perfection
পূর্বধারণা	assumption
পূর্বানুমান	presupposition
প্রকরণ, প্রাকরণিক	technique, technical
প্রতিদান	output

প্রতিরূপ / নমুনা	model
প্রত্যক্ষবাদ	positivism
প্রদান	input
প্রয়োগবাদ	pragmatism
বিপর্যাস	solecism
বিপ্রবণ, বিপ্রবণতা	heretic, heresy
বিলয় / অবনতি	decline
বিষয়নিষ্ঠ, বিষয়নিষ্ঠা	objective, objectivity
বিষয়ীনিষ্ঠ, বিষয়ীনিষ্ঠা	subjective, subjectivity
মননদৃষ্টি	vision
রিক্ত শব্দগুচ্ছ	cliche
শিরোমণি, শিরোমণিতন্ত্র	elite, elitism
সংঘটন	phenomenon
সংসাধিত	processed
সমভার	balanced
সমরূপতা	conformity
সর্বজনতন্ত্র	universalism
সাদৃশ্য-অনুমান	analogy
স্বসংবেদনবাদ	solipsism
স্মৃতিকাতরতা	nostalgia

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমি যখন আমার 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এর ছ-টি বক্তৃতার প্রথম খসড়া শেষ করেছিলুম, পশ্চিমী জগৎ তখনও দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও দুটি প্রধান বিপ্লব, রুশ ও চীনের, অভিঘাতে টলমল করছিল। অবোধ আত্মবিশ্বাস ও প্রগতিতে স্বতঃসিদ্ধ আস্থার ভিক্টোরীয় যুগ পড়ে ছিল অনেক পেছনে। পৃথিবী ছিল এক অস্থির, এমনকি ভয়াবহ জায়গা। তাহলেও, আমরা যে আমাদের কিছু কিছু সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছি — তার নানান লক্ষণ জড়ো হতে শুরু করেছিল। যুদ্ধের পরিণাম হিসেবে যে বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক সঙ্কটের ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল, তা ঘটে নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আমরা নিঃশব্দে ভেঙে দিয়েছি, প্রায় খেয়াল না করেই। হাঙ্গেরি ও সুয়েজ-এর সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা বা তার তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া গিয়েছিল। সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টালিন- ও ম্যাকার্থি-উচ্ছেদের প্রক্রিয়া এগোচ্ছিল প্রশংসনীয়ভাবে। ১৯৪৫-এর সর্বাত্মক ধ্বংসকে দ্রুত সামলে উঠেছিল জার্মানি ও জাপান, ঘটাচ্ছিল চমকপ্রদ আর্থনীতিক অগ্রগতি। দ্য গল-এর অধীনে ফ্রান্স নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করছিল। যুক্তরাষ্ট্রে আইজেনহাওয়ার-আঁধি শেষ হয়ে এসেছিল; আশাময় কেনেডি যুগের ঊষা ছিল আসন্ন। বিভিন্ন কলঙ্কিত জায়গা — দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যান্ড, ভিয়েতনাম — তখনও দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে ফেঁপে উঠছিল ফাটকা বাজার।

ভবিষ্যতের প্রতি যে আশাবাদ ও বিশ্বাস নিয়ে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করেছিলুম তার পক্ষে ওপরে বর্ণিত এইসব পরিস্থিতি অন্তত আপাত-যৌক্তিকতার জোগান দিয়েছিল। এর পরের কুড়ি বছরে এইসব আশা ও এই সন্তুষ্টি ব্যর্থ হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে দ্বিগুণ তীব্রতা নিয়ে। তার সঙ্গে এসেছে নিউক্লীয় বিলুপ্তির শঙ্কা। শিল্পনির্ভর দেশগুলোকে তছনছ করে ও সমস্ত পশ্চিমী সমাজ জুড়ে বেকারির ক্যান্সার ছড়িয়ে দিয়ে বিলম্বিত আর্থনীতিক সঙ্কট দ্বিগুণ প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। হিংসা ও সন্ত্রাসবাদের বৈরিতা থেকে প্রায় কোনো দেশই মুক্ত নয়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল-উৎপাদনকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদ্রোহ পশ্চিমী

শিল্পনির্ভর জাতিগুলির প্রতিকূলে ক্ষমতার এক তাৎপর্যপূর্ণ মোড় নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহে 'তৃতীয় বিশ্ব' পরিণত হয়েছে নিষ্ক্রিয় থেকে এক ইতিবাচক ও উদ্বেগজনক উপাদানে। এইসব পরিস্থিতিতে আশাবাদের যে-কোনো অভিব্যক্তিই মনে হয় নিরর্থক। সবকিছুই আছে দুর্দশার প্রবক্তাদের সমর্থনে। চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী লেখক ও সাংবাদিকদের খেটেখুটে তৈরি-করা ও প্রচারমাধ্যম দিয়ে প্রসারিত আসন্ন বিপর্যয়ের ছবি প্রাত্যহিক কথাবার্তায় ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারের মধ্যে ঢুকে গেছে। বিশ্বের অবসান সংক্রান্ত এককালের জনপ্রিয় ভবিষ্যদ্‌বাণী আর কোনো শতকেই এত উপযুক্ত মনে হয় নি।

তবুও এই পর্যায়ে সাধারণ বোধ থেকে দুটি প্রধান আপত্তি উঠে আসে। প্রথমত, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যের এই লক্ষণনির্ণয় অকাট্য তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হলেও তা একটি বিমূর্ত তাত্ত্বিক কাঠামো। জনগণের বৃহত্তম অংশের তাতে কোনো বিশ্বাসই নেই এবং তাদের আচরণেই তা প্রমাণিত। লোকে প্রচুর নিষ্ঠা সহকারে প্রেম করে, গর্ভধারণ করে, সন্তানদের জন্ম দেয় ও মানুষ করে, ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ওপর প্রচণ্ড মনোযোগ দেওয়া হয় যাতে পরবর্তী প্রজন্মের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। সবসময়ই খোঁজা হয় নতুন নতুন শক্তির উৎস। নতুন নতুন আবিষ্কার বাড়িয়ে দেয় উৎপাদনের দক্ষতা। ঝাঁকে ঝাঁকে 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীরা' জাতীয় সঞ্চয়পত্র, গৃহনির্মাণ প্রকল্প ও ইউনিট ট্রাস্ট-এ বিনিয়োগ করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকারের জন্য প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পের উত্তরাধিকার সংরক্ষণে দেখানো হয় ব্যাপক উৎসাহ। এমন সিদ্ধান্ত করতে লোভ হয় যে, নিকট ধ্বংসে বিশ্বাস একদল অসন্তুষ্ট বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ যাঁরা চল্‌তি প্রচারে সবচেয়ে বড় অংশের জন্য দায়ী।

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সংক্রান্ত এইসব ভবিষ্যদ্‌বাণী নিয়ে আমার দ্বিতীয় আপত্তি এগুলোর ভৌগোলিক উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এইসব ভবিষ্যদ্‌বাণী বেরিয়ে আসে প্রধানত — আমার বলতে লোভ হয় যে একান্তভাবেই — পশ্চিম ইওরোপ ও তার সাগরপারের শাখা-প্রশাখা থেকে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পাঁচ শতক জুড়ে এইসব দেশ ছিল পৃথিবীর অবিসংবাদী প্রভু। বাইরের পৃথিবীর বর্বর অন্ধকারের মধ্যে সভ্যতার আলোকের প্রতিনিধিত্ব করার খানিক যুক্তিগ্রাহ্য দাবি তারা করতে পারে। যে-যুগ এই দাবিকে ক্রমেই আরও বেশি করে প্রতিস্পর্ধা জানায় ও খারিজ করে তা নিশ্চয়ই গড়ে তোলে বিপর্যয়। আর একইভাবে এই অস্থিরতার উৎসস্থল ও গভীরতম মননগত নৈরাশ্যবাদের অবস্থান যে

ব্রিটেনেই পাওয়া যায় তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, উনিশ শতকের জাঁকজমক ও বিশ-শতকীয় বিবর্ণতা এবং উনিশ শতকীয় আধিপত্য ও বিশ শতকীয় হীনতার মধ্যে বৈপরীত্য আর কোথাওই এত লক্ষণীয় ও এত বেদনাদায়ক নয়। এই মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম ইওরোপে ও — বোধহয় খানিকটা কম পরিমাণে — উত্তর আমেরিকায়। উনিশ শতকের বিশাল বিস্তারবাদী যুগে এইসব দেশই যোগ দিয়েছিল সক্রিয়ভাবে। কিন্তু আমার এমন সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই যে এই মনোভাব ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও। একদিকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক খাড়া করা ও অন্যদিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রচারের নিরবিচ্ছিন্ন স্রোত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মূল্যায়নকে দুঃসাধ্য করে তোলে। কিন্তু যে-দেশে জনগণের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সচেতন যে তাঁদের এখন যত অভিযোগই থাকুক না কেন, পঁচিশ, পঞ্চাশ বা একশ বছর আগের চেয়ে অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে, সেখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে এক ব্যাপক হতাশা গেড়ে বসেছে — এমন কথা প্রায় কেউই বিশ্বাস করবেন না। এশিয়ার জাপান ও চীন — এই দুটি দেশই তাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা উপায়ে এমন এক অবস্থানে রয়েছে যার দৃষ্টি অগ্রমুখী। মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকায়, এমনকি যেসব অঞ্চল উপদ্রুত অবস্থায় রয়েছে সেখানেও, বিভিন্ন উত্থানশীল জাতি এক ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছে, যে-ভবিষ্যতে তারা, যত অন্ধভাবেই হোক না কেন, বিশ্বাস করে।

আমার সিদ্ধান্ত : বর্তমান সংশয়বাদ ও হতাশার ঢেউ যা সামনে ধ্বংস ও ক্ষয় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না এবং প্রগতিতে বিশ্বাস ও মানবজাতির আরও অগ্রগতির সম্ভাবনাকে অর্থহীন বলে খারিজ করে দেয় তা একধরনের শিরোমণিতন্ত্র — নানান শিরোমণি সামাজিক গোষ্ঠী যাদের নিরাপত্তা ও সুযোগসুবিধে এই সঙ্কটের ফলে সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুটভাবে ক্ষয়ে গেছে এবং সেইসব শিরোমণিস্থানীয় দেশ বাকি পৃথিবীর ওপর যাদের এককালের অবিসংবাদী প্রভুত্ব চুরমার হয়ে গেছে — তারাই এই মনোভাব তৈরি করেছে। বুদ্ধিজীবীরাই এই আন্দোলনের প্রধান ধ্বজাধারী, ক্ষমতাসীন সামাজিক গোষ্ঠীর তাঁরা সেবা করেন, তার ধ্যানধারণার জোগানদার তাঁরাই ('কোনো সমাজের ধ্যানধারণা তার শাসক শ্রেণীরই ধ্যানধারণা')। এইসব বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কেউ কেউ আদতে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারেন — কিন্তু সে-কথা অপ্রাসঙ্গিক; কারণ, বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তাঁরা অবধারিতভাবেই বুদ্ধিজীবী-শিরোমণিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। বুদ্ধিজীবীরা সংজ্ঞাগতভাবেই গড়ে তোলেন একটি শিরোমণি গোষ্ঠী।

যা-ই হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে যা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, সমাজের সব গোষ্ঠীই, তারা যতই সংহত হোক না কেন (এবং ঐতিহাসিকের পক্ষে তাদের ঐভাবে বিবেচনা করা প্রায়শই যুক্তিযুক্ত), কিছু সংখ্যক খাপছাড়া লোক বা বিক্ষুব্ধের জন্ম দেয়। এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রবল। সমাজের প্রধান প্রধান পূর্বধারণাকে সাধারণভাবে মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে ধরাবাঁধা তর্কাতর্কি হয় আমি এখানে তার কথা বলছি না, বরং বলছি এইসব পূর্বধারণার প্রতি যে প্রতিস্পর্ধা জানানো হয় তার কথা। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক সমাজে এই ধরনের প্রতিস্পর্ধাকে ততক্ষণই সহ্য করা হয় যতক্ষণ সেগুলি মুষ্টিমেয় বিক্ষুব্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং যাঁরা এগুলিকে হাজির করেন তাঁরা পাঠক ও শ্রোতা পেয়ে যান। অনাস্থাবাদীরা বলতে পারেন, এঁদের সহ্য করা হয় কারণ এঁরা বিপজ্জনক হয়ে ওঠার মতো বেশিসংখ্যক বা যথেষ্ট প্রভাবশালী নন। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি 'বুদ্ধিজীবী'র তক্‌মা বয়ে চলেছি; আর সাম্প্রতিককালে আমি ক্রমেই বেশি করে নিজেকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে দেখছি ও আমাকে সেভাবেই দেখা হচ্ছে। এর একটা সহজলভ্য ব্যাখ্যা আছে। আমি নিশ্চয়ই এখনও লেখালিখির কাজে রত সেই খুব অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের একজন যাঁরা বড় হয়ে উঠেছেন ভিক্টোরীয় যুগের আস্থা ও আশাবাদের প্রখর দিবালোকে নয়, বরং তার পড়ন্ত আলোয়, এবং এমনকি আজও আমার পক্ষে পৃথিবীকে চিরস্থায়ী ও উদ্ধারহীন অধঃপাতের নিরিখে ভাবা কঠিন। আজকের পৃথিবী, বিশেষ করে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রচলিত ধারা থেকে আমি পরবর্তী পাতাগুলোয় দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করব ও সেইসঙ্গে দেখব কীভাবে ও কেন আমি মনে করি তাঁরা বিপথে গেছেন। আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, যদি আশাবাদী না-ও হয়, তবুও অন্তত আরও সুস্থ ও আরও সমভার দৃষ্টিভঙ্গির দাবি হাজির করব।

ই এইচ কার

ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্য

কাকে বলে ইতিহাস? কেউ যাতে এই প্রশ্নটি অর্থহীন বা অবান্তর না মনে করেন সেইজন্য 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস' (কেমব্রিজ মডার্ন হিস্‌ট্রি)-এর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত দুটি অংশ আমি আমার আলোচ্য বিষয় হিসেবে বেছে নেব। অ্যাক্টন যে-কাজ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে-বিষয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস-এর পরিচালন সমিতির কাছে অক্টোবর ১৮৯৬-এ এই ছিল তাঁর প্রতিবেদন :

'উনিশ শতকের কাছ থেকে আমরা যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে চলেছি তাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে সবচেয়ে উপযুক্তভাবে নথিবদ্ধ করার এ এক অনন্য সুযোগ। ... বিচক্ষণভাবে শ্রম ভাগ করে আমরা এই কাজটি শেষ করতে পারব ; আর প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেব সর্বশেষ দলিল ও আন্তর্জাতিক গবেষণার সবচেয়ে পরিণত সিদ্ধান্ত।

চূড়ান্ত ইতিহাস এই প্রজন্মে আমরা পাব না; কিন্তু প্রথাগত ইতিহাসকে বাতিল করতে পারব, আর এখন যেহেতু সব তথ্যই আয়ত্তের মধ্যে ও প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান করা যায়, ফলে পথ থেকে পথান্তরে যাওয়ার যে পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি তা দেখাতে পারব।'[১]

অ্যাক্টন ও তাঁর সহযোগীদের এই যে বিশ্বাস — একদিন 'চূড়ান্ত ইতিহাস' লেখা সম্ভব হবে — এর ওপর মন্তব্য করেছিলেন অধ্যাপক সার জর্জ ক্লার্ক প্রায় ঠিক ষাট বছর পরে, দ্বিতীয় 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস'-এর জন্য তাঁর লেখা সাধারণ ভূমিকায়। তিনি বলেন :

'পরবর্তী প্রজন্মের ঐতিহাসিকরা এই ধরনের কোনো সম্ভাবনার প্রত্যাশা করেন না। তাঁরা আশা করেন, তাঁদের লেখা বারবারই অতিক্রান্ত হবে, তাঁরা মনে করেন, অতীতের জ্ঞান এসে পৌঁছেছে এক বা একাধিক মানবমনের মধ্যে দিয়ে ও তাদের মাধ্যমে 'সংসাধিত' হয়েছে। ফলে, এই

১ 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস: উৎপত্তি, রচনা ও প্রস্তুতি' (দ কেমব্রিজ মডার্ন হিস্‌ট্রি: ইট্‌স্‌ অরিজিন, অথরশিপ অ্যান্ড প্রোডাকশন), ১৯০৭, পৃ ১০-১২।

জ্ঞান এমন কোনো মৌল ও নৈর্ব্যক্তিক পরমাণু দিয়ে গঠিত হতে পারে না যা একেবারেই অপরিবর্তনীয়। ... এই বিষয়ের সন্ধান মনে হয় অন্তহীন এবং কিছু অধীর পণ্ডিত আশ্রয় নেন সংশয়বাদের, বা অন্তত এই ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন যে, যেহেতু ইতিহাসের সবরকম বিচারের সঙ্গেই ব্যক্তি ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত, তার যে-কোনো একটিই অপরটির মতোই সমান ভালো আর 'বিষয়নিষ্ঠ' ঐতিহাসিক সত্য বলে কিছু নেই।"[২]

যেখানে পণ্ডিতদের পরস্পরের মধ্যে এত ভয়ানক বিরোধ সেখানে অনুসন্ধানের খোলা মাঠ পড়ে থাকে। ১৮৯০-এর দশকে লেখা সবকিছুই অর্থহীন হবে — একথা মেনে নেওয়ার পক্ষে আশা করি আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে যা কিছু লেখা হয়েছে তা অবশ্যই অর্থপূর্ণ — এইরকম মতে দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়ার মতো যথেষ্ট অগ্রগতি আমার এখনও হয় নি। আপনাদের নিঃসন্দেহে আগেই মনে হয়েছে যে এই বিচার-বিবেচনা ইতিহাসের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেয়ে আরও বিশদ কিছুর দিকে চলে যেতে পারে। অ্যাক্টন ও সার জর্জ ক্লার্ক-এর মধ্যে সংঘর্ষ হলো তাঁদের দুজনের মত প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে সমাজ সম্পর্কে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির যে-পরিবর্তন ঘটেছে তারই প্রতিফলন। অ্যাক্টন কথা বলেন ইতিবাচক বিশ্বাস থেকে, অর্থাৎ ভিক্টোরীয় যুগের শেষ পর্যায়ের নির্মল আত্মবিশ্বাস; আর এক পরাস্ত প্রজন্মের বিমূঢ়তা ও দিশাহারা সংশয়বাদ প্রতিধ্বনিত হয় সার জর্জ ক্লার্ক-এর কথায়। 'কাকে বলে ইতিহাস ?' — আমরা যখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি তখন সেই উত্তর সচেতন বা অচেতনভাবে এই সময়ে আমাদের নিজস্ব অবস্থানের প্রতিফলন হয়ে দাঁড়ায় এবং যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজ সম্পর্কে আমরা কী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি — এই ব্যাপকতর প্রশ্নটির উত্তরের অংশ হয়ে ওঠে। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে আমার বিষয়টি যে তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে সে সম্পর্কে আমার কোনো আশঙ্কা নেই। আমার আশঙ্কার একমাত্র কারণ: এত বিশাল ও এত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা আমার পক্ষে যেন অনধিকার চর্চা বলে না মনে হয়।

তথ্যের দিক থেকে উনিশ শতক ছিল এক মহান যুগ। 'কঠিন সময়' (হার্ড টাইমস্) উপন্যাসে গ্র্যাডগ্রিন্ড বলেছিলেন, 'আমি যা চাই তা হলো তথ্য। ... জীবনে শুধু তথ্যই চাই। উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা মোটের উপর তাঁর

২ 'নতুন কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস' (দ নিউ কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রি), খণ্ড ১, ১৯৫৭, পৃ (২৪)-(২৫)।

সঙ্গে একমত ছিলেন। ইতিহাসকে নৈতিক রূপ দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ হিসেবে ১৮৯০-এর দশকে রাঙ্কে মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, 'আসলে কীরকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো'। এই আপ্তবাক্যটি — যা খুব একটা সুগভীর নয় — অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। এই যাদুময় শব্দগুচ্ছকে বীজমন্ত্রের মতো নিয়ে তার ধুয়ো তুলে লড়াই-এ এগিয়ে গিয়েছিলেন তিন প্রজন্মের জার্মান, ব্রিটিশ ও এমনকি ফরাসি ঐতিহাসিকরা। আর যে কোনো বীজমন্ত্রের মতো এটিও তৈরি হয়েছিল নিজে চিন্তা করার ক্লান্তিকর বাধ্যবাধকতা থেকে বাঁচার তাগিদে। ইতিহাসকে বিজ্ঞান-রূপে দেখার দাবিদার ছিলেন প্রত্যক্ষবাদীরা। সে-দাবি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁরা এই তথ্যসাধনায় যোগ করেছিলেন তাঁদের প্রভাবের ভার। প্রত্যক্ষবাদীরা বললেন : প্রথম কাজ, তথ্য নির্ণয় করো, তারপর তার থেকে নিজের সিদ্ধান্তে এসো। গ্রেট ব্রিটেনে লক থেকে বারট্রান্ড রাসেল পর্যন্ত অভিজ্ঞতাবাদী ঐতিহ্যের যে প্রভাবশালী ধারা বজায় ছিল তার সঙ্গে ইতিহাস সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি খাপে খাপে মিলে গেল। জ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব প্রথম থেকেই বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে এক সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ধরে নেয়। ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মতো বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষককে বাইরে থেকে আঘাত করে, সেগুলো তার চেতনা-নিরপেক্ষ। গ্রহণের প্রক্রিয়াটি নিষ্ক্রিয় থাকে; উপাত্ত পাওয়ার পরে পর্যবেক্ষক তার ওপর ক্রিয়াশীল হন। অভিজ্ঞতাবাদী ধারার একটি উপযোগী কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রবণ কাজ, 'সংক্ষিপ্ত অক্‌স্‌ফোর্ড ইংরিজি অভিধান' (অক্‌স্‌ফোর্ড শর্টার ইংলিশ ডিক্‌শনারি)-এ এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এখানে তথ্য মানে সিদ্ধান্তের থেকে পুরোপুরি আলাদা অভিজ্ঞতার উপাত্ত। এটিকে বলা যায় ইতিহাসের লোকচলতি দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিহাস মানে যাচাই-করা তথ্যের সংগ্রহ। মেছোর পাটায় মাছের মতো ঐতিহাসিকের কাছে তথ্য আসে দলিল, প্রত্নলেখ ইত্যাদি থেকে। তিনি সেগুলো জড়ো করেন, বাড়ি নিয়ে যান, রান্না করেন এবং তাঁর পছন্দ অনুযায়ী যে-কোনোভাবে পরিবেশন করেন। অ্যাক্টন একেবারেই ভোজনবিলাসী ছিলেন না। ফলে তিনি চেয়েছিলেন সেগুলো সাদামাটাভাবে পরিবেশন করা হোক। প্রথম 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস'-এর লেখকদের জন্য নানান নির্দেশ দেওয়া তাঁর চিঠিতে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের ওয়াটার্লু এমন হতে হবে তা যেন ফরাসি ও ইংরেজ এবং জার্মান ও ওলন্দাজদের সমানভাবে খুশি করতে পারে। লেখকদের তালিকা না-পড়ে কেউ যেন বলতে না-পারেন, কোথায় অক্‌স্‌ফোর্ড-এর বিশপ কলম থামিয়েছিলেন এবং ফেয়ারবের্ন বা গাসকে, লিবেরমান বা হ্যারিসন-এর

মধ্যে কে আবার লেখা শুরু করেছিলেন।[৩] অ্যাক্টন-এর মনোভাব সমালোচনা করলেও এমনকি সার জর্জ ক্লার্ক নিজেই ইতিহাসের 'তথ্যের শক্ত আঁটি'র সঙ্গে তাকে 'ঘিরে তর্কসাপেক্ষ ব্যাখ্যানেও শাঁসে'র[৪] প্রতিতুলনা করেন। শক্ত আঁটির চেয়ে শাঁস যে বেশি উপাদেয় তা বোধহয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। প্রথমে বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে নাও, তারপর নিজের ঝুঁকিতে ব্যাখ্যানের চোরাবালিতে ঝাঁপ দাও — অভিজ্ঞতাবাদী লোকচলতি ইতিহাসের ধারার এই হচ্ছে চূড়ান্ত প্রজ্ঞা। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহান উদারনৈতিক সাংবাদিক সি পি স্কট-এর প্রিয় সূত্রটি মনে পড়ে: 'তথ্য পবিত্র, মতামত মুক্ত।'

কিন্তু স্পষ্টতই এ দিয়ে চলবে না। অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনায় আমি যাব না। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য ধরে নেওয়া যাক সিজার যে রুবিকন পেরিয়েছিলেন — এই তথ্য ও ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল আছে — এই আর-একটি তথ্য। দুটিই সমান ও পরস্পরের সঙ্গে তুলনাযোগ্য এবং দুই তথ্যই আমাদের চেতনায় সমান বা তুল্যভাবে এসে পৌঁছয়। আর, যিনি এগুলো জানেন তাঁর ক্ষেত্রে তথ্যদুটির একইরকম বিষয়নিষ্ঠ চরিত্র আছে। কিন্তু এই জোরালো ও খুব বেশি সম্ভাব্য নয় এমন অনুমানের ক্ষেত্রেও আমাদের বিচারপদ্ধতি সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যায় পড়ে, কারণ অতীতের সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয় বা ঐতিহাসিকরা সেগুলোকে ঐভাবে বিবেচনা করেন না। অতীতের অন্যান্য তথ্য থেকে ইতিহাসের তথ্যকে আলাদা গুরুত্ব করার মাপকাঠি কী?

ঐতিহাসিক তথ্য বলতে কী বোঝায়? এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আরও খুঁটিয়ে দেখতেই হবে। লোকচলতি মতে এমন কিছু মৌলিক তথ্য আছে যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান এবং, বলা যায় যে, সেগুলো ইতিহাসের মেরুদণ্ড তৈরি করে। যেমন, হেস্টিংস-এর যুদ্ধ হয়েছিল ১০৬৬ সালে। এটি একটি তথ্য। কিন্তু এই মতের ওপর দুটি মন্তব্য করা দরকার। প্রথমত, এই ধরনের তথ্য ঐতিহাসিকেব প্রধান বিচার্য বিষয় নয়। ঐ বিরাট যুদ্ধ যে ১০৬৬-তে হয়েছিল, ১০৬৫ বা ১০৬৭-তে নয় এবং তা হয়েছিল হেস্টিংস-এ, ইস্টবুর্ন বা ব্রাইটন-এ নয় — এ কথা জানার অবশ্যই গুরুত্ব

৩ অ্যাক্টন, 'আধুনিক ইতিহাস বিষযক বক্তৃতামালা' (লেকচার্স্ অন মডার্ন হিস্ট্রি), ১৯০৬, পৃ ৩১৮।

৪ 'লিসনার'-এ উদ্‌ধৃত, ১৯ জুন ১৯৫২, পৃ ৯৯২।

আছে। ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই এইসব ব্যাপারে ভুল করবেন না। কিন্তু যখন এই ধরনের বিষয় তোলা হয়, তখন আমার হাউজ্‌ম্যান-এর মন্তব্য মনে পড়ে, 'নির্ভুল হওয়াটা কর্তব্য, কোনো সদ্‌গুণ নয়।'[৫] ঐতিহাসিককে অভ্রান্তির জন্য প্রশংসা করা আর স্থপতিকে তাঁর বাড়ির জন্য ভালো জাতের কাঠ বা কংক্রিটের উপযুক্ত মিশেল ব্যবহারের জন্য প্রশংসা করা একই ব্যাপার। এটি তাঁর কাজের প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু মূল কাজ নয়। ঠিক এইসব বিষয়ের জনাই যেগুলোকে 'ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞান' বলে, ঐতিহাসিক সেগুলোর উপর নির্ভরশীল হওয়ার অধিকারী — প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নলেখবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব, কালানুক্রম ইত্যাদি। মাটির বা মার্বেল পাত্রের টুকরোর উৎপত্তি ও পর্ব নির্ধারণ, কোনো দুর্বোধ্য প্রত্নলেখের পাঠ-উদ্ধার বা কোনো তারিখ সঠিক প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক গণনা — এইসবের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের যে বিশেষ দক্ষতা লাগে তা ঐতিহাসিকের থাকার দরকার নেই। এইসব তথাকথিত ভিত্তিস্থানীয় তথ্য — যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান — সাধারণত ইতিহাসের নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিকের কাঁচা মালের পর্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে, এইসব ভিত্তিস্থানীয় তথ্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন তাদের গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে না, তা বরং ঐতিহাসিকের পূর্বানুমান-জাত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। সি পি স্কট-এর বাণী সত্ত্বেও আজ প্রত্যেক সাংবাদিক জানেন, মতামত প্রভাবিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় · বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস। বলা হতো যে, তথ্য নিজেই কথা বলে। এটি অবশ্যই অসত্য। তথ্যরা একমাত্র তখনই কথা বলে যখন ঐতিহাসিক তাদের ডাক দেন, তিনিই ঠিক করেন কোন্ তথ্যকে তিনি বলতে দেবেন, কোন্ ক্রমে বা কোন্ প্রসঙ্গে। মনে হয়, পিরানদেল্লো-র একটি চরিত্র বলেছিল যে তথ্য হচ্ছে বস্তার মতো — তার মধ্যে কিছু না পোরা অবধি তা দাঁড়াবে না। হেস্টিংস-এ যে ১০৬৬ সালে যুদ্ধ হয়েছিল তা জানায় আমাদের আগ্রহী হওয়ার একমাত্র কারণ : ঐতিহাসিক এটিকে ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজস্ব কারণে সিজার-এর রুবিকন নামে একটি জলধারা পার হওয়াকে ইতিহাসের একটি তথ্য বলে ধরে নিয়েছেন। তার আগে ও পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ঐ রুবিকন পেরিয়েছে তাতে কারও কোনো আগ্রহই নেই। এই

৫ মার্কুস মানিলিউস-এর 'জ্যোতির্বিদ্যা : প্রথম পর্ব' (এম মানিলি আস্ত্রোনোমিকোন: লিবের প্রিমুস), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৭, পৃ ৮৭।

বাড়িতে আপনি যে আধ ঘণ্টা আগে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে অথবা গাড়ি করে এসেছেন এটি ঠিক সিজার-এর রুবিকন পেরোনোর মতোই অতীতের একটি তথ্য। কিন্তু ঐতিহাসিক সম্ভবত এটিকে অগ্রাহ্য করবেন। অধ্যাপক ট্যালকট্ পারসন্স্ একবার বলেছিলেন, বিজ্ঞান হলো 'বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানাত্মক বোধশক্তির নির্বাচনমূলক পদ্ধতি।'[৬] কথাটি বোধহয় আরও সহজভাবে বলা যেত। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসও তা-ই। ঐতিহাসিককে ঘটনা বাছাই করতেই হয়। ইতিহাস-কারের ব্যাখান-নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন ঐতিহাসিক তথ্যের একটি সুকঠিন সারভাগ আছে — এই বিশ্বাস 'উল্টা বুঝলি রামে'র মতোই ভুল, কিন্তু তা দূর করা খুব কঠিন।

অতীত সম্পর্কে একটি সাদামাটা তথ্য কোন্ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের তথ্যে রূপান্তরিত হয় সে-বিষয়ে একটু নজর দেওয়া যাক। ১৮৫০ সালে স্টালিব্রিজ ওয়েক্স্-এ এক তুচ্ছ বিবাদের পরিণামে ক্ষিপ্ত জনতা একজন আদাগুড়ের কেক ফেরিওয়ালাকে লাথি মারতে মারতে ইচ্ছে করে খতম করে দেয়। এটা কি ইতিহাসের তথ্য ? এক বছর আগে আমি নিঃসংশয়ে বলতুম 'না'। এই ঘটনাটিকে একটি অল্পপরিচিত স্মৃতিচারণায় বর্ণনা করেছেন জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী,[৭] কিন্তু কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে উল্লেখের যোগ্য তথ্য বলে এটি স্থির হয়েছে — এমন আমি দেখি নি। গত বছর অক্স্ফোর্ড-এ তাঁর ফোর্ড বক্তৃতামালায় ড কিটসন ক্লার্ক এই ঘটনার উল্লেখ করেন।[৮] এর ফলে এটি কি ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত হলো ? না, আমার মনে হয় এখনও নয়। আমার মতে, ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য নির্দিষ্ট বিশিষ্ট সঙ্ঘে একে সদস্য করার প্রস্তাব এসেছে — এই হলো এর বর্তমান মর্যাদা। এটি এখন সমর্থক ও সহায়কদের অপেক্ষা করছে। এও সম্ভব যে আগামী কুড়ি বছরে উনিশ শতকের ইংল্যান্ড সংক্রান্ত নানান প্রবন্ধ বা বই-এর পাদটীকায় প্রথমে আমরা এই তথ্যটি দেখতে পাব, তারপর মূল পাঠে, এবং কুড়ি বা তিরিশ বছরের মধ্যে এটি ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত হয়ে উঠতে

৬ টি পারসন্স্ও ই শিল্স্, 'ক্রিয়াশীলতার এক সাধারণ তত্ত্বের অভিমুখে' (টুওয়ার্ডস আ জেনেরাল থিওরি অফ অ্যাকশন), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ ১৬৭।

৭ লর্ড জর্জ স্যাঙ্গার, 'সত্তর বছর ধরে এক মনোরঞ্জক' (সেভেন্টি ইয়ার্স্ আ শোম্যান), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯২৬, পৃ ১৮৮- ৯।

৮ ড কিটসন ক্লার্ক, 'ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ড-এর গঠন' (দ মেকিং অফ ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ড), ১৯৬২।

পারে। অন্যথায় কেউ হয়তো এই ঘটনায় আগ্রহ দেখাবেন না। সেক্ষেত্রে অতীত সম্পর্কিত বিভিন্ন অনৈতিহাসিক তথ্যের যে-গহ্বর থেকে ড. কিটসন ক্লার্ক একে বীরত্ব সহকারে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন এটি আবার সেখানেই ফিরে যাবে। এই দুই পরিণতির মধ্যে কোন্‌টা ঘটবে তা ঠিক হবে কী করে? আমার মনে হয়, যে তত্ত্ব বা ব্যাখ্যানের সমর্থনে ড. কিটসন ক্লার্ক এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন, অন্য ঐতিহাসিকরা সেটি বৈধ বা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মেনে নেবেন কিনা তার ওপরেই নির্ভর করবে এর ভবিষ্যৎ। ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে এর মর্যাদা ব্যাখানের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এই ব্যাখ্যানের উপাদান ইতিহাসের প্রত্যেক তথ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

আমি কি একটু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে পারি? বহু বছর আগে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করছিলুম তখন 'পার্সিয় যুদ্ধের সময়ে গ্রীস' ছিল আমার বিশেষ বিষয়। আমি পনেরো বা কুড়িটি বই আমার তাকে জড়ো করছিলুম ও ধরে নিয়েছিলুম যে তাদের মধ্যে আমার বিষয়-সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য লিখে রাখা আছে। ধরা যাক — তার প্রায় সবটাই সত্যি — যে আমার বিষয় নিয়ে যত তথ্য সেই সময়ে জানা ছিল, বা জানা যেতে পারত, তার সবই ঐ সব বই-এ ছিল। আর এক সময়ে কোনো একজন নিশ্চয়ই অসংখ্য তথ্য জানতেন, কিন্তু তার মধ্যে থেকে কোন্ অঘটন বা ঘাতপ্রতিঘাতের প্রক্রিয়ায় এই সব খুঁটিয়ে-বাছাই-করা তথ্য ইতিহাসের তথ্য হয়ে বেঁচে রইল তা খোঁজ করার কথা আমার কখনও মনেই হয় নি। আমার সন্দেহ হয়, এমনকি আজও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণ এই যে, ইতিহাস আমাদের জন্য একটি বিভ্রম তৈরি করে — আমাদের হাতে যত তথ্য আছে তার সবই সামাল-দেওয়ার-মতো একটা পরিসীমার মধ্যে পড়ে : ইতিহাসের তথ্য ও অতীত সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে যে নাছোড় ফারাক তা দূর হয়ে যায়, কারণ অল্প যেটুকু তথ্য জানা আছে সে সবই ইতিহাসের তথ্য। ব্যুরি এই দু যুগ, প্রাচীন ও মধ্য যুগ, নিয়েই কাজ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বিভিন্ন নথি নানারকম ছিদ্রে ভরা।'[৯] বলা হয়েছে, ইতিহাস হলো ভাঙা টুকরো দিয়ে জোড়া এক বিশাল ধাঁধা যার অনেক টুকরো হারিয়ে গেছে। কিন্তু প্রধান সমস্যা নানান ছিদ্র নিয়ে নয়। খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকের গ্রীস সম্পর্কে আমাদের জানা ছবিতে অনেক দোষত্রুটি থাকার প্রধান কারণ এই নয় যে এর অনেক টুকরো দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে গেছে। আসল কারণ : এই ছবিটি তৈরি

৯ জে বি ব্যুরি, 'নির্বাচিত নিবন্ধাবলি' (সিলেক্টেড এসেজ), ১৯৩০, পৃ ৫২।

হয়েছে মোটামুটি এথেন্স শহরের ছোটো একদল লোককে নিয়ে। এথেন্স-এর একজন নাগরিকের চোখে পঞ্চম শতকের গ্রীস কেমন ছিল আমরা তার অনেক কিছু জানি; কিন্তু স্পার্টা, করিন্থ বা থিবস্-এর নাগরিকের কাছে তা কেমন ছিল সে-বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না — পার্সিয়, দাস বা অন্যান্য অ-নাগরিক বাসিন্দাদের কথা না-হয় বাদই দিলুম। আমাদের ছবিটি আগের থেকেই আমাদের জন্য নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। আর তা হয়েছে, যতটা দুর্ঘটনাক্রমে তার চেয়ে বেশি কিছু মানুষের মাধ্যমে, যাঁরা সচেতন বা অচেতনভাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে শুধু সেইসব তথ্যই সংরক্ষণযোগ্য যেগুলো তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। একইভাবে, মধ্যযুগের ওপর লেখা কোনো আধুনিক ইতিহাসে যখন পড়ি যে মধ্যযুগের মানুষেরা ধর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন, তখন আমার মনে হয়, কী করে আমরা এটা জানলুম, আর এটা কি সত্যি। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের তথ্য বলতে আমরা যা জানি তার প্রায় সবই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কালপঞ্জিকাররা আমাদের হয়ে বাছাই করে গেছেন। পেশাগতভাবে এঁরা ধর্মের তত্ত্ব ও চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ফলে, ধর্মকে তাঁরা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ব্যাপার নথিবদ্ধ করেছেন, তাছাড়া আর বিশেষ কিছু করেন নি। রুশ কৃষক মানেই নিষ্ঠাবান ধার্মিক — এই ছবিটি ধ্বংস করে দিয়েছে ১৯১৭-র বিপ্লব। কিন্তু মধ্যযুগীয় মানুষ নিষ্ঠাবান ধার্মিক — সত্যি হোক বা না হোক, এই ছবিটি ধ্বংস করা যাবে না, কারণ তার সম্বন্ধে যত তথ্য জানা আছে তার প্রায় সবটাই আমাদের জন্য আগেই বাছাই করে গেছেন এমন কিছু লোক যাঁরা এই ব্যাপারটিতে বিশ্বাস করতেন এবং চাইতেন যে অন্যরাও তা-ই করুক। আরও অন্যান্য প্রচুর তথ্য, যার থেকে আমরা হয়তো এর উল্টো প্রমাণ পেতে পারতুম, তা উদ্ধারের অতীত হয়ে হারিয়ে গেছে। লুপ্ত প্রজন্মের ঐতিহাসিক, লিপিকার ও কালপঞ্জিকারদের মৃত হাত অতীতের যে-ছক তৈরি করে দিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে আর আপিল পেশ করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক ব্যারাক্লাফ মধ্যযুগ-বিশেষজ্ঞ হিসেবেই লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'যে-ইতিহাস আমরা পড়ি তা তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সঠিকভাবে বলতে গেলে তথ্যভিত্তিক নয়, বরঞ্চ এক সারি স্বীকৃত অভিমত।' [১০]

১০ জি ব্যারাক্লাফ, 'পরিবর্তমান জগতে ইতিহাস' (হিস্ট্রি ইন আ চেনজিং ওয়ার্লড), ১৯৫৫, পৃ ১৪।

কিন্তু এবার আধুনিক ঐতিহাসিকদের অন্যরকম, কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ, দুরবস্থার দিকে নজর দেওয়া যাক। প্রাচীন বা মধ্যযুগ চর্চাকারী ঐতিহাসিক ঝাড়াই-বাছাই-এর বিশাল প্রক্রিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারেন, কারণ বছরের পর বছর ধরে চালু এই প্রক্রিয়াটি তাঁর হাতে সামাল-দেওয়ার মতো তথ্যসম্ভার এনে দিয়েছে। লিটন স্ট্র্যাচি যেমন স্বকীয় পরিহাসের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'ঐতিহাসিকের প্রথম প্রয়োজন অজ্ঞতা, যে অজ্ঞতা সরল ও স্পষ্ট করে, ব্যাখ্যা ও বর্জন করে।'[১১] আমার যখন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস লেখায় নিযুক্ত সহকর্মীদের প্রচণ্ড দক্ষতাকে ঈর্ষা করার লোভ হয় (যা মাঝেমাঝেই ঘটে), তখন আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে তাঁদের এত দক্ষতার কারণ তাঁরা তাঁদের বিষয় সম্বন্ধে কত অজ্ঞ। এই অন্তর্নিহিত অজ্ঞতার কোনো সুবিধেই আধুনিক ঐতিহাসিক ভোগ করতে পারেন না। নিজের জন্য প্রয়োজনীয় অজ্ঞতা তাঁকে তৈরি করে নিতে হবে — যত তিনি নিজের সময়ের কাছে এগিয়ে আসেন ততই বেশি। অল্পসংখ্যক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য আবিস্কার করে সেগুলোকে ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত করা এবং প্রচুর তাৎপর্যহীন তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে বাদ দেওয়া — এই দুই দায়িত্বই তাঁর। উনিশ শতকের যে বিপ্রবণতা ছিল : ইতিহাস মানে সবচেয়ে বেশি অখণ্ডনীয় ও বিষয়নিষ্ঠ তথ্যের সঙ্কলন — এটি কিন্তু তার ঠিক বিপরীত। যিনি এই বিপ্রবণতার কাছে নতিস্বীকার করবেন, তাঁকে বাজে কাজ বলে ইতিহাস চর্চা ছেড়ে দিয়ে ডাকটিকিট সংগ্রহ অথবা অন্য কোনো ধরনের প্রত্নচর্চায় নিযুক্ত হতে হবে অথবা তাঁর শেষ আশ্রয় হবে পাগলা গারদে। এই বিপ্রবণতাই গত একশ বছর ধরে আধুনিক ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রে এমন বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এর ফলে জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকায় সৃষ্টি হয়েছে বিশাল ও ক্রমবর্ধমান, নীরস কেঠো তথ্যভিত্তিক ইতিহাস এবং হবু ঐতিহাসিকদের লেখা আনুপুঙ্খিক বিশেষীকৃত রচনা। এই ঐতিহাসিকরা ছোটো থেকে আরও ছোটো ব্যাপারে বেশি ও আরও বেশি জেনে তথ্যের সমুদ্রে কোনো চিহ্ন না রেখেই ডুবে গেছেন। আমার মনে হয়, উদারনৈতিক ও ক্যাথলিক আনুগত্যের মধ্যে তথাকথিত সংঘর্ষ নয়, বরঞ্চ এই বিপ্রবণতাই অ্যাক্টন-কে ঐতিহাসিক হিসেবে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তাঁর শিক্ষক ডায়লিঙ্গের সম্বন্ধে প্রথমদিকের একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন : 'তিনি অসম্পূর্ণ মালমশলা নিয়ে লিখবেন না, আর তাঁর কাছে মালমশলা

১১ লিটন স্ট্র্যাচি, 'বিখ্যাত ভিক্টোরীয়'-র ভূমিকা (প্রেফেস টু এমিনেন্ট্ ভিক্টোরিয়ানস)।

ছিল সবসময়ই অসম্পূর্ণ।' [১২] নিঃসন্দেহে অ্যাক্টন নিজেই এখানে নিজের সম্বন্ধে আগাম রায় দিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ এমন একজন ঐতিহাসিক সম্বন্ধে অনেকেই যাঁকে মনে করবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের রিজিয়স অধ্যাপক পদের আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বিশিষ্ট অধিকারী — কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো যিনি নিজে কোনো ইতিহাস লেখেন নি। আর তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই প্রকাশিত 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডের সূচনায় অ্যাক্টন তাঁর নিজের অন্তিমবাণী লিখেছিলেন, যখন তিনি দুঃখ করে বলেন, একজন ঐতিহাসিকের ওপর এমন সব করণীয় কর্মের চাপ পড়ে যে 'লেখক হওয়ার বদলে তাঁর পক্ষে কোষগ্রন্থের সঙ্কলকে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।' [১৩] কোথাও একটা গোলমাল হয়েছিল। নিশ্ছিদ্র তথ্যসমগ্রের অক্লান্ত ও অন্তহীন সংগ্রহ-ই ইতিহাসের ভিত এবং তথ্যরা নিজের থেকেই বক্তব্য রাখে ও আমরা খুব বেশি তথ্য জোগাড় করতে পারি না — এই বিশ্বাসই ছিল গোলমালের আসল কারণ। এই বিশ্বাস সেই সময়ে এতই প্রশ্নাতীত ছিল যে 'কাকে বলে ইতিহাস ?' এই প্রশ্ন নিজের কাছে রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন খুব কম ঐতিহাসিক — এবং আজও কিছু ঐতিহাসিক প্রশ্নটি অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন।

তথ্যের বিষয়ে উনিশ-শতকীয় অন্ধভক্তি সম্পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায়সঙ্গত হয়ে উঠেছিল দলিল-দস্তাবেজ বিষয়ে অন্ধভক্তি দিয়ে। তথ্যের মন্দিরে দলিল-দস্তবেজ ছিল বিগ্রহস্বরূপ। শ্রদ্ধাবান ঐতিহাসিক তাদের দিকে মাথা নিচু করে এগোতেন ও তাদের সম্বন্ধে কথা বলতেন সম্ভ্রমের সুরে। যদি দলিলে আপনি কোনো ঘটনা পেয়ে থাকেন, ঘটনা তবে তা-ই। কিন্তু এইসমস্ত দলিল — ফতোয়া, চুক্তিপত্র, খাজনার হিসেব, সংসদীয় বিবরণ (ব্লু বুক), সরকারি পত্রালাপ, ব্যক্তিগত চিঠি ও দিনপঞ্জি — আমরা যখন এগুলো খুঁটিয়ে দেখি তখন এসব দলিল আমাদের কী জানায় ? দলিললেখক যা ভেবেছিলেন, কোনো দলিলই তার থেকে বেশি কিছু জানাতে পারে না — যা ঘটেছিল বলে তিনি ভেবেছেন, যা হওয়া উচিত বা হতে পারে বলে তিনি

১২ জি পি গুচ, 'উনিশ শতকে ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ' (হিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান্স্ ইন দ নাইনটিন্থ্ সেন্চুরি)-এ উদ্ধৃত, পৃ ৩৮৫ ; অ্যাক্টন পরে ডায়লিঙ্গের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে 'আজ পর্যন্ত মানুষের হাতে যত কিছু আরোহী সিদ্ধান্ত এসেছে তাঁকে তা দেওয়া হয়েছিল তাঁর ইতিহাসের দর্শন তৈরি করার জন্যে।' 'স্বাধীনতার ইতিহাস'ও অন্যান্য রচনা' (হিস্ট্রি অফ ফ্রিডম অ্যান্ড আদার এসেজ্), ১৯০৭, পৃ ৪৩৫)।

১৩ 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস' (কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রি), খণ্ড ১, ১৯০২, পৃ ৪।

ভেবেছেন বা হয়তো শুধু যা তিনি ভেবেছেন বলে অন্যদের ভাবাতে চান, অথবা এমনকি শুধু তিনি যা ভেবেছেন বলে ভেবেছেন। এর কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না যতক্ষণ-না ঐতিহাসিক এদের বিচার করে অর্থ উদ্ধার করেন। দলিলে পাওয়া যাক বা না যাক, তথ্যকে যে-কোনোরকমে ব্যবহারের আগে ঐতিহাসিককে তো তা মাপসই করে নিতে হবে। আমাকে যদি ঐভাবে বলতে দেওয়া হয়, তবে আমি বলব : ঐতিহাসিক তথ্যের যে-ব্যবহার করেন তা হলো মাপসই করার প্রক্রিয়া।

আমি ভালোমতো জানি এমন একটা নমুনা দিয়ে যা বলতে চেষ্টা করছি তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ভাইমার সাধারণতন্ত্রের বৈদেশিক মন্ত্রী গুস্তাভ স্ট্রেসেমান ১৯২৯ সালে মারা যাওয়ার সময়ে ৩০০ বাক্স ভর্তি বিশাল পরিমাণ কাগজপত্র রেখে যান। এর মধ্যে প্রায় সবই ছিল বৈদেশিক মন্ত্রী হিসেবে তাঁর দুবছর ভারপ্রাপ্ত থাকার সঙ্গে যুক্ত সরকারি, আধাসরকারি ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়রা মনে করেন যে এরকম একজন মানুষের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা উচিত। স্ট্রেসেমান-এর বিশ্বস্ত সচিব বের্নহার্ড কাজে নামলেন ও তিন বছরের মধ্যে ৩০০ বাক্স থেকে বাছাই-করা দলিল নিয়ে তিনটি বিশাল বিশাল খণ্ড প্রকাশিত হলো — প্রত্যেকটির পাতার সংখ্যা প্রায় ৬০০। তার গেরাম্ভারি নাম ছিল 'স্ট্রেসেমান-এর উত্তরাধিকার' (স্ট্রেসেমান্স্ ফ্যেরম্যেস্টনিস)। সাধারণভাবে এই সমস্ত দলিল হয়তো কোনো ভাঁড়ারঘর বা চিলেকোঠায় নষ্ট হয়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে যেত ; বা হয়তো শ-খানেক বছর বাদে কোনো অনুসন্ধানী পণ্ডিতের নজরে পড়ত, বের্নহার্ড-এর মূল রচনার সঙ্গে তিনি তাদের তুলনা করতে বসতেন। কিন্তু যা ঘটল তা অনেক বেশি নাটকীয়। ১৯৪৫ সালে এসব দলিল ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারের হাতে পড়ে ; তাঁরা পুরোটাই ছবি তুলে সেই ফটোকপি লন্ডন-এর সরকারি নথি সংগ্রহ দপ্তর ও ওয়াশিংটন-এর জাতীয় মহাফেজখানার পণ্ডিতদের হাতে তুলে দেন। ফলে আমাদের যদি যথেষ্ট ধৈর্য ও অনুসন্ধিৎসা থাকে তাহলে বের্নহার্ড ঠিক কী করেছিলেন তা আমরা আবিস্কার করতে পারি। তিনি যা করেছিলেন তা খুব বেশি অস্বাভাবিকও নয় বা খুব অভাবিতও নয়। স্ট্রেসেমান যখন মারা যান তখন তাঁর পশ্চিমীনীতি একের পর এক দীপ্ত সাফল্যে মণ্ডিত বলে মনে হয়েছিল — যেমন, লোকার্নো, জাতিপুঞ্জে জার্মানির অন্তর্ভুক্তি, ডস ও ইয়ং পরিকল্পনা এবং মার্কিন ঋণ, রাইনল্যান্ড থেকে মিত্রপক্ষের দখলদার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার। মনে হয়েছিল, এই সবই স্ট্রেসেমান-এর বিদেশনীতির গুরুত্বপূর্ণ ও সন্তোষজনক ভাগ এবং

বের্নহার্ড-এর দলিল নির্বাচনে এরাই যে অতিমাত্রায় প্রকট থাকবে — এমনটি অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে স্ট্রেসেমান-এর প্রাচ্যনীতি, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষ কোনো পরিণতির দিকে যায় নি। প্রচুর দলিলপত্রে বিভিন্ন আলোচনার কথা আছে যার থেকে শুধু তুচ্ছ সাফল্যই এসেছিল। সেগুলো খুব চিত্তাকর্ষক নয়, আর স্ট্রেসেমান-এর খ্যাতিও কিছুই বাড়ে নি — তাই নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি হতে পেরেছিল আরও বেশি আঁটোসাঁটো। আসলে কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে স্ট্রেসেমান অনেক বেশি নিরবিচ্ছিন্ন ও উদ্বিগ্ন মনোযোগ দিয়েছিলেন। বের্নহার্ড-এর বাছাই থেকে পাঠকদের যা অনুমান হবে, স্ট্রেসেমান-এর গোটা বিদেশনীতিতে এই বিষয়টি তার চেয়ে অনেক বড় ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, যেসব প্রকাশিত নথিপত্রের সংগ্রহের ওপর সাধারণ ঐতিহাসিকরা নির্বিচারে নির্ভর করেন, সেগুলোর তুলনায় বের্নহাড খণ্ডাবলি সম্পর্কে অনুকূল মতই দেওয়া যায়।

আমার গল্পটা এখানেই শেষ হয় নি। বের্নহার্ড খণ্ডাবলি বেরোবার কিছু পরেই হিটলার ক্ষমতায় আসেন। জার্মানিতে স্ট্রেসেমান-এর নামকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিস্মরণে ও বাজার থেকে খণ্ডগুলো উধাও হয়ে যায়। অনেক, বোধহয় বেশিরভাগ কপিই নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। আজ 'স্ট্রেসেমান-এর উত্তরাধিকার' মোটামুটি দুর্লভ বই। কিন্তু পশ্চিমে স্ট্রেসেমান-এর খ্যাতিতে কোনো ভাঁটা পড়ে নি। ১৯৩৫ সালে একজন ইংরেজ প্রকাশক বের্নহার্ড-এর কাজটির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বার করেন — বের্নহার্ড-এর বাছাই-এরও বাছাই। এতে বোধহয় মূলের একের তিন অংশ বাদ দেওয়া হয়। জার্মান ভাষার একজন সুপরিচিত অনুবাদক, সাটন তাঁর কাজ দক্ষতার সঙ্গে ভালোভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। মুখবন্ধে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে ইংরিজি সংস্করণটি 'খানিকটা সংক্ষেপিত, কিন্তু এতে কিছু পরিমাণে শুধু সেইসব অংশই বাদ দেওয়া হয়েছে যেগুলোকে তুলনায় সাময়িক বিষয় বলে মনে হয় .. ও ইংরিজিভাষী পাঠক ও ছাত্রদের অল্পই আগ্রহ থাকবে।'[১৪] এ কথাও যথেষ্ট স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে বের্নহার্ড-এর বইতে স্ট্রেসেমান-এর প্রাচ্যনীতি, যার উপযুক্ত প্রতিফলন ইতিমধ্যেই হয় নি, তা আরও বেশি নজরের বাইরে চলে যায়। আর সাটন-এর বইতে স্ট্রেসেমান-এর মূলত পশ্চিমকেন্দ্রিক বিদেশনীতিতে সোভিয়েত

১৪ 'গুস্তাভ স্ট্রেসেমান, তাঁর দিনপঞ্জি, পত্রাবলি ও কাগজপত্র' (হিজ ডায়েরিজ, লেটারস অ্যান্ড পেপারস), খণ্ড ১, ১৯৩৫, সম্পাদকের মন্তব্য।

যুক্তরাষ্ট্রকে শুধুই কালেভদ্রে-আসা ও খানিক অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখা যায়। এসব সত্ত্বেও একথা বলা নিরাপদ যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বাদ দিয়ে আর সবার ক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়ার ক্ষেত্রে স্ট্রেসেমান-এর আসল বক্তব্যের পরিচয় পাওয়া যাবে সাটন-এর কাছ থেকে, বের্নহার্ড থেকে নয় — আর খোদ দলিলপত্র থেকে আরও কম। ১৯৪৫-এর বোমা পড়ায় যদি দলিলপত্রগুলো ধ্বংস হয়ে যেত আর বের্নহার্ড-এর অবশিষ্ট খণ্ডগুলো যদি উধাও হয়ে যেত, তাহলে সাটন-এর প্রামাণিকতা ও চূড়ান্ততা নিয়ে কখনোই কোনো প্রশ্ন উঠত না। প্রচুর ছাপা দলিলপত্রের সংগ্রহ — মূলের অভাবে ঐতিহাসিকরা যেগুলোকে কৃতজ্ঞভাবে মেনে নেন — সেগুলোর ভিত এর চেয়ে বেশি পাকা নয়।

কিন্তু আমি এই গল্পটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সাটন-এর কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের এই ভেবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে আমাদের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে সাম্প্রতিক ইওরোপীয় ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অন্যতম প্রধান অংশীদারের প্রামাণিক কাগজপত্র আমরা বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারি। এই কাগজপত্র থেকে কী জানা যায়? অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এদের মধ্যে আছে বার্লিনে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে স্ট্রেসেমান-এর কয়েক শ এবং চিচেরিন-এর সঙ্গে ঐরকম গোটাকুড়ি আলোচনার নথিবদ্ধ বিবরণ। এইসব নথির একটা সাধারণ লক্ষণ আছে। এদের থেকে জানা যায়, আলোচনার বেশিরভাগ অংশই ছিল স্ট্রেসেমান-এর কব্জায়, এবং দেখা যায়, তাঁর নানান যুক্তি বিনা ব্যতিক্রমে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত ও সুসংহত, আর তাঁর প্রতিপক্ষদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই তা অপর্যাপ্ত, দিশাহারা ও গ্রহণের অযোগ্য। কূটনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সমস্ত নথির ক্ষেত্রেই এটি একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। কী ঘটেছিল — এই দলিলপত্র থেকে তা জানা যায় না। খালি জানা যায় স্ট্রেসেমান যা হয়েছিল বলে ভেবেছিলেন বা অন্যরা যা ভাবুক বলে চেয়েছিলেন অথবা বোধহয় যা হয়েছিল বলে তিনি ভাবতে চেয়েছিলেন। সাটন বা বের্নহার্ড নয়, নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি যিনি শুরু করেছিলেন তিনি হলেন স্ট্রেসেমান স্বয়ং। আর ধরা যাক যদি একই আলোচনা বিষয়ে চিচেরিন-এর নথি আমাদের কাছে থাকত তাহলেও আমরা তার থেকে শুধু জানতে পারতুম চিচেরিন কী চেয়েছিলেন, আর সেক্ষেত্রেও সত্যিই কী ঘটেছিল তা ঐতিহাসিকদের আবার মনে-মনে সাজিয়ে নিতে হতো। বিভিন্ন তথ্য ও দলিলপত্র ঐতিহাসিকদের কাছে অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু তাদের প্রতি অন্ধভক্তি দেখাবেন না। তারা নিজেরা কোনো ইতিহাস গড়ে তোলে না। 'কাকে বলে ইতিহাস?' এই

ক্লান্তিকর প্রশ্নের কোনো তৈরি উত্তর তারা নিজেরা জোগান দিতে পারে না।

উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে সাধারণত কেন উদাসীন ছিলেন সে-ব্যাপারে আমি এইবার কয়েকটি কথা বলতে চাই। 'ইতিহাসের দর্শন' এই শব্দগুচ্ছটি আবিষ্কার করেছিলেন ভলত্যার, আর তারপর থেকে এটির ব্যবহার হয়েছে নানান অর্থে। কিন্তু আমি যদি এই শব্দগুচ্ছটি আদৌ ব্যবহার করি তাহলে ধরে নেব যে 'কাকে বলে ইতিহাস ?' এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে সেটিই হবে আমাদের উত্তর। পশ্চিম ইওরোপের বুদ্ধিজীবীদের কাছে উনিশ শতক ছিল আস্থা ও আশাবাদে ম-ম-করা এক আরামের পর্ব। তথ্য ছিল মোটের ওপর সন্তোষজনক, আর সে নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়ার ঝোঁক ছিল একই হারে দুর্বল। রাঙ্কে ভক্তিভরে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি তথ্যের দায় নিলে ইতিহাসের তাৎপর্যের দায় নেবেন দৈবশক্তি। আর বেশ খানিকটা আধুনিক অনাস্থাবাদের ছোঁয়া দিয়ে বুর্কহার্ট মন্তব্য করেছিলেন, 'আমরা চিরন্তন প্রজ্ঞার উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচিত নই।' ১৯৩১ সালের মতো অত পরেও আপাতসন্তুষ্টি নিয়ে অধ্যাপক বাটারফিল্ড লক্ষ্য করেছিলেন, 'ঐতিহাসিকরা নানান ব্যাপারের স্বরূপ নিয়ে, এমনকি নিজেদের বিষয়ের স্বরূপ নিয়েও খুব অল্পই চিন্তাভাবনা করেছিলেন'।[১৫] কিন্তু এই বক্তৃতামালায় আমার পূর্বসূরি ড. এ এল রাউজ ছিলেন ন্যায্যতই আরও বিশ্লেষণশীল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে সার উইনস্টন চার্চিল-এর বই 'বিশ্ব সঙ্কট' (ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস) সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ব্যক্তিত্ব, নিখুঁত বর্ণনা ও প্রাণশক্তিতে ট্রটস্কি-র 'রুশ বিপ্লবের ইতিহাস'-এর সঙ্গে এর মিল থাকলেও একদিক দিয়ে এটি তার চেয়ে নিকৃষ্ট : 'এর পেছনে কোনো ইতিহাসের দর্শন নেই'।[১৬] ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এতে নারাজ। তার কারণ এই নয় যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য নেই। তাঁদের বরং বিশ্বাস ছিল, এর তাৎপর্য অন্তর্নিহিত ও স্বতঃস্পষ্ট। ইতিহাস বিষয়ে উনিশ-শতকীয় উদারনৈতিক মত ছিল অবাধ বাণিজ্যের আর্থনীতিক মতবাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, আর সেই সঙ্গে পৃথিবী সম্পর্কে এক শুদ্ধশান্ত ও আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। প্রত্যেকে তার নিজের কাজ করে চলুক,

১৫ এইচ বাটারফিল্ড, 'ইতিহাসের হুইগ ভাষ্য' (দ হুইগ ইনটারপ্রিটেশান অফ হিস্ট্রি), ১৯৩১, পৃ ৬৭।

১৬ এ এল রাউজ, 'একটি যুগের শেষ' (দ এন্ড অফ অ্যান ইপক), ১৯৪৭, পৃ ২৮২-৩।

বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্যের ভার নেবে এক অদৃশ্য হাত। কল্যাণময় ও উচ্চতর বস্তুর দিকে আপাত অনন্ত প্রগতি — ইতিহাসের যাবতীয় তথ্যই এই চূড়ান্ত তথ্যটির প্রমাণস্বরূপ। এটি ছিল অপাপবিদ্ধতার যুগ, এক ফালি দর্শন দিয়েও নিজেদের না-ঢেকেই ঐতিহাসিকরা ঘুরে বেড়াতেন স্বর্গোদ্যানে, ইতিহাসের দেবতার সামনে তাঁরা ছিলেন উলঙ্গ ও অলজ্জ। তারপর থেকে আমরা জেনেছি পাপ কাকে বলে ও পতনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর যেসব ঐতিহাসিক আজ ইতিহাসের দর্শন থেকে মুক্ত হওয়ার ভান করছেন, বিবস্ত্র আবাসনের সদস্যদের মতো তাঁরা শুধু নিস্ফল ও আত্মসচেতনভাবে নিজেদের উদ্যান-উপনগরীতে আবার স্বর্গোদ্যান গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটি আজ আর এড়ানো যাবে না।

'কাকে বলে ইতিহাস ?' এই প্রশ্নটি নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। উনিশ শতকের উদারনীতিবাদের স্বস্তিদায়ক রাজত্বকে লণ্ডভণ্ড করার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল জার্মানি। আর সেই দেশ থেকেই ইতিহাসে তথ্যের আদি দাবি ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রথম চ্যালেন্‌জ্‌ জানানো হলো ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে। যেসব দার্শনিক এই চ্যালেন্‌জ্‌ জানিয়েছিলেন তাঁরা এখন নামমাত্র টিঁকে আছেন। এঁদের একজন হলেন ডিল্‌থি, যিনি সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেনে অনেক দেরিতে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই শতক শেষ হওয়ার আগে অবধি এ-দেশের সমৃদ্ধি ও আস্থা ছিল বড্ড বেশি। যেসব বিপ্রবণরা তথ্য-অর্চনাকে আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের দিকে তাই নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নি। কিন্তু নতুন শতকের গোড়ার দিকে মশাল গিয়ে পৌঁছল ইতালিতে। সেখানে ইতিহাসের এক দর্শনের প্রস্তাবনা করলেন ক্রোচে। স্পষ্টতই জার্মান আচার্যদের কাছে তা অনেকখানিই ঋণী। ক্রোচে ঘোষণা করলেন, সব ইতিহাসই 'সমসাময়িক ইতিহাস'।[১৭] তার মানে ইতিহাস মূলত বর্তমানের চোখ দিয়ে ও তারই সমস্যার নিরিখে অতীতকে দেখা আর ঐতিহাসিকের আসল কাজ নথিকরণ নয়, বরং মূল্যায়ন। তিনি

১৭ এই সুপরিচিত প্রবচনটির প্রসঙ্গ এইরকম: 'প্রত্যেক ঐতিহাসিক বিচারের ভেতর যেসব প্রয়োগিক প্রয়োজনীয়তা থাকে, সব ইতিহাসকেই তা দেয় 'সমসাময়িক ইতিহাসে'র চরিত্র, কারণ এইভাবে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা সময়ের হিসেবে যত সুদূরেই আছে বলে মনে করা হোক না কেন, বাস্তবে ইতিহাস বর্তমানের দাবি ও বর্তমানের অবস্থার উল্লেখ করে যেখানে ঐসব ঘটনা স্পন্দিত হয়' (বেনেদেত্তো ক্রোচে, 'স্বাধীনতার কাহিনী রূপে ইতিহাস' (হিস্‌ট্রি অ্যাজ দ স্টোরি অফ লিবার্টি)। ইং অনু. ১৯৪১, পৃ ১৯।

যদি মূল্যায়ন না করেন তাহলে কোন্‌টা নথিবদ্ধ করার উপযুক্ত তা তিনি জানবেন কী করে? ১৯১০ সালে মার্কিন ঐতিহাসিক কার্ল বেকার ইচ্ছে করেই খোঁচা-দেওয়া ভাষায় বললেন, 'ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনো তথ্য থাকে না যতক্ষণ-না তিনি তা সৃষ্টি করেন'।[১৮] ঠিক সেই মুহূর্তে এইসব চ্যালেন্‌জ্‌-এর দিকে কোনো নজর দেওয়া হয় নি। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনে ক্রোচে যথেষ্ট গ্রাহ্য হতে শুরু করেন ১৯২০-র পরেই। এর কারণ বোধহয় এই নয় যে ক্রোচে তাঁর জার্মান পূর্বসূরিদের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ ছিলেন বা তাঁর রচনারীতি ছিল আরও উন্নত। তার কারণ বরং এই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের দিকে তথ্যের কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে ১৯১৪-র আগের বছরগুলোর চেয়ে যেন কম উদারতা দেখা গেল। অতএব, যে-দর্শন তথ্যের মর্যাদা ছোটো করতে চাইল তার দিকেই আমাদের ঝোঁক পড়ল বেশি। অক্‌স্‌ফোর্ড-এর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক কলিংউড-এর ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল ক্রোচের। কলিংউড-ই এই শতকের একমাত্র ব্রিটিশ চিন্তাবিদ যিনি ইতিহাসের দর্শনে রেখে গেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কলিংউড যে যুক্তিবিন্যস্ত আলোচনার পরিকল্পনা করেছিলেন তা লেখার জন্য তিনি আর বাঁচেন নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সব কাগজপত্র 'ইতিহাসের ধারণা' (দ আইডিয়া অফ হিস্‌ট্রি) নামে এই বইতে জড়ো করা হয়। বইটি বেরোয় ১৯৪৫-এ।

কলিংউড-এর মত সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। 'খোদ অতীত' বা 'তার সম্পর্কে ঐতিহাসিকের খোদ চিন্তা' — এর কোনোটাই ইতিহাসের দর্শনের বিবেচ্য নয়। বরং তার আলোচ্য হলো 'পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় এই দুই বিষয়'। (এই সূত্র থেকে প্রতিফলিত হয় 'ইতিহাস' শব্দটির প্রচলিত দুটি অর্থ — ঐতিহাসিক যে-তদন্ত করেন এবং অতীতের যে বিভিন্ন ঘটনার সারি নিয়ে তিনি তদন্ত করেন)। 'ঐতিহাসিক যে অতীতের চর্চা করেন তা মৃত নয়। তার বদলে এক অর্থে ঐ অতীত এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে।' অতীতের ক্রিয়া কিন্তু মৃত, অর্থাৎ ঐতিহাসিকের কাছে তা অর্থহীন যতক্ষণ-না তিনি তার পেছনে যে-চিন্তা কাজ করছে তাকে বুঝতে পারেন। অতএব, 'সব ইতিহাসই চিন্তার ইতিহাস' আর 'ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনে সেই চিন্তার পুনঃরূপায়ণ, যার ইতিহাস তিনি চর্চা করছেন'। ঐতিহাসিকের মনে অতীতের পুনর্গঠন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এটি স্বয়ং কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়া নয় এবং শুধু

১৮ 'অ্যাটল্যান্টিক মান্থলি', অক্টোবর ১৯১০, পৃ ৫২৮।

তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে এটি গড়ে ওঠে নি। তার বদলে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে তথ্যের নির্বাচন ও ব্যাখ্যান : এর ফলেই সেগুলো পরিণত হয় ঐতিহাসিক তথ্যে। এ-বিষয়ে কলিংউড-এর কাছাকাছি আসেন অধ্যাপক ওকশট। তিনি বলেন, 'ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতা। ঐতিহাসিক ছাড়া আর কেউই তাকে "তৈরি" করেন না : ইতিহাস তৈরি করার একমাত্র উপায় সেটি লিখে ফেলা।' [১৯]

এই তীক্ষ্ণ সমালোচনা — যদিও এর সঙ্গে কিছু গুরুতর মতভেদের অবকাশ আছে — কিছু অবহেলিত সত্যকে সামনে নিয়ে আসে।

প্রথমত, ইতিহাসের তথ্য কখনোই আমাদের কাছে 'বিশুদ্ধ' রূপে আসে না। কারণ তারা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না ও থাকতে পারে না। তারা সবসময়েই নথিকারের মনের মধ্যে দিয়ে প্রতিসারিত হয়। তার মানে, আমরা যখন কোনো ইতিহাসের বই বেছে নিই তখন তার ভেতরকার তথ্যই আমাদের প্রথম বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়, যে-ঐতিহাসিক সেটি লিখেছিলেন তিনিই আমাদের বিবেচ্য। যে-মহান ঐতিহাসিকের সম্মানে ও নামে এই বক্তৃতামালা স্থাপিত হয়েছে উদাহরণ হিসেবে তাঁকেই নেওয়া যাক। জি এম ট্রেভেলিয়ান তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে বাড়িতে তিনি খানিকটা প্রবল হুইগ ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন।[২০] আমি যদি তাঁকে 'হুইগ ঐতিহ্যের অন্তিম কিন্তু অতুচ্ছ, মহান ইংরেজ উদারনৈতিক ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করি, আশা করি তিনি তাতে আপত্তি করবেন না। মহান হুইগ ঐতিহাসিক জর্জ অটো ট্রেভেলিয়ান থেকে মেকলে (যিনি ছিলেন অতুলনীয় মহত্তম হুইগ ঐতিহাসিক) অবধি তাঁর বংশপঞ্জি তিনি বিনা কারণে খুলে ধরেন নি। ট্রেভেলিয়ান-এর সবচেয়ে চমৎকার ও পরিণত বই, 'রানী অ্যান-এর অধীনে ইংল্যান্ড' (ইংল্যান্ড আন্ডার কুইন অ্যান) লেখা হয়েছিল ঐ পটভূমিতে এবং এর পুরো অর্থ ও তাৎপর্য পাঠকের কাছে তখনই ধরা দেবে যখন ঐ পটভূমিতে রেখে সেটি পড়া হবে। পাঠকের পক্ষে এ ব্যাপারে ব্যর্থ হওয়ার কোনো অজুহাত লেখক সত্যিই রাখেন নি। কারণ, গোয়েন্দা উপন্যাসের সমঝদারদের কৌশল অনুসরণ করে আপনি যদি শেষটা আগে পড়ে নেন তাহলে, আজ যাকে ইতিহাসের হুইগ ভাষ্য বলা হয়,

১৯ এম ওকশট, 'অভিজ্ঞতা ও তার ধরন' (এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ইট্স্ মোডস) ১৯৩৩, পৃ ৯৯।

২০ জি এম ট্রেভেলিয়ান, 'আত্মজীবনী' (অ্যান অটোবায়োগ্রাফি), ১৯৪৯, পৃ ১১।

আমার মতে তার সবচেয়ে ভালো সংক্ষিপ্তসার আপনি পাবেন ট্রেভেলিয়ান-এর বই-এর তৃতীয় খণ্ডের শেষ কয়েক পাতায়। আর আপনি দেখবেন, ট্রেভেলিয়ান যা করার চেষ্টা করেছেন তা হলো হুইগ ঐতিহ্যের উৎপত্তি ও বিকাশের তদন্ত এবং ঐ ঐতিহ্যেকে তার প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় উইলিয়াম-এর মৃত্যুর পরের বছরগুলোতে বেশ পাকাপোক্তভাবে গেঁথে দেওয়া। রানী অ্যান-এর রাজত্বকালীন বিভিন্ন ঘটনার এটাই বোধহয় একমাত্র সম্ভাব্য ভাষ্য নয়। তাহলেও এটি বৈধ এবং ট্রেভেলিয়ান-এর হাতে একটি সফল ভাষ্য। কিন্তু এটির সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে: ঐতিহাসিক কী করেছেন। কারণ কলিংউড যেমন বলেছেন, ঐতিহাসিককে তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীদের মনে কী ছিল তা নিজের চিন্তায় আবার রূপায়িত করতেই হবে, আর তাই পাঠকের বেলায়ও, ঐতিহাসিকের মনে কী ঘটছে তাঁকেও সেটি আবার রূপায়িত করতে হবে। তথ্য অনুধাবন শুরু করার আগে ঐতিহাসিককে অনুধাবন করুন। এটা কিন্তু খুব একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার নয়। স্নাতক শ্রেণীর বুদ্ধিমান ছাত্র বরাবরই এই কাজ করে। তাকে সেন্ট জুড্‌স্ কলেজের মহান পণ্ডিত জোন্‌স্-এর বই পড়তে সুপারিশ করলে সে সেন্ট জুড্‌স্-এ কোনো বন্ধুর কাছে গিয়ে জানতে চায়: জোন্‌স্ লোকটা কেমন, আর তার মাথায় কী কী পোকা আছে। ইতিহাসের কোনো বই পড়লে সর্বদাই (ঐ পোকার) গুনগুনুনি শোনার জন্যে কান পেতে রাখুন। যদি কিছুই না ধরতে পারেন তাহলে হয় আপনি সুরকানা, নইলে আপনার ঐতিহাসিকটি নির্জীব। তথ্যরা আসলে মোটেই ঝাঁকার মাছের মতো নয়। বিশাল ও কখনো-বা দুস্তর পারাবারে সাঁতরে বেড়ানো মাছের সঙ্গেই তাদের তুলনা করা যায়। আর ঐতিহাসিক কী ধরবেন অংশত তা নির্ভর করে আকস্মিকতার ওপর, কিন্তু প্রধানত সাগরের কোন্ অংশ তিনি মাছ ধরার জন্য বেছে নেবেন আর কোন বঁড়শি পছন্দ করবেন — তার ওপর। এই দুটি বিষয়ই অবশ্য নির্ধারিত হয় তিনি কী ধরনের মাছ ধরতে চান — তা-ই দিয়ে। ঐতিহাসিক যে ধরনের তথ্য চান তা তিনি মোটামুটি পেয়ে যাবেন। ইতিহাস মানে ব্যাখান। অতএব সার জর্জ ক্লার্ক-কে শীর্ষাসন করিয়ে আমি যদি ইতিহাসকে বলি 'তর্কসাপেক্ষ তথ্যের শাঁসে ঘেরা ব্যাখ্যানের শক্ত আঁটি', তাহলে নিঃসন্দেহে আমার বক্তব্য হবে একপেশে ও বিভ্রান্তিকর, কিন্তু সাহসে ভর করে আমি ভাবতে পারি যে আদি সূত্রটির চেয়ে এটি আরও বেশি একপেশে ও বিভ্রান্তিকর হবে না।

যেসব মানুষ নিয়ে ঐতিহাসিক কাজ করছেন, তাঁদের মন, আর তাঁদের কার্যকলাপের পেছনে যে চিন্তা রয়েছে তার জন্য ঐতিহাসিকের

প্রয়োজন এক কল্পনাসমৃদ্ধ বোধ — এ-ই হলো আরও পরিচিত দ্বিতীয় দিক। আমি বলেছি, 'কল্পনাসমৃদ্ধ বোধ', 'সহানুভূতি' নয়; পাছে সহানুভূতিকে মতৈক্য অর্থে ধরে নেওয়া হয়। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে উনিশ শতক ছিল দুর্বল। কারণ মধ্যযুগের নানান কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস, আর তার ফলে মাথা-চাড়া দিয়েছিল যেসব বর্বরতা — ঐ শতকের মানুষদের সম্বন্ধে কোনো কল্পনাসমৃদ্ধ বোধ তৈরি হওয়ার পক্ষে এগুলো বড় বেশি বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল। বা, তিরিশ বছরের যুদ্ধ সম্বন্ধে বুর্কহার্ট-এর রূঢ় সমালোচনামূলক মন্তব্যটিই ধরুন: 'জাতির অখণ্ডতার ওপরে কোনো ধর্মবিশ্বাসের মুক্তিকে স্থান দেওয়া কলঙ্কজনক, তা সে ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট যা-ই হোক না কেন।'[২১] উনিশ শতকের একজন উদারনৈতিক ঐতিহাসিক, যিনি এই বিশ্বাসের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন যে দেশরক্ষার জন্য হত্যা করা সঠিক ও প্রশংসাযোগ্য কিন্তু নিজের ধর্মের সপক্ষে সেই কাজ করা অন্যায় ও বুদ্ধিভ্রংশতা, তাঁর পক্ষে, যাঁরা তিরিশ বছরের যুদ্ধ লড়েছিলেন তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পারা খুব কঠিন। আমি এখন যা নিয়ে কাজ করছি সেই বিষয়েও এই অসুবিধে বিশেষভাবে তীব্র। অপরপক্ষের মনে কী হচ্ছে তার জন্য এমনকি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের কল্পনাসমৃদ্ধ বোধ অর্জনে অক্ষমতার ফলে, ইংরিজিভাষী দেশগুলোয় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ইংরিজিভাষী দেশগুলো সম্বন্ধে গত দশ বছরে যা লেখা হয়েছে তার অনেকখানিই দূষিত হয়ে আছে। ফলে, অপরপক্ষের কথা ও কাজকে সর্বদাই দুরভিসন্ধিমূলক, অর্থহীন, বা ভণ্ডামি হিসেবে দেখানো হয়। যাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লিখছেন তাদের মনের সঙ্গে একধরনের সংযোগ গড়ে তুলতে না পারলে ইতিহাস লেখা যায় না।

একমাত্র বর্তমানের চোখ দিয়েই আমরা অতীতকে দেখতে ও তার সম্বন্ধে বোধ অর্জন করতে পারি — এই হলো তৃতীয় দিক। ঐতিহাসিক তাঁর নিজের যুগের মানুষ এবং মানবিক অস্তিত্বের নানারকম অবস্থা দিয়ে সেই যুগের সঙ্গে বাঁধা। তিনি যে বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন — যেমন, গণতন্ত্র, সাম্রাজ্য, যুদ্ধ, বিপ্লব — তাদের সমকালীন ব্যঞ্জনা আছে, তার থেকে তিনি তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। প্রাচীনযুগের ঐতিহাসিকরা 'পোলিস' (নগর) ও 'প্লেবস্' (জনসাধারণ)-এর মতো শব্দ তাদের মূল রূপে ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন শুধু এই দেখানোর জন্য যে তাঁরা ঐ ফাঁদে

২১ জে বুর্কহার্ট, 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে বিচার' (জাজমেন্টস অন হিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্টোরিয়ানস), ১৯৫৯, পৃ ১৭৯।

পা দেন নি। এতে তাঁদের কোনো সুবিধে হয় না। তাঁরাও বাস করেন বর্তমানে; যেমন 'ক্লামিস' (গ্রীক পোশাক) বা 'টোগা' (রোমান পোশাক) পরে ক্লাসে বক্তৃতা দিলে তাঁরা আরও ভালো গ্রীক বা রোমান ঐতিহাসিক হতেন না, তেমনি বিভিন্ন অপরিচিত বা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের ঠকিয়ে তাঁরা অতীতে যেতে পারবেন না। পারী-র যে-জনতা ফরাসি বিপ্লবে এত মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল তাদের 'লে সাঁ-কুলোত', 'ল পিউপ্‌ল্', 'ল কানেই', 'লে ব্রা-নু' ইত্যাদি নামে বর্ণনা করেছেন একের পর এক ফরাসি ঐতিহাসিক। কিন্তু যারা ঘাঁতঘোঁত জানেন তাঁদের কাছে এই সব নামই একটি রাজনৈতিক আনুগত্য ও একটি বিশেষ ব্যাখ্যানের লক্ষণযুক্ত। তবুও ঐতিহাসিককে কোনো একটা শব্দ বেছে নিতেই হয়: ভাষার ব্যবহার তাঁকে নিরপেক্ষ হতে দেয় না। আর এটা শুধু শব্দের ব্যাপার নয়। গত একশ বছর ধরে ইওরোপে পরিবর্তিত ক্ষমতার পাল্লা মহান ফ্রেডেরিক সম্বন্ধে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মনোভাবকে উল্টে দিয়েছে। খ্রীস্টীয় গির্জার ভেতর ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্টবাদের মধ্যে পরিবর্তিত ক্ষমতার পাল্লা লোয়োলা, লুথার, ক্রমওয়েল প্রভৃতির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মনোভাবকে গভীরভাবে পাল্টে দিয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ওপর গত চল্লিশ বছর ধরে ফরাসি ঐতিহাসিকদের লেখাপত্র সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায়, ঐসব রচনা কত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব দিয়ে। ঐতিহাসিকের জায়গা বর্তমানে, অতীতে নয়। অধ্যাপক ট্রেভর-রোপর আমাদের বলেন, 'ঐতিহাসিকের উচিত অতীতকে ভালোবাসা'।[২২] এটি এক গোলমেলে অনুজ্ঞা। অতীতের প্রতি ভালোবাসা সহজেই প্রাচীন লোকজন ও প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে স্মৃতিকাতর রোমান্টিকতার প্রকাশে পরিণত হতে পারে, যা কিনা বর্তমান বা ভবিষ্যতে আস্থা ও আগ্রহ হারানোর এক লক্ষণ।[২৩] রিক্ত শব্দগুচ্ছের পাল্টা রিক্ত শব্দগুচ্ছ হিসেবে আমি বরঞ্চ 'অতীতের মৃত হাত' থেকে নিজেকে মুক্ত করাকেই পছন্দ করব। অতীতকে ভালোবাসা বা তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা — এ দুটোর কোনোটাই ঐতিহাসিকের কাজ

২২ জে বুর্কহার্ট-এর 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে বিচার'-এর ভূমিকা, ১৯৫৯, পৃ ১৭।

২৩ ইতিহাস সম্বন্ধে নিৎসে-র দৃষ্টিভঙ্গি তুলনীয়: 'বার্ধক্যের মধ্যে আছে বৃদ্ধের ফিরে তাকানোর কাজ ও তাঁর হিসেবপত্র মেলানো, অতীতের স্মৃতিতে, ঐতিহাসিক সংস্কৃতিতে সান্ত্বনার সন্ধান' ('এলোমেলো ভাবনা' (থট্‌স্ আউট অফ সিজ্‌ন), ইংরিজি তর্জমা, ১৯০৯,

নয়। বর্তমানকে জানার চাবিকাঠি হিসেবে অতীতকে কব্জা করা বা বোঝাই তাঁর কাজ।

অবশ্য আমি যাকে ইতিহাস সম্বন্ধে কলিংউডীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারি, ওপরের কথাগুলি যদি তার কিছু কিছু অন্তর্দৃষ্টি হয়, তাহলে এর কয়েকটি বিপদ নিয়ে বিবেচনা করার সময় হয়েছে। ইতিহাস তৈরিতে ঐতিহাসিকের ভূমিকার গুরুত্বকে যদি তার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে আসার জন্য চাপ দেওয়া হয়, তাহলে সবরকম বিষয়নিষ্ঠ ইতিহাসকে পুরোপুরি বাদ দেওয়ার ঝোঁক দেখা দেয়। ঐতিহাসিক যা তৈরি করেন ইতিহাস তা-ই। কলিংউড-এর সম্পাদক তাঁর অপ্রকাশিত যে-মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন তার থেকে মনে হয়, একসময়ে তিনিও সত্যিই এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন :

'ইতিহাসকে সেন্ট অগাস্টিন দেখেছেন আদি খ্রীস্টানের দৃষ্টিকোণ থেকে, তিলামঁ সতেরো শতকের ফরাসি দৃষ্টিকোণ থেকে ; গিবন, আঠেরো শতকের ইংরেজের ; মমসেন, উনিশ-শতকের জার্মান-এর দৃষ্টিকোণ থেকে। কোন্ দৃষ্টিকোণ সঠিক ছিল সে নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই যিনি যে-দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কাছে একমাত্র সেটাই সম্ভব ছিল।' [২৪]

এটি কিন্তু পুরোপুরি সংশয়বাদে এসে দাঁড়ায়। যেমন, ফ্রাউড-এর মন্তব্য, ইতিহাস 'শিশুর অক্ষরের বাক্স যা দিয়ে আমরা খুশিমতো যে-কোনো শব্দের বানান করতে পারি।' [২৫] 'কাঁচি-আর-আঠা মারা ইতিহাস', আর ইতিহাস শুধুই তথ্যের সংগ্রহ — এই যে মত, এই দুই-এর বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ায় কলিংউড ইতিহাসকে মাথা-খাটিয়ে-বানানো-একটা-কিছু হিসেবে গণ্য করার পক্ষে বিপজ্জনকভাবে কাছাকাছি এসে যান। সার জর্জ ক্লার্ক যে-সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন — ' "বিষয়নিষ্ঠ" ঐতিহাসিক তথ্য বলে কিছু নেই' (এই অংশটি আগেই উদ্ধৃত করেছি) — কলিংউড-এর প্রতিক্রিয়া সেখানেই ফিরে যায়। ইতিহাসের কোনো অর্থ নেই — এই তত্ত্বের বদলে এখানে আমাদের দেওয়া হয় অসংখ্য অর্থের তত্ত্ব, তার কোনোটিই অন্যটির চেয়ে বেশি ঠিক নয় — মোটের ওপর যা একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় তত্ত্বটি নিশ্চিতভাবে প্রথমটির মতোই টেঁকসই নয়। একটা পাহাড়কে

২৪ আর কলিংউড, 'ইতিহাসের ধারণা' (দ আইডিয়া অফ হিস্ট্রি), ১৯৪৬, পৃ (১২)।

২৫ এ ফ্রাউড, 'মহান বিষয় সম্বন্ধে ক্ষুদ্র চর্চা' (শর্ট স্টাডিজ অন গ্রেট সাবজেক্টস), খণ্ড ১, ১৮৯৪, পৃ ২১।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন আকৃতিতে দেখা যায়। তাই বলে এমন ধরে নেওয়া যায় না যে বিষয়নিষ্ঠার দিক থেকে তার আদৌ কোনো আকার নেই বা অসংখ্য আকার আছে। যেহেতু ইতিহাসের তথ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাখ্যান একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে এবং প্রচলিত কোনো ব্যাখ্যানই পুরোপুরি বিষয়নিষ্ঠ নয় — তার থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা যায় না যে, যে-কোনো ব্যাখ্যানই অন্য একটির মতোই উপযুক্ত আর ইতিহাসে বিভিন্ন তথ্য নীতিগতভাবে বিষয়নিষ্ঠ ব্যাখ্যানের অনুপযোগী। ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠা বলতে কী বোঝায় তা আমাকে পরবর্তী কোনো পর্যায়ে বিবেচনা করতে হবে।

কিন্তু কলিংউড-এর প্রকল্পের ক্ষেত্রে আরও বড় একটি বিপদ উঁকি মারে। অবধারিতভাবেই ঐতিহাসিক যদি তাঁর ইতিহাসের পর্বকে স্ব-কালের চোখ দিয়ে দেখেন এবং বর্তমানের সমস্যার চাবিকাঠি হিসেবে অতীতের সমস্যার চর্চা করেন, তাহলে কি তিনি তথ্যের ব্যাপারে পুরোপুরি প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পড়ে যাবেন না, আর সঠিক ব্যাখ্যানের মানদণ্ড হলো বর্তমানের কোনো উদ্দেশ্যসাধনে তার উপযোগিতা — এই ধারণাই পোষণ করবেন না? এই প্রকল্প অনুযায়ী ইতিহাসের তথ্য কিছুই নয়, ব্যাখ্যানই সব। এই নীতিটি নিৎসে আগেই ঘোষণা করেছেন : 'আমাদের কাছে কোনো মতের অসত্যতার কারণ তার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি আছে বলে নয়। ... প্রশ্ন হলো, ঐ মতটি জীবনকে কতখানি এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে সংরক্ষণ করে, সম্ভবত প্রজাতি সৃষ্টি করে।'[২৬] মার্কিন প্রয়োগবাদীরা, কম স্পষ্টভাবে ও কম পুরোদমে, একই পথ ধরে এগিয়েছিলেন। জ্ঞান মানে কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জ্ঞান। উদ্দেশ্যের কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে জ্ঞানের কার্যকারিতা। কিন্তু এমনকি যেখানে এই ধরনের কোনো তত্ত্বের কথা বলা হয় নি, সেখানেও তার প্রয়োগ প্রায়ই খানিক অস্বস্তিকর। আমার নিজের বিষয়চর্চার ক্ষেত্রে অসংযত ব্যাখ্যান দিয়ে তথ্যকে নির্মমভাবে পিষে দেওয়ার এত ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি যে এই বিপদের বাস্তব দিকটি মনে ছাপ ফেলেই। সোভিয়েত ও সোভিয়েত-বিরোধী ইতিহাস-রচনাধারার কিছু প্রান্তিক লেখাপত্র পড়লে যে মাঝেমাঝে বিশুদ্ধ তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের মায়াময় উনিশ-শতকী কোলে ফেরার জন্যে একধরনের স্মৃতিকাতরতা তৈরি হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

২৬ 'ভালো-মন্দ ছাড়িয়ে' (বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল), অধ্যায় ১।

মধ্য-বিশ শতকে, ঐতিহাসিকের তথ্য-আনুগত্যকে তাহলে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? আমি বিশ্বাস করি, বিভিন্ন তথ্য ও দলিলপত্রকে একেবারে খামখেয়ালিভাবে গণ্য করার অভিযোগ এড়াতে, হালে কয়েক বছর ধরে নানান দলিলপত্রের সন্ধানে ও নিরীক্ষায় এবং আমার ঐতিহাসিক বিবরণকে উপযুক্ত সঠীক তথ্যে ভরাট করার জন্যে আমি যথেষ্ট সময় খরচ করেছি। নিজের তথ্যকে সম্মান জানানো ঐতিহাসিকের কর্তব্য। কিন্তু তথ্য নির্ভুল হয়েছে কিনা সেটুকু দেখার দায় দিয়েই সে-কর্তব্য চুকে যায় না। যে-বিষয়ে তিনি নিযুক্ত ও যে-ব্যাখ্যানের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক যত তথ্য জানা আছে বা জানা যায় — সেগুলোকেও সামনে আনার চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে। ভিক্টোরীয় ইংরেজকে যদি তিনি নীতিবাদী ও যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে দেখাতে চান, তাহলে ১৮৫০ সালে স্ট্যালিব্রিজ ওয়েক্স্‌-এ কী হয়েছিল তা নিশ্চয়ই তিনি ভুলে যাবেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যে-ব্যাখ্যান ইতিহাসের প্রাণস্বরূপ — তাকে তিনি বাদ দেবেন। সাধারণ লোক — অর্থাৎ, পঠনপাঠনের জগতের বাইরের লোক অথবা যাঁরা অন্য বিষয় চর্চা করেন সেই বন্ধুরা — আমাকে মাঝেমাঝে জিজ্ঞাসা করেন, ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লেখেন, তখন তিনি কীভাবে এগোন। ঐতিহাসিক তাঁর কাজকে দুটি পরিস্কারভাবে আলাদা করার যোগ্য পর্ব বা সময়কালে ভাগ করে নেন — এটাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধারণা বলে মনে হয়। প্রথমে তিনি একটি দীর্ঘ প্রাথমিক পর্ব কাটিয়ে দেন তাঁর নানারকম তথ্যসূত্র পড়ে এবং নোটবইতে নানান তথ্য ভর্তি করে: তারপর যখন সে-কাজ চোকে, তিনি মূল বইপত্র সরিয়ে রেখে নোটবইগুলো বার করেন ও নিজের বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লিখে ফেলেন। এ-ছবি আমার কাছে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। আমার নিজের ক্ষেত্রে, যেগুলোকে আমি প্রধান প্রধান সূত্র বলে মনে করি তার কিছু হাতে পাই অমনি আঙুল নিশপিশ করে ও লিখতে শুরু করি। প্রথম থেকেই যে লেখা হবে তার কোনো মানে নেই — বরং কোনো একটা জায়গা থেকে, যে-কোনো জায়গা থেকে। তারপর পড়া ও লেখা চলতে থাকে। আমি যেমন যেমন পড়তে থাকি তার সঙ্গে সঙ্গে লেখায় যোগবিয়োগ চলতে থাকে, নতুন চেহারা দেওয়া হয়, কেটে বাদ দেওয়া হয়। লেখার মধ্যে দিয়েই পড়ার নির্দেশ ও পরিচালনা হয়, পড়া সার্থক হয়ে ওঠে: যতই লিখি ততই জানতে পারি কী খুঁজছি; আমি যা পাই তার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা আরও ভালো করে বুঝতে পারি। কলম, কাগজ বা টাইপরাইটার ব্যবহার না-করে কিছু ঐতিহাসিক হয়তো এসব প্রাথমিক লেখালেখি নিজেদের মাথাতেই সেরে নেন: ঠিক যেমন কিছু লোক বোর্ড বা ঘুঁটির সাহায্য ছাড়াই

নিজেদের মাথায় দাবা খেলেন। এই দক্ষতাকে আমি ঈর্ষা করি কিন্তু নকল করতে পারি না। আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস যে কেউ যদি সত্যিই ঐতিহাসিক হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে, যে-দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদরা 'প্রদান' ও 'প্রতিদান' বলেন সে দুটি একসঙ্গে চলতে থাকে এবং আসলে তারা একই প্রক্রিয়ার দুটি অংশ। কিন্তু আপনি যদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন আর একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে আপনি দুটি বিপ্রবণতার একটিতে পড়ে যাবেন। হয়, আপনি অর্থহীন তাৎপর্যহীন 'কাঁচি ও আঠা'-মার্কা ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার-কাহিনী বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। অতীতের তথ্যকে শুধু একধরনের লেখায় নক্‌শা করার কাজে ব্যবহার করা হবে যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

অতএব, ঐতিহাসিকের সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের বিচারের ফলে একটি আপাত-আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসে পড়তে হয়। ইতিহাস মানে বিষয়নিষ্ঠ তথ্যের সংগ্রহ, বিচার বিবেচনা ছাড়াই ব্যাখ্যানের ওপর তথ্যের প্রভুত্ব — এই নড়বড়ে তত্ত্বের কুমির, আর ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনের একটি বিষয়ীনিষ্ঠ ফসল, যিনি ইতিহাসের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ও ব্যাখ্যান-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আয়ত্তে আনেন — এই আরেকটি সমান নড়বড়ে তত্ত্বের বাঘ — এই দুই-এর মধ্যে, বা ইতিহাসের ভরকেন্দ্র আছে অতীতে ও তা আছে বর্তমানে — এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমরা যেন সাবধানে নৌকা বাইছি। কিন্তু যতটা মনে হয় আমাদের অবস্থা তার চেয়ে কম আশঙ্কাজনক। বিশেষ ও সাধারণ, অভিজ্ঞতাবাদী বা তাত্ত্বিক, বিষয়নিষ্ঠ বা বিষয়ীনিষ্ঠ — অন্যান্য রূপেও আবার আমরা তথ্য ও ব্যাখ্যানের এই একই দ্বিভাগের মুখোমুখি হব এই বক্তৃতামালায়। ঐতিহাসিকের সঙ্কট — মানবপ্রকৃতিরই প্রতিফলন। বোধহয় একেবারে প্রথম শৈশব ও অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ছাড়া মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে না ও নিঃশর্তভাবে তার অধীন হয় না। অন্যদিকে, সে কখনোই পরিবেশ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকে না ও তার নিঃশর্ত প্রভুও হয় না। মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক — ঐতিহাসিকের সঙ্গে তার বিষয়ের সম্পর্ক। ঐতিহাসিক তাঁর তথ্যের বিনীত দাস বা অত্যাচারী প্রভু — কোনোটাই নন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক — সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে-কোনো গবেষণারত ঐতিহাসিক যেমন জানেন, তিনি যখন চিন্তা করেন ও লেখেন তখন যদি কী করছেন তা ভাবার জন্য থামেন, তাহলে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যানের সঙ্গে

তথ্যকে গড়ে-পিঠে নেওয়ার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ায় তিনি নিযুক্ত থাকেন। এটা আগে, ওটা পরে — এমন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিকের কাজ আরম্ভ হয় বিভিন্ন তথ্যের তখনকার মতো বাছাই-করা দিয়ে, আর তখনকার মতো একটা ব্যাখ্যান যার সাহায্যে ঐ বাছাই করা হয়েছে — অন্যরা ও তিনি নিজেও যে বাছাই করেছেন — তা-ই দিয়ে। তিনি যখন কাজ করতে থাকেন তখন, বাছাই ও বিন্যাস — দু-এরই সূক্ষ্ম ও বোধহয় আংশিকভাবে অচেতন পরিবর্তন ঘটে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান ও অতীতের মধ্যেকার পরস্পর-সম্বন্ধও জড়িয়ে থাকে, কারণ ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ আর তথ্যগুলো অতীতের। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য — দু-এরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অমূল ও ব্যর্থ; ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। অতএব, 'কাকে বলে ইতিহাস?' — এই প্রশ্নে আমার প্রথম উত্তর ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এটি এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।

সমাজ ও ব্যক্তি

কে আগে — সমাজ না ব্যক্তি — প্রশ্নটা মুরগি আর ডিমের প্রশ্নের মতো। যুক্তিগ্রাহ্য প্রশ্ন বা ঐতিহাসিক প্রশ্ন — যেভাবেই বিচার করুন না কেন, আপনি এ বিষয়ে এমন কোনো বক্তব্য রাখতে পারবেন না যেটিকে কোনো-না-কোনোভাবে আর-একটি উল্টো, ও সমান একপেশে বক্তব্য দিয়ে শুধরে নিতে না হবে। সমাজ ও ব্যক্তি অবিচ্ছেদ্য, একে অপরের দরকারি ও পরিপূরক, উল্টো নয়। ডন-এর বিখ্যাত কথায়: 'কোনো মানুষই দ্বীপ নয়, নিজেতে পরিপূর্ণ নয়; প্রত্যেক মানুষ মহাদেশের খণ্ড, সাগরেরই অংশ।'[১] এ হলো সত্যের এক দিক। অন্যদিকে ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জেমস স্টুয়ার্ট মিল-এর সূত্রটির কথা ধরুন: 'মানুষকে একত্র করলে তারা অন্য ধরনের একটি পদার্থে পরিণত হয় না।'[২] নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু 'একত্র করা'র আগে মানুষ ছিল, বা একধরনের পদার্থ ছিল — এমন ধরে নেওয়াই ভুল। আমাদের জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী আমাদের ওপর কাজ করতে থাকে ও আমাদের পরিণত করে নেহাতই জৈবিক থেকে সামাজিক এককে। ইতিহাস ও প্রাগ্-ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ের প্রত্যেকটি মানুষ জন্মেছে কোনো সমাজের মধ্যে ও একেবারে গোড়া থেকেই সমাজ তাকে গড়েপিটে নিয়েছে। যে-ভাষা সে বলে সেটি ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার নয়, বরঞ্চ যে-গোষ্ঠীতে সে বড় হয়ে উঠেছে সেখান থেকে একটি সামাজিক আহরণ। ভাষা ও পরিবেশ — দুই-ই তার চিন্তার চরিত্র ঠিক করতে সাহায্য করে; একেবারে প্রথম ধারণাগুলো তার কাছে আসে অন্যদের কাছ থেকে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হবে একই সঙ্গে বাক্‌হীন ও মনোহীন — কথাটা দিব্যি। রবিনসন ক্রুশোর অতিকথার যে দীর্ঘস্থায়ী আকর্ষণ আছে তার কারণ এই অতিকথায় সমাজনিরপেক্ষ এক ব্যক্তিকে কল্পনা করার চেষ্টা হয়েছে। সে চেষ্টা টেঁকে না। রবিনসন কোনো বিমূর্ত ব্যক্তি নয়, বরঞ্চ ইয়র্ক-এর এক ইংরেজ। তিনি তাঁর বাইবেল সঙ্গে রাখেন ও তাঁর জনগোষ্ঠীর দেবতার কাছে

১ 'জায়মান ঘটনাবলি সম্পর্কিত ধর্মীয় রচনা' (ডিভোশন্‌স্ আপন ইমার্জেন্ট অকেশন্‌স্), নং ১৭।

২ জে এস মিল, 'ন্যায়পদ্ধতি' (আ সিস্টেম অফ লজিক), পর্ব ৭, ১।

প্রার্থনা করেন। অতিকথায় রবিনসন-এর কাছে তাড়াতাড়ি তাঁর ম্যান ফ্রাইডে এসে যায়; শুরু হয় এক নতুন সমাজ গড়ার কাজ। অন্য প্রাসঙ্গিক অতিকথাটি হলো ডস্টয়ভ্স্কি-র 'শয়তানের দল' (ডেভিলস)-এ কিরিলভ-এর অতিকথা। তাঁর অবাধ স্বাধীনতা প্রমাণ করার জন্য তিনি আত্মঘাতী হন। অবাধ স্বাধীন কাজ হিসেবে ব্যক্তিমানুষের কাছে একমাত্র আত্মহত্যার পথ খোলা আছে, অন্য যে-কোনো কাজে কোনো-না-কোনো ভাবে সমাজের সঙ্গে তার সংযুক্তি জড়িয়ে থাকে।[৩]

নৃতত্ত্ববিদরা সাধারণভাবে বলেন যে আদিম মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কম এবং তার সমাজ তাকে সভ্য মানুষের চেয়ে আরও পুরোপুরি গড়েপিটে নেয়। এর মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। বেশি সরল সমাজেব ধাঁচটা হয় আরও নিখাঁজ — এই অর্থে যে আরও জটিল ও উন্নত সমাজের তুলনায় সেখানে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও পেশার অনেক কম বৈচিত্র্য দরকার পড়ে ও তার সুযোগও কম পাওয়া যায়। এই হিসেবে বিবর্ধমান ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণ আধুনিক উন্নত সমাজের এক অবধারিত সৃষ্টি; ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত তার সবরকম কার্যকলাপের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণের এই প্রক্রিয়া আর সমাজের পরিবর্ধমান শক্তি ও সমন্বয়ের মধ্যে একটি বিপক্ষতা খাড়া করতে চাইলে মারাত্মক ভুল হবে। সমাজের বিকাশ ও ব্যক্তিমানুষের বিকাশ একই সঙ্গে চলতে থাকে, একটি অন্যের শর্তাধীন। জটিল ও উন্নত সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি সেটি নিঃসন্দেহে এমন একটি সমাজ যেখানে একের ওপর অন্য ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নানারকম উন্নত ও জটিল রূপ নিয়েছে। কোনো আধুনিক জাতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে তার ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও চিন্তা গড়েপিটে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে খানিকটা সাযুজ্য ও অভিন্নতা তৈরির ক্ষমতা যে আদিম জনগোষ্ঠীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে কম — এমন ধরে নেওয়ার অনেক বিপদ আছে। জৈবিক বিভেদই জাতীয় চরিত্রের ভিত্তি — এই পুরনো ধারণাটি চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু সমাজ ও শিক্ষার বিভিন্ন জাতীয় পটভূমিকাজাত জাতীয় চরিত্রের বিভিন্ন পার্থক্য অস্বীকার করা কঠিন। 'মানবপ্রকৃতি' বলে ধরাছোঁয়ার বাইরে সেই সত্তা, দেশে-দেশে ও শতাব্দী

৩ আত্মহত্যা সম্বন্ধে ডুর্কহাইম-এর গবেষণা সুপরিচিত। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অবস্থা নির্দেশ করার জন্য তিনি চয়ন করেছিলেন 'আনোমি' শব্দটি। ব্যক্তির এই অবস্থা আবেগঘটিত অস্থিরতা ও আত্মহত্যার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। কিন্তু ডুর্কহাইম এও দেখিয়েছেন যে আত্মহত্যা কোনোভাবেই সামাজিক অবস্থা-নিরপেক্ষ নয়।

থেকে শতাব্দীতে তা এত বেশি পাল্টেছে যে, প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও প্রথার মাধ্যমে রূপান্তরিত একটি ঐতিহাসিক সংঘটন ছাড়া এটিকে আর অন্যকিছু বলে গণ্য করা মুশকিল। ধরা যাক, মার্কিন, রুশ ও ভারতীয়দের মধ্যে অনেকরকম তফাত আছে। কিন্তু এইসব তফাতের কয়েকটি — আর সেগুলো বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — ব্যক্তিমানুষের মধ্যে নানান সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির চেহারা নেয়, বা অন্য কথায়, যে-পথে সমাজ গঠন করা উচিত সেই পথে যায়। অতএব, মার্কিন, রুশ ও ভারতীয় সমাজের পার্থক্য অনুধাবন করাই সব মিলিয়ে মার্কিন, রুশ ও ভারতীয় ব্যক্তিমানুষের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের সবচেয়ে ভালো উপায় হিসেবে দেখা দিতে পারে। আদিম মানুষের মতোই সভ্য মানুষকেও সমাজই গড়ে নেয়, ঠিক যেমন কার্যকরভাবে সে গড়ে নেয় সমাজকে। আপনি যেমন মুরগি ছাড়া ডিম পাবেন না, তেমনি ডিম ছাড়া মুরগি হবে না।

এইসব অবধারিত সত্য নিয়ে আলোচনার দরকার হতো না। কিন্তু ঘটনা হলো, ইতিহাসের এক লক্ষণীয় ও অসাধারণ পর্যায় এগুলোকে আমাদের কাছে আবছা করে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জগৎ এর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসছে। বিভিন্ন আধুনিক ঐতিহাসিক অতিকথার মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ভজনা। বুর্কহার্ট-এর 'ইটালিতে নবজাগরণের সভ্যতা' (সিভিলাইজ়েশন অফ দ রেনেসাঁস ইন ইটালি) বইটির দ্বিতীয় অংশের উপনাম 'ব্যক্তির বিকাশ'। তাঁর সুপরিচিত বিবরণ অনুযায়ী, ব্যক্তির ভজনা শুরু হয়েছিল নবজাগরণ থেকে, যখন মানুষ, যে 'এতদিন শুধু জাতি, গণ, দল, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে নিজের সম্বন্ধে সচেতন ছিল,' সে শেষ পর্যন্ত 'পরিণত হলো আত্মিক ব্যক্তিতে আর নিজেকে সেইভাবেই চিনতে পারল'। পরবর্তীকালে এই ভজনা যুক্ত হলো পুঁজিবাদ ও প্রটেস্ট্যান্টবাদের উত্থানের সঙ্গে, শিল্পবিপ্লবের সূচনার সঙ্গে, অবাধ বাণিজ্যনীতির সঙ্গে। ফরাসি বিপ্লবে ঘোষিত মানুষ ও নাগরিকের বিভিন্ন অধিকার ছিল ব্যক্তির অধিকার। উনিশ শতকের মহান উপযোগবাদ-দর্শনের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ভিক্টোরীয় উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দলিল, মর্লি-র নিবন্ধ 'আপোস প্রসঙ্গে' (অন কমপ্রোমাইজ) তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও উপযোগবাদকে বলা হয়েছে 'মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম'। 'রুক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' ছিল মানুষের প্রগতির মূল সুর। কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বের যে ভাবাদর্শ — এটি তার নিখুঁত, যথার্থ ও বৈধ বিশ্লেষণ হতে পারে। কিন্তু যে-কথা পরিষ্কার

বলতে চাই তা হলো, আধুনিক জগতের উত্থানের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বতন্ত্রীকরণের যে বৃদ্ধি হয় সেটি ছিল অগ্রগামী সভ্যতার এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নতুন নতুন সামাজিক গোষ্ঠীকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছিল এক সামাজিক বিপ্লব। বরাবরের মতোই ব্যক্তিগত বিকাশের বিভিন্ন নতুন সুযোগ দিয়ে এটি ক্রিয়াশীল হয়েছিল ব্যক্তিদেরই মাধ্যমে; আর যেহেতু পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরে উৎপাদন ও বণ্টনের বিভিন্ন এককের বেশিরভাগই ছিল এক-একজন ব্যক্তির হাতে, নতুন সামাজিক বিন্যাসের ভাবাদর্শ তাই জোরালো গুরুত্ব দিয়েছিল ঐ বিন্যাসে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকার ওপর। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল ঐতিহাসিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ বা সামাজিক বাঁধন থেকে ব্যক্তির মুক্তি — এভাবে এর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

পশ্চিমী জগৎ ছিল এই বিকাশ ও এই ভাবাদর্শের ফোকাস। কিন্তু নানান লক্ষণ থেকে আভাস পাওয়া যায় যে এমনকি সেখানেই ইতিহাসের এই পর্যায় তার পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। যাকে সর্বসাধারণের গণতন্ত্র বলা হয়, তার উত্থান ও মুখ্যত ব্যক্তিগত ধাঁচের বদলে ধীরে ধীরে যৌথ ধাঁচের আর্থনীতিক উৎপাদন ও সংগঠন — এই দু-এর ওপর এখানে আমার জোর দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এই দীর্ঘ ও সুফল পর্বে গড়ে-ওঠা ভাবাদর্শটি পশ্চিম ইওরোপ ও সমস্ত ইংরিজিভাষী দেশের ক্ষেত্রে এখনও এক প্রতিপত্তিশালী শক্তি। আমরা যখন স্বাধীনতা ও সাম্য, বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচাবেব মধ্যে টানাপোড়েন নিয়ে বিমূর্তভাবে কথা বলি, তখন লড়াইটা যে বিমূর্ত ধারণার মধ্যে হয় না তা ভুলে যাওয়ার ঝোঁক দেখা যায়। এগুলো ঠিক সেই অর্থে ব্যক্তিদের ভেতর বা সমাজের ভেতর লড়াই নয়, বরঞ্চ সমাজে ব্যক্তিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই: প্রত্যেক গোষ্ঠীই তার পক্ষে অনুকূল সামাজিক নীতিকে এগিয়ে নেওয়ার ও প্রতিকূল নীতিকে বিফল করার চেষ্টা করছে। এক বিরাট সামাজিক আন্দোলন — ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আর সে-অর্থ নেই। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধ — এই অর্থে এটি আজ একটি স্বার্থবান গোষ্ঠীর স্লোগানে পরিণত হয়েছে। আর এর চরিত্র বিতর্কমূলক হওয়ার ফলে, দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে আমাদের বোধের পথে এটি দাঁড়িয়েছে বাধা হয়ে। ব্যক্তিকে উপায় আর সমাজ বা রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রূপে গণ্য করে যে-বিকৃতি, তার প্রতিবাদ-স্বরূপ যে-ব্যক্তিতন্ত্র — তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু এক বিমূর্ত ব্যক্তি সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে — এই প্রকল্প

নিয়ে আমরা যদি কাজ করার চেষ্টা করি তাহলে অতীত বা বর্তমান কারও ক্ষেত্রেই কোনো প্রকৃত বোধে এসে পৌঁছব না।

এতক্ষণ ধরে যে অন্য বিষয়ে চলে গিয়েছিলুম, এর থেকেই অবশেষে তার আসল কথায় আসা গেল। সাধারণ বুদ্ধিতে ইতিহাস বলতে বোঝায় বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি যা লিখেছেন। উনিশ শতকের উদারনীতিক ঐতিহাসিকরা নিশ্চিতভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন, আর তার স্থূলে ভুল নেই। কিন্তু এখন এটিকে অতি সরলীকৃত ও অপর্যাপ্ত বলে মনে হয় এবং আমাদের আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। ঐতিহাসিকের জ্ঞান তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে না: এই জ্ঞান সঞ্চয়ে প্রচুর মানুষ, সম্ভবত অনেক প্রজন্মের ও বহু বিভিন্ন দেশের মানুষ যোগ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক যেসব মানুষের কার্যকলাপ অনুধাবন করেন তাঁরা শূন্যে কর্মরত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নন: তাঁরা কাজ করেছিলেন অতীতের এক সমাজের প্রসঙ্গসূত্রে ও উদ্দীপনার অধীনে। আগের বক্তৃতায় আমি ইতিহাসকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি প্রক্রিয়া, বর্তমানের ঐতিহাসিক ও অতীতের তথ্যের মধ্যে সংলাপ বলে বর্ণনা করেছি। এই সমীকরণের দুদিকের ব্যক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের আপেক্ষিক ভার সম্বন্ধে আমি এবার সন্ধান করতে চাই। ঐতিহাসিক কতখানি একক ব্যক্তি ও কতখানি তাঁর সমাজ ও তাঁর কালপর্বের ফসল? ইতিহাসের তথ্য কতখানি একক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তথ্য আর কতখানি সামাজিক সত্য?

তাহলে ঐতিহাসিক একজন ব্যক্তিমানুষ। অন্যান্য ব্যক্তির মতো তিনিও একটি সামাজিক সংঘটন, যে-সমাজে তিনি বাস করেন তার ফসল এবং সচেতন ও অচেতন মুখপাত্র — দুই-ই। এই অধিকারবলেই তিনি অতীত ইতিহাসের তথ্যের দিকে হাত বাড়ান। ইতিহাসের গতিপথকে আমরা মাঝে মাঝে 'চলমান মিছিল' বলি। রূপকটি ভালোই, যদি-না এর ফলে ঐতিহাসিক নিজেকে নির্জন খাড়াই থেকে চারপাশ সমীক্ষণরত কোনো ঈগল বা সম্ভাষণমঞ্চে দাঁড়ানো কোনো তাবড় লোক হিসেবে ভাবতে প্রলুব্ধ হন। তেমন কিছুই নয়! ঐতিহাসিক হলেন মিছিলের অন্য এক অংশে পা টেনে টেনে চলা আর-একটি আবছা চেহারা মাত্র। আর মিছিল যখন এগোতে থাকে, একবার ডান দিকে বেঁকে, একবার বাঁ দিকে, আবার কখনও পুরোটাই ফিরে এসে, তখন যেমন মিছিলের নানান অংশের আপেক্ষিক অবস্থান সারাক্ষণ পাল্টাতে থাকে, তেমনি এমন বললে কোনো ভুল হবে না

যে, এক শতক আগে আমাদের দাদুর দাদুদের থেকে আমরা আজ মধ্যযুগের বেশি কাছে, বা দান্তের যুগ থেকে সিজার-এর যুগ আমাদের বেশি কাছে। মিছিল ও তার সঙ্গে ঐতিহাসিক চলতে থাকলে নব নব দিগন্ত, নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সততই বেরিয়ে আসে। ঐতিহাসিক ইতিহাসেরই অংশ। মিছিলের যে-বিন্দুতে ঐতিহাসিক নিজেকে খুঁজে পান সেই বিন্দুটিই অতীত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণ ঠিক করে দেয়।

ঐতিহাসিক যে-পর্বটি বিচার করেন সেটি তাঁর নিজের সময় থেকে দূরে হলেও এই স্বতঃসিদ্ধটি কম সত্য হয়ে যায় না। আমি যখন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করতুম তখন — বোধহয় এখনও — এ বিষয়ের ওপর চিরায়ত লেখা বলতে ছিল গ্রোট-এর 'গ্রীসের ইতিহাস' (হিস্ট্রি অফ গ্রীস) ও মমসেন-এর রোমের ইতিহাস' (হিস্ট্রি অফ রোম)। গ্রোট ছিলেন একজন সুশিক্ষিত র‍্যাডিক্যাল ব্যাঙ্কার। বইটি তিনি লিখেছিলেন ১৮৪০-এর দশকে। এথেনীয় গণতন্ত্রের এক আদর্শায়িত ছবি এঁকে তার ভেতর তিনি উঠতি ও রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল ব্রিটিশ মধ্যশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ দিলেন। এখানে পেরিক্লিস-কে দেখা যায় বেন্থামপন্থী সংস্কারবাদী হিসেবে, আর বেখেয়ালেই এথেন্স-এর হাতে এসে গিয়েছিল একটা সাম্রাজ্য। গ্রোট যে গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন সেই গোষ্ঠী নতুন ইংল্যান্ডের কলকারখানার শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে নি। আর তাঁর লেখায় এথেন্স-এর দাসপ্রথার সমস্যা বিষয়ে যে অবহেলা দেখা যায় তা ঐ ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে — এ রকম প্রস্তাব করলে সেটি অলীক কল্পনা হবে না। মমসেন ছিলেন জার্মান উদারনীতিক, তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল ১৮৪৮-৯ সালের জার্মান বিপ্লবের ঘূর্ণি ও লাঞ্ছনায়। ১৮৫০-এর দশকে লিখতে গিয়ে — যে দশকে স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি (রেয়ালপোলিটিক)-র অভিধা ও ধারণার জন্ম হয় — মমসেন এই বোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, একজন শক্তিমান মানুষ দরকার। জার্মান জনগণ তাঁদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে না-পারার ফলে যে এলোমেলো অবস্থা তৈরি হয়েছে, তিনি তার সব ঠিকঠাক করে দেবেন। সবাই জানেন, সিজার-কে আদর্শ পুরুষ হিসেবে দেখিয়েছিলেন মমসেন। কিন্তু আমরা তাঁর ইতিহাসকে কখনোই ঠিকমতো কদর করতে পারব না যদি-না আমরা বুঝি যে, মমসেন-এর এই সিজার-স্তুতি জার্মানিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এক শক্তিমান মানুষের জন্য আকুলতার ফসল। আর আইনজীবী-রাজনীতিক সিসেরো, সেই নিষ্কর্মা, বাচাল ও পাঁকাল মাছের মতো দীর্ঘসূত্রী লোকটি যেন ১৮৪৮-এর ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ পাউলিকির্শে-র

আলোচনা থেকে সোজা হেঁটে বেরিয়ে এলেন। গ্রোট-এর 'গ্রীসের ইতিহাস' ১৮৪০-এর দশকের ইংরেজ দার্শনিক র‍্যাডিকালদের সম্বন্ধে আজ ঠিক ততটাই জানাতে পারবে, যতটা পারবে খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকের এথেনীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে। অথবা, ১৮৪৮-এ জার্মান উদারনীতিকদের কী অবস্থা হয়েছিল — কেউ তা জানতে চাইলে তাঁর উচিত মমসেন-এর 'রোমের ইতিহাস'-কে অন্যতম পাঠ্যবই হিসেবে মেনে নেওয়া — কেউ যদি এই ধরনের কথা বলেন, তাকে একটা ভয়ানক কূটাভাস বলে আমি মনে করি না। বা, এর ফলে ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে তাদের মর্যাদা কমবে না। মমসেন-এর মহত্বের ভিত্তি হলো তাঁর সংগৃহীত প্রত্নলেখের পরিমাণ ও রোমান সাংবিধানিক আইন নিয়ে কাজ, তাঁর 'রোমের ইতিহাস' নয় — ব্যুরি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় এইরকম অনুমান করার যে ধারা প্রবর্তন করেছেন তা আমার পক্ষে অসহ্য। এ হলো ইতিহাসকে সঙ্কলনের স্তরে নামিয়ে আনা। ঐতিহাসিকের অতীতদর্শন যখন বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দীপ্ত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই মহান ইতিহাস লেখা হয়। মমসেন যে সাধারণতন্ত্রের পতনের পর তাঁর ইতিহাস আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি — প্রায়ই এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। সময়, সুযোগ বা জ্ঞান — কোনোটারই তাঁর অভাব ছিল না। কিন্তু মমসেন যখন ইতিহাস লিখেছিলেন তখনও জার্মানিতে শক্তিমান পুরুষ উঠে আসেন নি। শক্তিমান পুরুষ একবার হাল ধরার পর কী হয়েছিল সেই সমস্যা মমসেন-এর সক্রিয় কর্মজীবনে তখনও বাস্তব রূপ নেয় নি। এই সমস্যাকে পিছিয়ে নিয়ে রোমান পটভূমিকায় প্রক্ষেপ করার মতো প্রেরণা মমসেন কোনো কিছুর থেকেই পান নি ; আর সাম্রাজ্যের ইতিহাস অলিখিতই রয়ে গেল।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত বাড়ানো সহজ। যে হুইগ ঐতিহ্যে জি এম ট্রেভেলিয়ান বড় হয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে আমি তাঁর 'রানী অ্যান-এর অধীনে ইংল্যান্ড' (ইংল্যান্ড আন্ডার কুইন অ্যান)- কে আমার শেষ বক্তৃতায় শ্রদ্ধা জানিয়েছিলুম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লেখাপড়ার জগতে আবির্ভাব ঘটে সার লিউইস নেমিয়ার-এর, যাঁকে আমাদের অনেকেই সবচেয়ে বড় ব্রিটিশ ঐতিহাসিক বলে মনে করেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর ও তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্ব নিয়ে এবার বিবেচনা করা যাক। নেমিয়ার ছিলেন সাচ্চা রক্ষণশীল — মার্কামারা ইংরেজ রক্ষণশীল নয়, যাকে খোঁচালে ৭৫ শতাংশ উদারনীতিক বেরিয়ে আসে, বরং একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখা যায় নি এমন একজন রক্ষণশীল। গত শতকের মাঝামাঝি ও ১৯১৪-র

মধ্যে একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের পক্ষে আরও ভালোর দিকে পরিবর্তন ছাড়া ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধারণা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। ১৯২০-র দশকে আমরা একটা কালপর্বে এসে ঢুকলুম যেখানে পরিবর্তন যুক্ত হতে শুরু করছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয়ের সঙ্গে, এবং তাকে আরও খারাপের দিকে পরিবর্তন হিসেবে ভাবা যেত — এটি ছিল রক্ষণশীল চিন্তার পুনর্জন্মের পর্ব। অ্যাক্টন-এর উদারনীতিবাদের মতো নেমিয়ার-এর রক্ষণশীলতা তার শক্তি ও গভীরতা দুই-ই খুঁজে পেল এক মহাদেশীয় পটভূমিতে প্রোথিত মূল থেকে।[৪] ফিশার বা টয়েন্‌বি-র মতো, উনিশ-শতকী উদারনীতিবাদে নেমিয়ার-এর কোনো শিকড় ছিল না এবং তার জন্য তিনি কোনো স্মৃতিকাতর দুঃখে পীড়িত হন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও নিস্ফল শান্তির পর উদারনীতিবাদের দেউলিয়া অবস্থা ধরা পড়ে গেল। তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারত সমাজবাদ বা রক্ষণশীলতা — এই দুই রূপের যে-কোনো একটিতে। নেমিয়ার আবির্ভূত হলেন রক্ষণশীল ঐতিহাসিক রূপে। তিনি তাঁর পছন্দসই দুটি ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন এবং দুটো পছন্দই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন সেই শেষ পর্বে, যেখানে এক সুশৃঙ্খল ও মূলত নিস্তরঙ্গ সমাজে, মর্যাদা ও ক্ষমতার যুক্তিসঙ্গত সন্ধানে শাসকশ্রেণী আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিল। নেমিযার-এর বিরুদ্ধে একজন অভিযোগ করেছেন: তিনি ইতিহাস থেকে মনকে বাদ দিয়েছেন।[৫] এটি হয়তো খুব একটা সঙ্গত উক্তি নয়, কিন্তু সমালোচক কী বলতে চাইছেন তা বোঝা যায়। তৃতীয় জর্জ-এর সিংহাসন লাভের সময়ে রাজনীতি তখনও বিভিন্ন ধ্যানধারণার প্রতি অতিপ্রত্যয়, এবং প্রগতিতে আবেগতীব্র বিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিল — ফরাসি বিপ্লবের পরেই এগুলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিজয়দীপ্ত উদারনীতিবাদী শতকের সূচনা করে। ধ্যানধারণা, বিপ্লব, উদারনীতিবাদ — এসবের কোনোটাই নয়: নেমিয়ার আমাদের এমন এক যুগের উজ্জ্বল ছবি উপহার

৪ এও বোধহয উল্লেখযোগ্য যে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিবেচনার যোগ্য রক্ষণশীল ব্রিটিশ লেখক ছিলেন আব মাত্র একজনই এবং সেই টি এস এলিঅট- ও অ-ব্রিটিশ পশ্চাৎপটের সুবিধা ভোগ করেছিলেন; ১৯১৪-ব আগে গ্রেট ব্রিটেনে লালিত কেউই উদারনীতিক ঐতিহ্যের সঙ্কোচক প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

৫ **'ইতিহাস সম্পর্কে নেমিয়ার-এর দৃষ্টিভঙ্গি'র মূল সমালোচনাটি ছিল ২৮ অগাস্ট ১৯৫৩-র 'দ টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট' এ এক অজ্ঞাতনামা লেখকের প্রবন্ধে। সেটি এইরকম: 'ডারউইন-এর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল বিশ্ব থেকে মনকে কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ। আর স্যর লিউইস ছিলেন রাজনৈতিক ইতিহাসের ডারউইন — একাধিক অর্থে।'**

দেওয়ার জন্য বেছে নিলেন যা তখনও এইসব বিপদ থেকে নিরাপদ — যদিও বেশিদিন তেমন থাকবে না।

কিন্তু নেমিয়ার-এর বিষয় নির্বাচনও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক সব মহান বিপ্লব, ইংরেজ, ফরাসি ও রুশ, এদের তিনি পাশ কাটিয়ে গেলেন — তাদের কোনোটার সম্বন্ধেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তিনি লেখেন নি। আমাদের সামনে তিনি ১৮৪৮-এর ইওরোপীয় বিপ্লবের একটি অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ উপস্থিত করবেন বলে মনস্থ করলেন — এটি এমন এক বিপ্লব যা ব্যর্থ হয়েছিল, সারা ইওরোপ জুড়ে উদারনীতিবাদের জাগ্রত আশাকে পিছিয়ে দিয়েছিল, সশস্ত্র শক্তির সামনে ধ্যানধারণার অন্তঃসারশূন্যতা, সৈন্যদের মুখোমুখি হলে গণতন্ত্রীদের অন্তঃসারশূন্যতার এক দৃষ্টান্ত। রাজনীতির অচপল কাজকর্মে ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ নিষ্ফল ও বিপজ্জনক: এই অপমানজনক ব্যর্থতাকে 'বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব' আখ্যা দিয়ে নেমিয়ার এই নীতিশিক্ষাটি ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের সিদ্ধান্ত শুধু অনুমানের ব্যাপার নয়; কারণ, ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে গুছিয়ে কিছু না লিখলেও, কয়েকবছর আগে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তাঁর স্বভাবসম্মত স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণভাবে তিনি নিজের মতামত জানিয়েছেন। 'অতএব, রাজনৈতিক মতবাদ ও অন্ধবিশ্বাস দিয়ে', তিনি লেখেন, 'মানুষ তার মনের মুক্ত বিচরণ যত কম বদ্ধ করে রাখে ততই তার চিন্তাভাবনার পক্ষে ভালো।' ইতিহাস থেকে তিনি মন বাদ দিয়েছেন, এই অভিযোগ উল্লেখ করে (অস্বীকার করে নয়), তিনি আরও বলেছেন:

'এদেশে সাধারণ রাজনীতিতে এখন এক 'শান্ত নিস্তরঙ্গ ভাব' ও যুক্তিতর্কের অনুপস্থিতি সম্পর্কে কিছু রাষ্ট্রীয় দার্শনিক অভিযোগ করেন; বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট সমস্যার জন্য ব্যবহারিক সমাধান খোঁজা হয় আর দু পক্ষই কর্মসূচি ও আদর্শ ভুলে যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই মনোভাব এক বৃহত্তর জাতীয় বয়ঃপ্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর রাষ্ট্রীয় দর্শনের ক্রিয়াকলাপে ব্যাহত না-হয়ে এটি যেন দীর্ঘদিন চলতে থাকে — আমি শুধু এই ইচ্ছাই করতে পারি।'[৬]

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি এখন আলোচনা করতে চাই না: পরের কোনো বক্তৃতার জন্য সেটি মুলতুবি রাখছি। এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু দুটি

৬ এল নেমিয়ার, 'ব্যক্তি ও শক্তি' (পারসোনালিটিজ অ্যান্ড পাওয়ারস), ১৯৫৫, পৃ ৫, ৭।

গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে চোখের সামনে হাজির করা: এক, কোন্ অবস্থানবিন্দু থেকে ঐতিহাসিক তাঁর কাজের দিকে এগিয়েছেন প্রথমেই তা ধরতে না পারলে আপনি তাঁর কাজ পুরোপুরি বুঝতে বা কদর করতে পারবেন না; দুই, ঐ অবস্থানবিন্দু নিজেই একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রোথিত। ভুলে যাবেন না, মার্কস যেমন একবার বলেছিলেন, শিক্ষককেই শিক্ষিত করতে হয়; এখনকার বুলিতে, মগজ-ধোলাইকারীর মগজটাই ধোলাই হয়ে গেছে। ইতিহাস লিখতে শুরু করার আগেই, ঐতিহাসিক ইতিহাসেরই ফসল।

যেসব ঐতিহাসিকের কথা আমি এইমাত্র বলেছি — গ্রোট, মমসেন, ট্রেভেলিয়ান ও নেমিয়ার — তাঁদের প্রত্যেকেই, বলতে গেলে, একই সামাজিক ও রাজনৈতিক ছাঁচে ঢালাই হয়েছিলেন। তাঁদের গোড়ার ও পরের কাজের মধ্যে বিচারভঙ্গির কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনের যুগের কিছু ঐতিহাসিক তাঁদের লেখাপত্রে শুধু একটি সমাজ ও একটি সামাজিক বিন্যাসের নয়, বরং এক সার বিন্যাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ বিষয়ে আমার জানা সবচেয়ে ভালো উদাহরণ মহান জার্মান ঐতিহাসিক মাইনেকে। এঁর জীবন ও কার্যকাল ছিল অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ, আর তাঁর দেশের ভাগ্যে এক সার বৈপ্লবিক ও বিপর্যয়সূচক পরিবর্তন জুড়ে ব্যাপ্ত। ফলত তিনজন আলাদা আলাদা মাইনেকে-কে পাওয়া যায়, প্রত্যেকেই এক-একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক যুগের মুখপাত্র ও প্রত্যেকেই তাঁর তিনটি প্রধান রচনার এক-একটির মাধ্যমে কথা বলেন। ১৯০৭-এ প্রকাশিত 'বিশ্বনাগরিকত্ব ও জাতীয় রাষ্ট্র' (ভেল্টব্যুর্গেরটুম উন্ড নাৎশিওনালস্টাট)-এর মাইনেকে আস্থাভরে লক্ষ্য করেন, বিসমার্কীয় রাইখ-এ জার্মান জাতীয় আদর্শ বাস্তবরূপ পাচ্ছে — আর মাৎসিনি থেকে শুরু করে উনিশ শতকের অনেক চিন্তাবিদের মতো — তিনিও জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিত করেন সর্বজনতন্ত্রের উচ্চতম রূপের সঙ্গে: এটি বিসমার্ক-এর যুগের উদ্ভট (বারোক) ভিল্‌হেল্‌মিনে উত্তরকাণ্ডের পরিণাম। ১৯২৫-এ প্রকাশিত 'রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের ধারণা' (ডি ইডে ড্যের স্টাট্‌স্‌রেইজ্‌ন)-এর মাইনেকে কথা বলেন ভাইমার সাধারণতন্ত্রের বিভক্ত ও বিমূঢ় মন নিয়ে: রাজনীতির জগৎ পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় কারণ ও রাজনীতি-বহির্ভূত এক নৈতিকতার অসমাধিত বিরোধের রণভূমিতে, কিন্তু সেই নৈতিকতা শেষ অবস্থাতেও রাষ্ট্রের জীবন ও নিরাপত্তার ওপরে যেতে পারে না। শেষত, ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'ইতিহাসবাদের উৎপত্তি' (ডি এন্ট্‌স্টেহুং ডেস হিস্টোরিসমুস)-র মাইনেকে, যখন নাৎসি বন্যা তাঁর

বিদ্যাচর্চার সব সম্মান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যে-ইতিহাসবাদ 'যা আছে, তা-ই ঠিক'-কে স্বীকৃতি দিচ্ছে বলে মনে হয়, এবং ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতা ও এক অতিযৌক্তিক চূড়ান্ততার মধ্যে ওঠাপড়া করছে — সেই ইতিহাসবাদকে অস্বীকার করে এই মাইনেকে হতাশার আর্তনাদ করেন। সব শেষে, বৃদ্ধ বয়সে মাইনেকে যখন তাঁর দেশকে ১৯১৮-র চেয়েও বেশি বিধ্বংসী সামরিক পরাজয়ে পর্যুদস্ত হতে দেখেন, তখন ১৯৪৬-এর 'জার্মান বিপর্যয়' (ডি ডয়েশে কাটাস্ট্রফে)-এ তিনি এমন এক ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসে অসহায়ভাবে কাবু হয়ে পড়েন যে-ইতিহাস অন্ধ অপরিবর্তনীয় দৈবের কৃপাধীন।[৭] ব্যক্তি হিসেবে মাইনেকে-র বিকাশে মনোবিদ অথবা জীবনীকার এখানে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। ইতিহাসকারের যাতে আগ্রহ হবে তা হলো: যেভাবে তিনটি বা এমনকি চারটি উপর্যুপরি, ও তীব্র বৈপরীত্যময় বর্তমানের পর্বকে মাইনেকে ঐতিহাসিক অতীতের মধ্যে প্রতিফলিত করেন।

বা, আরও ঘরের কাছে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। কালপাহাড়ি ১৯৩০-এর দশকে যখন ব্রিটিশ রাজনীতি থেকে এক কার্যকর শক্তি হিসেবে উদারনৈতিক দলকে মুছে দেওয়া হয়েছে তখন অধ্যাপক বাটারফিল্ড 'ইতিহাসের হুইগ ভাষ্য' (দ হুইগ ইন্টারপ্রিটেশন অফ হিস্ট্রি) নামে একটি বই লেখেন। বইটি বিশাল ও যথাপ্রাপ্য সাফল্য লাভ করেছিল। অনেক দিক দিয়ে এটি অসাধারণ বই — তার নগণ্যতম কারণ এই যে বইটিতে ১৩০ পাতারও বেশি জায়গা (কোনো নামসূচির সাহায্য ছাড়া আমি যতখানি বার করতে পারি) জুড়ে হুইগ ভাষ্যকে ধিক্কার জানালেও এতে নাম করা হয় নি ফক্স্ বাদে আর কোনো হুইগ-এর (যিনি ঐতিহাসিক ছিলেন না) বা অ্যাক্টন বাদে আর কোনো ঐতিহাসিকের (যিনি হুইগ ছিলেন না)।[৮] কিন্তু খুঁটিনাটি ও যাথার্থ্যের দিক দিয়ে বইটির যা খামতি আছে তা পুষিয়ে

৭ 'রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের ধারণা' (ডি ইডে ডোর স্টাট্স্‌রেইজন)-এর ইংরিজি তর্জমা ১৯৫৭-য় 'মেকিয়াভেলিবাদ' (মেকিয়াভেলিজম) নামে বেরিয়েছিল। তার ভূমিকায় মাইনেকে-র বিকাশ সম্বন্ধে ড ডবলিউ স্টার্ক যে উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন এখানে আমি সেটির কাছে ঋণী। মাইনেকে-র তৃতীয় পর্বের অতিযৌক্তিক উপাদানটিকে ড স্টার্ক বোধহয় অযথা বাড়িয়ে দেখেছেন।

৮ এইচ বাটারফিল্ড, 'ইতিহাসের হুইগ ভাষ্য' (দ হুইগ ইন্টারপ্রিটেশন অফ হিস্ট্রি), ১৯৩৯, পৃ ৬৭-তে লেখক 'নিরালম্ব যুক্তিপদ্ধতি' সম্বন্ধে 'এক স্বাস্থ্যকর অনাস্থা'র কথা স্বীকার করেছেন।

গেছে কটুকাটব্যের ছটায়। হুইগ ভাষ্য যে বাজে ব্যাপার ছিল সে-বিষয়ে পাঠকের কোনো সন্দেহ থাকে না; আর এর বিরুদ্ধে আনা অন্যতম অভিযোগ হলো : এটি 'বর্তমানের প্রসঙ্গসূত্রে অতীতের চর্চা'। এক্ষেত্রে অধ্যাপক বাটারফিল্ড ছিলেন দ্বিধাহীন ও কঠোর :

'বলতে গেলে, বর্তমানের দিকে এক চোখ রেখে অতীত-চর্চা সবরকম পাপ ও কূটতর্কের উৎস। . 'অনৈতিহাসিক' বলতে আমরা যা বুঝি এটি হচ্ছে তার সারবস্তু।'[৯]

বারো বছর কেটে গেল। শেষ হলো কালাপাহাড়িয়ানার চলন। অধ্যাপক বাটারফিল্ড-এর দেশ এমন এক যুদ্ধে নিযুক্ত যার সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হয় : হুইগ ঐতিহ্যের অঙ্গ, সাংবিধানিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এটি লড়া হচ্ছে এবং এমন এক মহান নেতার অধীনে যিনি 'বলতে গেলে, বর্তমানের দিকে এক চোখ রেখে' নিরন্তর অতীতের দোহাই পাড়েন। ১৯৪৪-এ 'ইংরেজ ও তার ইতিহাস' (দ ইংলিশম্যান অ্যান্ড হিজ হিস্ট্রি) নামে একটি ছোট বইতে অধ্যাপক বাটারফিল্ড এই সিদ্ধান্ত করলেন না যে ইতিহাসের হুইগ ভাষ্যই 'ইংরেজ' ভাষ্য, তিনি বরং 'ইংরেজের সঙ্গে তার ইতিহাসের যোগ' এবং 'বর্তমান ও অতীতের গাঁটছড়া'[১০] সম্পর্কে উৎসাহভরে বললেন। দৃষ্টিভঙ্গির এইসব বিপর্যাস নজরে আনা অমিত্রসুলভ সমালোচনা নয়। দ্বিতীয় বাটারফিল্ড-কে দিয়ে প্রথম বাটারফিল্ডকে খণ্ডন করা বা সংযত অধ্যাপক বাটারফিল্ডকে নেশাগ্রস্ত অধ্যাপক বাটারফিল্ড-এর মুখোমুখি করানোও আমার উদ্দেশ্য নয়। কেউ যদি (দ্বিতীয় বিশ্ব-) যুদ্ধের আগে, মধ্যে ও পরে আমার কিছু কিছু লেখা কষ্ট করে পড়েন, তাহলে অন্যদের মধ্যে আমি যেমন খুঁজে পেয়েছি, আমার মধ্যেও অন্তত সেরকমই সুস্পষ্ট বিরোধ ও অসঙ্গতির বিষয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতে যে কোনো কষ্ট হবে না সে-ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সজাগ। যে-ঐতিহাসিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো আমূল পরিমার্জন না-করে গত পঞ্চাশ বছরের পৃথিবী-কাঁপানো বিভিন্ন পরিস্থিতি পেরিয়ে এসেছেন বলে আন্তরিকভাবে দাবি করতে পারেন তাঁকে ঈর্ষা করা উচিত কিনা সে-বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। যে-সমাজে ঐতিহাসিক কাজ করেন তাঁর কাজে সেই সমাজ কত ঘনিষ্ঠভাবে

৯ এইচ বাটারফিল্ড, 'ইতিহাসের হুইগ ভাষ্য', ১৯৩৯, পৃ ১১, ৩১-২।

১০ এইচ বাটারফিল্ড, 'ইংরেজ ও তার ইতিহাস' (দ ইংলিশম্যান অ্যান্ড হিজ হিস্ট্রি), ১৯৪৪, পৃ ২, ৪-৫।

প্রতিফলিত হয়, শুধু সেইটুকু দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। ঘটনাবলিই যে শুধু বহমান তা নয়। ঐতিহাসিক নিজেও আছেন বহমানতায়। যখন আপনি কোনো ইতিহাসের বই হাতে তুলে নেবেন তখন আখ্যাপত্রে লেখকের নাম দেখাই যথেষ্ট নয় : প্রকাশের বা রচনার তারিখটিও দেখবেন — এমনকি সময়ে-সময়ে সেটি আরও বেশি স্বপ্রকট। আমরা এক নদীতে দুবার নামতে পারি না — এ কথা আমাদের জানানো যদি দার্শনিকের পক্ষে সঠিক হয়, তাহলে একই ঐতিহাসিক দুটো বই লিখতে পারেন না — এটিও বোধহয় সমান সত্য, এবং ঐ একই কারণে।

আর, ব্যক্তি ঐতিহাসিক থেকে আমরা যদি, যাকে ইতিহাস নিয়ে লেখালেখির প্রধান ঝোঁক বলা হয় সেদিকে, এক মুহূর্তের জন্যে যাই, তাহলে ঐতিহাসিক কী পরিমাণে তাঁর সমাজের সৃষ্টি তা আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের গতিপথকে প্রগতি-নীতির প্রদর্শন বলে মনে করতেন: তাঁরা এমন এক সমাজের ভাবাদর্শকে প্রকাশ করেছিলেন যে-সমাজ লক্ষণীয় রকমের দ্রুত প্রগতিশীল অবস্থায় রয়েছে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের কাছে ইতিহাস ছিল সার্থক যতক্ষণ তা আমাদের অনুকূলে চলছিল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এখন যেহেতু এটি একটি ভুল মোড় নিয়েছে তাই ইতিহাসের তাৎপর্যের প্রতি বিশ্বাস পরিণত হয়েছে এক বিপ্রবণতায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতিহাসের রৈখিক দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় টয়েন্‌বি প্রাণপণে চক্রবৎ তত্ত্বকে বসানোর চেষ্টা করেন — যা এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবাদর্শ।[১১] টয়েন্‌বি-র ব্যর্থতার পর থেকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাল ছেড়ে দেন ও ইতিহাসের একেবারেই কোনো সাধারণ বিন্যাস নেই — এই ফতোয়া দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। ফিশার-এর এ ধরনের একটা সাদামাটা মন্তব্য[১২] গত শতকের র‍্যাঙ্কে-র প্রবচনের মতো প্রায় সমান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কেউ যদি আমাকে বলেন, গত তিরিশ বছর ধরে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের এই হৃদয়-পরিবর্তন অনুভবের কারণ: প্রগাঢ় ব্যক্তিগত অনুধ্যান ও যে যার নিজের চিলেকোঠায় বসে মাঝরাত অবধি

১১ রোমান সাম্রাজ্যের গোধূলিবেলায় মার্কুস আউরেলিউস নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই চিন্তা করে যে 'যেসব ব্যাপার এখন ঘটেছে সেগুলো অতীতেও কীভাবে ঘটেছিল ও ভবিষ্যতে ঘটবে' ('নিজেকে' (অন হিমসেলফ), ১০, পৃ ২৭) ; টয়েনবি যে স্পেংলার-এর 'পশ্চিমের বিলয়' (ডিক্লাইন অফ দ ওয়েস্ট) থেকে ধারণাটি নিয়েছিলেন তা সুবিদিত।

১২ 'ইওরোপের ইতিহাস' (আ হিস্ট্রি অফ ইওরোপ)-এর ভূমিকা, ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪।

তেল পোড়ানো, তাহলে আমি সেই তথ্য নিয়ে তর্ক তোলার দরকার মনে করব না। কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ও তেল-পোড়ানোকে আমি এক সামাজিক সংঘটন বলেই মনে করে চলব। অর্থাৎ এ হলো ১৯১৪ থেকে আমাদের সমাজের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির এক মৌলিক পরিবর্তনের সৃষ্টি ও প্রকাশ। সমাজ যে-ধরনের ইতিহাস লেখে বা লিখতে পারে না তার চরিত্রের এর চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ নির্ণায়ক আর নেই। ওলন্দাজ ঐতিহাসিক গেইল-এর চিত্তাকর্ষক গবেষণাপত্রটি 'নেপোলিয়ন পক্ষে ও বিপক্ষে' (নেপোলিয়ন ফর অ্যান্ড এগেনস্ট) নামে ইংরিজিতে অনুবাদ হয়েছে। এই লেখায় তিনি দেখিয়েছেন, নেপোলিয়ন সম্পর্কে উনিশ শতকের ফরাসি ঐতিহাসিকদের একের পর এক বিভিন্ন বিচার কীভাবে ঐ শতাব্দী জুড়ে পরিবর্তন ও সংঘর্ষময় ফরাসি রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তার বিন্যাসকে প্রতিফলিত করে। অন্যান্য মানুষের মতোই, ঐতিহাসিকদের চিন্তাকেও দেশকালের পরিবেশ গড়ে নেয়। এই সত্যটি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন অ্যাক্টন। ইতিহাসের মধ্যেই তিনি এর থেকে নিস্তার খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন।

[তিনি লিখলেন :] 'ইতিহাসকে শুধু অন্যান্য সময়ের অসঙ্গত প্রভাব থেকে মুক্তিদাতা হলেই চলবে না, বরঞ্চ আমাদের নিজেদের সময়ের অসঙ্গত প্রভাব এবং পরিবেশের অত্যাচার ও যে-বাতাসে আমরা শ্বাস নিই তার চাপ থেকেও আমাদের মুক্তি দিতে হবে ইতিহাসকে।'[১৩]

ইতিহাসের ভূমিকা সম্পর্কে এটিকে এক অতি-আশাবাদী মূল্যায়ন বলে মনে হতে পারে। আমি কিন্তু এমন বিশ্বাস করার ঝুঁকি নেব যে, যে-ঐতিহাসিক সরব প্রতিবাদে বলেন, তিনি একজন ব্যক্তি, সামাজিক সংঘটন নয়, তাঁর চেয়ে যে-ঐতিহাসিক নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সবচেয়ে সচেতন তিনি ঐ পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে আরও বেশি সক্ষম, আর নিজের সমাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্যান্য পর্বের ও অন্যান্য দেশের ঐ একই বিষয়ে নানান পার্থক্যের মূল প্রকৃতি বুঝতেও আরও বেশি সক্ষম। নিজের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপরে ওঠার জন্য মানুষের যে-ক্ষমতা, যে-সংবেদনশীলতা দিয়ে সে ঐ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সংস্রবের পরিমাণ বুঝতে পারে সে-ক্ষমতা তারই শর্তাধীন বলে মনে হয়।

আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি বলেছিলুম : ইতিহাস অনুধাবন করার

১৩ অ্যাক্টন, 'আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতামালা' (লেকচার্স্ অন মডার্ন হিস্ট্রি), ১৯০৬, পৃ ৩৩।

আগে ঐতিহাসিককে অনুধাবন করুন। এখন আমি যোগ করব: ঐতিহাসিককে অনুধাবন করার আগে তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুধাবন করুন। যেহেতু ঐতিহাসিক একজন ব্যক্তি, তিনিও তাই ইতিহাস ও সমাজের সৃষ্টি; আর ইতিহাসের ছাত্রকে শিখতে হবে, কী করে এই দ্বৈত আলোয় ঐতিহাসিককে বিবেচনা করা যায়।

এবার ঐতিহাসিককে ছেড়ে দিয়ে ঐ একই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সমীকরণের অন্য দিক — ইতিহাসের তথ্য — নিয়ে বিবেচনা করা যাক। ব্যক্তির আচরণ, না বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ক্রিয়া — কোন্‌টি ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের বিষয়? এখানে আমি এক বহু-পদচিহ্নিত এলাকার দিকে এগোচ্ছি। কয়েক বছর আগে সার আইজ়ায়া বার্লিন যখন 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' (হিস্টোরিকাল ইনেভিটেবিলিটি) নামে এক ঝকমকে ও জনপ্রিয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন — এর এক প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমি এই বক্তৃতামালার পরের দিকে ফিরে আসব — তখন টি এস এলিঅট-এর রচনা থেকে চয়ন করে 'বিশাল নৈর্ব্যক্তিক শক্তিসমষ্টি' — এই বাণীটি তিনি তাঁর নিবন্ধের শীর্ষে রাখেন। যাঁরা ব্যক্তিকে ইতিহাসের নির্ণায়ক বিষয় হিসেবে দেখার চেয়ে 'বিশাল নৈর্ব্যক্তিক শক্তিসমষ্টি'তে বিশ্বাস করেন, তাঁদের নিয়ে তিনি তাঁর রচনায় সারাক্ষণ ঠাট্টা করেছেন। নানারকম ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যবহারই ইতিহাসের গণ্য বিষয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে আমি ইতিহাসের 'বদ রাজা জন তত্ত্ব' বলব — তার এক লম্বা ঘরানা আছে। ব্যক্তি-প্রতিভাকে ইতিহাসের সৃষ্টিশীল শক্তি হিসেবে তুলে ধরার বাসনা ইতিহাস-চেতনার আদিম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক। প্রাচীন গ্রীকরা তাঁদের অতীতের নানান কৃতিত্বকে বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক বীরের নামে মার্কা করে দিতে পছন্দ করতেন, যাঁরা নাকি ঐসব কৃতিত্বের দায়িক ছিলেন। একইভাবে তাঁদের মহাকাব্যগুলি আরোপ করা হয়েছিল হোমার নামে এক ভবঘুরে কবির নামে, আর বিভিন্ন আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠান কোনো এক লাইকার্গাস বা সোলোন-এর নামে। এই একই প্রবণতা আবার দেখা যায় নবজাগরণের যুগে, যখন ধ্রুপদী পুনরুজ্জীবনের সময়ে প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিকদের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন জীবনীকার-নীতিবাদী প্লুতার্ক। বিশেষ করে এদেশে এই তত্ত্ব আমরা শিখেছিলুম, বলতে গেলে, মায়ের কোলে বসে এবং আজ আমাদের সম্ভবত বোঝা উচিত যে এর মধ্যে কিছুটা খোকামি, বা অন্তত বালখিল্য ব্যাপার আছে। যখন সমাজ আরও সরল ছিল ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি সাধারণের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন বলে মনে হতো, তখন এই তত্ত্ব

কিছুটা আপাতগ্রাহ্য ছিল। আমাদের সময়ের আরও জটিল সমাজের সঙ্গে এটি একেবারেই খাপ খায় না; উনিশ শতকে সমাজবিজ্ঞান নামে নতুন বিজ্ঞানের জন্ম এই ক্রমবর্ধমান জটিলতারই অনুক্রিয়া। তবুও পুরোনো ঐতিহ্য সহজে মরে না। এই শতকের শুরুতেই 'ইতিহাস — মহান ব্যক্তিদের জীবনী' ছিল একটি সুখ্যাত বাণী। মাত্র দশ বছর আগে একজন বিশিষ্ট মার্কিন ঐতিহাসিক তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, হয়তো খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে নয়, যে 'ঐতিহাসিক চরিত্রদের' 'সামাজিক ও আর্থনীতিক শক্তির হাতের পুতুল' রূপে গণ্য করে তাঁরা সেই চরিত্রদের 'গণহত্যা' করছেন।[১৪] এই তত্ত্বে যাঁরা আসক্ত তাঁরা আজকাল এর সম্বন্ধে মুখচোরা ভাব দেখান। কিন্তু খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর সি ভি ওয়েজউড-এর একটি বই-এর ভূমিকায় এ-বিষয়ে একটি চমৎকার সমসাময়িক উক্তি পেয়ে গেলুম।

[তিনি লিখেছেন:] 'মানুষের গোষ্ঠী বা শ্রেণীর ব্যবহারের চেয়ে ব্যক্তি হিসেবে তাদের ব্যবহার আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। এই দিকে বা সমানভাবে অন্যদিকেও পক্ষপাতিত্ব নিয়ে ইতিহাস লেখা যায়, এটি বেশি, বা কম, বিভ্রান্তিকর নয়। ... এইসব মানুষ কী অনুভব করেছিলেন এবং, তাঁদের নিজেদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, তাঁরা যা করেছিলেন তা কেন করেছিলেন — এই বইতে সেটি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।'[১৫]

উক্তিটি যথাযথ, আর ওয়েজউড একজন জনপ্রিয় লেখিকা বলে আমি নিশ্চিত যে অনেকেই তাঁর মতো চিন্তা করেন। উদাহরণত, ড. রাউজ় আমাদের বলেন, এলিজাবেথীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল কারণ প্রথম জেমস-এর তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না এবং প্রথম দুই স্টুয়ার্ট রাজার নির্বুদ্ধিতার দরুন সতেরো শতকের ইংরেজ বিপ্লব ছিল এক 'আকস্মিক' ঘটনা।[১৬] এমনকি ড. রাউজ-এর তুলনায় বেশি সংযত ঐতিহাসিক, সার

১৪ 'আমেরিকান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ', খণ্ড ৫৬, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ১৯৫১, পৃ ২৭০।

১৫ সি ভি ওয়েজউড, 'রাজার শান্তি' (দ কিংস পিস), ১৯৫৫, পৃ ১৭।

১৬ এ এল রাউজ়, 'এলিজ়াবেথ-এর ইংল্যান্ড' (দ ইংল্যান্ড অফ এলিজ়াবেথ), ১৯৫০, পৃ ২৬১-২, ৩৮২। এটি দেখিয়ে দেওয়া সমীচীন যে আগের একটি লেখায় রাউজ় 'সেই ঐতিহাসিকদের ধিক্কার জানিয়েছেন যাঁরা মনে করেন ১৮৭০-এর পর ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বুর্বোঁদের ব্যর্থতার কারণ শুধু পঞ্চম হেনরি-র একটি ছোটো সাদা পতাকার প্রতি টান' ('একটি যুগের শেষ' (দ এন্ড অফ অ্যান ইপোক), ১৯৪৯, পৃ ২৭৫); এই ধরনের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা তিনি বোধহয় ইংল্যান্ডের ইতিহাসের জন্যেই জমা করে রাখেন।

জেমস নীল-ও, মাঝেমাঝে মনে হয়, টিউডর রাজতন্ত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করার চেয়ে রানী এলিজাবেথ-এর প্রতি মুগ্ধতা জানাতে বেশি উৎসুক। আর যে-প্রবন্ধ থেকে আমি একটু আগে উদ্ধৃতি দিয়েছি সেখানে, ঐতিহাসিকরা পাছে চেঙ্গিস খাঁ বা হিটলার-কে বাজে লোক হিসেবে ধিক্কার জানাতে ব্যর্থ হন সেই সম্ভাবনায় সার আইজ়ায়া বার্লিন ভয়ানক দুশ্চিন্তিত।[১৭] 'বদ রাজা জন' ও 'ভালো রানী বেস' তত্ত্বদুটি বিশেষভাবে আনাগোনা করে যখন আমরা আরও সাম্প্রতিক সময়ে এগিয়ে আসি। কমিউনিজমের উৎপত্তি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করার চেয়ে তাকে 'কার্ল মার্কস-এর মস্তিষ্কজাত সন্তান' (এই ফুলটি আমি শেয়ার বাজারের দালালদের এক সাম্প্রতিক প্রচারপত্র থেকে চয়ন করেছি) বলাটা অনেক সোজা, বা বলশেভিক বিপ্লবের বিভিন্ন গভীর সামাজিক কারণ অনুধাবন করার চেয়ে দ্বিতীয় নিকোলাস-এর নির্বুদ্ধিতা অথবা জার্মানির সোনার ওপর তার দায় চাপিয়ে দেওয়া, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-বিন্যাসে গভীরভাবে নিহিত কোনো ভাঙনের বদলে এই শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দ্বিতীয় ভিলহেল্‌ম্‌ ও হিটলার-এর ব্যক্তিগত পেজোমির পরিণতিকে দেখতে পাওয়াও অনেক বেশি সহজ।

ওয়েজউড এর উক্তির মধ্যে তাহলে দুটি উপাত্ত আছে। প্রথমটি হলো, ব্যক্তি হিসেবে মানুষের আচরণ কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সদস্য হিসেবে তাদের আচরণের থেকে আলাদা এবং ঐতিহাসিক ন্যায্যতই এই দু-এর যে-কোনো একটিকে বেছে নিয়ে কাজ করতে পারেন। দ্বিতীয়টি হলো, ব্যক্তি হিসেবে মানুষের আচরণ অনুধাবন করলেই তাদের ক্রিয়াকলাপের সচেতন উদ্দেশ্য অনুধাবন করা হয়।

আমি যা আগেই বলেছি তারপরে আর প্রথম বিষয়টি নিয়ে মেহনত করার দরকার নেই। ব্যাপারটা এই নয় যে মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তাকে গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে কম বা বেশি বিভ্রান্তিকর; এই দু-এর মধ্যে প্রভেদ করার চেষ্টাটাই বিভ্রান্তিকর। সংজ্ঞার্থেই ব্যক্তি একটি সমাজের সদস্য, বা হয়তো একাধিক সমাজের — তাকে আপনি গোষ্ঠী, শ্রেণী, জনগোষ্ঠী, জাতি বা যা ইচ্ছে বলুন। গোড়ার দিকের জীববিজ্ঞানীরা পাখি, জন্তু ও মাছের বিভিন্ন প্রজাতিকে খাঁচা, মাছের ঘর (অ্যাকোয়ারিয়াম) ও বাক্স (শো কেস)-য় শ্রেণীবিভক্ত করেই তুষ্ট

১৭ আই বার্লিন, 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' (হিস্টোরিক্যাল ইনেভিটেবিলিটি), ১৯৫৪, পৃ ৪২।

ছিলেন। তাঁরা জীবন্ত প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে চর্চা করতে চান নি। সমাজবিজ্ঞানগুলি বোধহয় আজও এই আদিম পর্যায় থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসে নি; আর সমস্ত সামাজিক সমস্যাকে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষের আচরণ-বিশ্লেষণে পরিণত করা যায় — এই দৃষ্টিভঙ্গির নাম দেওয়া হয়েছে 'মনোবাদ'। কিন্তু যে মনোবিদ ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন, তিনি বেশিদূর এগোতে পারবেন না।[১৮] জীবনী — যেটি মানুষকে ব্যক্তি রূপে গণ্য করে — আর সমগ্রের অংশ হিসেবে মানুষকে গণ্য করে যে-ইতিহাস — এদের মধ্যে প্রভেদ করার, ও 'ভালো জীবনী মানে বাজে ইতিহাস' — এমন প্রস্তাব করার লোভ হয়। 'ইতিহাস বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আর কিছুই ততটা ভ্রান্তি ও অবিচারের কারণ হয় না', অ্যাক্টন একবার বলেছিলেন, 'যতটা হয় ব্যক্তিচরিত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত আগ্রহ'।[১৯] কিন্তু এই প্রভেদও অবাস্তব। বা জি এম ইয়ং তাঁর 'ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ড' (ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড) বইটির আখ্যাপত্রে যে ভিক্টোরীয় প্রবাদটি বসিয়েছেন: 'চাকরবাকর কথা বলে মানুষজন নিয়ে, ভদ্রলোকে আলোচনা করেন বিষয় নিয়ে'[২০] — এর আড়ালেও আমি আশ্রয় নিতে চাই না। কিছু কিছু জীবনী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান: আমার

১৮ আধুনিক মনোবিদদের কিন্তু এই ভুলের দায় নিতেই হয়েছে: 'গোষ্ঠী হিসেবে মনোবিদরা ব্যক্তিকে এক ক্রিয়াশীল সামাজিক পদ্ধতিতে কোনো একক রূপে বিবেচনা করেন নি। তাঁরা বরং ব্যক্তিকে দেখেছেন একটি মূর্ত মানবসত্তা রূপে, যে তারপর বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ফলে যে বিশেষ অর্থে তাদের তাৎপর্যগুলো বিমূর্ত, সেগুলোকে তাঁরা যথেষ্ট ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি' (মাক্স্‌ ভেবার-এর 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের তত্ত্ব' (দ থিওরি অফ সোশাল অ্যান্ড ইকনমিক অর্গ্যানাইজেশন)-এর ভূমিকায় অধ্যাপক ট্যালকট পারসন্‌স্‌, ১৯৪৭, পৃ ২৭)। অধ্যায় ৬-এ ফ্রয়েড সম্পর্কে মন্তব্যটিও দ্রষ্টব্য।

১৯ 'হোম অ্যান্ড ফরেন রিভিউ', জানুয়ারি ১৮৬৩, পৃ ২১৯।

২০ 'সমাজতত্ত্ব-চর্চা' (দ স্টাডি অফ সোসিওলজি), ২য় অধ্যায়ে হার্বার্ট স্পেন্‌সর তাঁর গম্ভীরতম রীতিতে এই ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন: 'আপনি যদি কারও মানসিক পারঙ্গমতা মোটামুটিভাবে আন্দাজ কবতে চান তাহলে তার কথাবার্তার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সামান্যীকরণের অনুপাত পর্যবেক্ষণ করার চেয়ে বেশি ভালো কিছু করতে পারবেন না — (অর্থাৎ) বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে নানান সরল সত্য কতটা মানুষ ও বিষয়ের উপর অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি বিমূর্ত সত্যের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। আর আপনি যখন অনেককে এইভাবে পরিমাপ করেছেন তখন দেখবেন যে নানান মানবিক ব্যাপারে জীবনীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বেশি কিছু গ্রহণ করতে পারেন মাত্র বিচ্ছিন্ন কয়েকজনই।'

নিজের ক্ষেত্রে, আইজ্যাক ডয়েশার-এর স্টালিন ও ট্রট্স্কি-র জীবনীদুটি তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। অন্যগুলো সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'লিটন স্ট্র্যাচির কাছে', অধ্যাপক ট্রেভর-রোপর লেখেন, 'বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমস্যা ছিল সর্বদা, ও একমাত্র, ব্যক্তিগত আচরণ ও ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতার সমস্যা। ... ঐতিহাসিক সমস্যা, রাজনীতি ও সমাজের সমস্যার কোনো উত্তর তিনি কখনোই খোঁজেন নি, বা, এমনকি প্রশ্নও তোলেন নি।[২১] কেউই ইতিহাস লিখতে বা পড়তে বাধ্য নয়, আর অতীত সম্পর্কে চমৎকার সব বই লেখা যায় যেগুলো ইতিহাস নয়। কিন্তু আমি মনে করি, সমাজস্থ মানুষের অতীত বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া — এই বাবদে 'ইতিহাস' শব্দটিকে আলাদা করে রাখার প্রথাগত অধিকার আমাদের আছে, আর এই বক্তৃতামালায় আমি তা-ই করতে চাই।

দ্বিতীয় বিষয়টি — অর্থাৎ ব্যক্তিরা 'তাঁদের নিজেদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, যা করেছিলেন তা কেন করেছিলেন' — এটি অনুসন্ধান করাই ইতিহাসের বিবেচ্য বিষয় — প্রথম চোটে প্রচণ্ড গোলমেলে লাগে এবং আমার সন্দেহ হয়, অন্যান্য বোধবুদ্ধিওয়ালা লোকের মতোই, ওয়েজউড-ও যা প্রচার করেন তা পালন করেন না। যদি তিনি তা করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কয়েকটি ভারি কিম্ভূত ইতিহাস লিখবেন। আজ প্রত্যেকেই জানেন যে, যেসব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ পুরোপুরি সচেতন বা ঘোষণা করতে ইচ্ছুক, সর্বদা, বা এমনকি সাধারণতও, সেই অনুসারে সে কাজ করে না; আর নানান অচেতন বা অঘোষিত উদ্দেশ্যবিষয়ক অন্তর্দৃষ্টিকে বাদ দিয়ে রাখা নিশ্চিতভাবেই ইচ্ছে করে এক চোখ বুজে কাজ করে চলার একটা উপায়। কিছু কিছু লোকের মতে অবশ্য ঐতিহাসিকের তা-ই করা উচিত। এটাই আসল কথা। যতক্ষণ আপনি এই বলে সন্তুষ্ট থাকবেন যে রাজা জন-এর বদামির মধ্যে আছে তার লোভ বা নির্বুদ্ধিতা বা স্বৈরাচারীর ভূমিকা নেওয়ার উচ্চাশা, ততক্ষণ আপনি ব্যক্তিগত গুণাগুণের ভিত্তিতে কথা বলছেন যা এমনকি পাঠশালার ইতিহাসের স্তরেও বোধগম্য। কিন্তু যেই আপনি একবার বলতে শুরু করেন যে রাজা জন ছিলেন সামন্ত ব্যারনদের ক্ষমতায় উত্থানের বিরোধী কায়েমি স্বার্থের অচেতন যন্ত্র, তখনই রাজা জন-এর বদামির জন্য আপনি শুধুই এক আরও জটিল ও পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসছেন না, বরঞ্চ মনে হয় আপনি এমন আভাস দিতে চান

২১ এইচ আর ট্রেভর-রোপর, 'ইতিহাস সংক্রান্ত নিবন্ধাবলি' (হিস্টোরিক্যাল এসেজ়), ১৯৫৭, পৃ ২৮১।

যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তিদের সচেতন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্থির হয় না, কিছু বহিঃস্থ ও সর্বক্ষম শক্তিই তাদের অচেতন ইচ্ছাকে পরিচালনা করে। অবশ্যই এ-কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। আমার নিজের কথায় বলতে পারি, ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব, বিশ্বশান্তি, স্বপ্রকাশ নিয়তি, ইতিহাসের আগে 'শ্রী' বসানো, বা অন্য যে-কোনো বিমূর্তন — যেগুলো মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘটনার গতিপথ নির্দেশ করে বলে ভাবা হয় — এদের কোনোটিতেই আমার বিশ্বাস নেই; আর আমি বিনা শর্তে মার্কস-এর মন্তব্যটিই সমর্থন করব :

'ইতিহাস কিছুই করে না, এর কোনো অমেয় ঐশ্বর্য নেই, কোনো যুদ্ধেই সে লড়াই করে না। বরঞ্চ যারা সবকিছু করে, দখলে রাখে ও লড়ে তারা হলো মানুষ, সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ।'[২২]

এ বিষয়ে আমাকে যে দুটি মন্তব্য করতে হবে সে দুটি ইতিহাসের কোনো বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন ও পুরোপুরিভাবে অভিজ্ঞতাজাত পর্যবেক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমটি হলো, ইতিহাস বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সংখ্যার ব্যাপার। 'ইতিহাস মহামানবদের জীবনী' — এই দুর্ভাগ্যজনক ঘোষণার জন্য দায়ী ছিলেন কার্লাইল। কিন্তু তাঁর মহত্তম ঐতিহাসিক রচনায় তাঁর সবচেয়ে সোচ্চার কথা শুনুন :

'ক্ষুধা, নগ্নতা ও বিভীষিকাময় অত্যাচার দুশ পঞ্চাশ লক্ষ বুকে ভার হয়ে বসেছিল: ফরাসি বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল এইটি; দর্শনের ধ্বজাধারী, ধনী দোকানদার ও গ্রাম্য অভিজাত সম্প্রদায়ের আহত গর্ব বা বিসংবাদিত দর্শন এর কারণ নয়। সব দেশে এই ধরনের সব বিপ্লবে এই রকমই হবে।'[২৩]

বা, লেনিন যেমন বলেছিলেন : 'রাজনীতি শুরু হয় সেখানে, যেখানে আছে জনগণ; যেখানে তারা হাজারে হাজারে আছে সেখানে নয়, বরঞ্চ যেখানে তাদের সংখ্যা লক্ষ-লক্ষ, সেখানেই শুরু হয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি।'[২৪] কার্লাইল ও লেনিন-এর লক্ষ-লক্ষরা ছিলেন লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তি: তাঁদের ব্যাপারে নৈর্ব্যক্তিক কিছু ছিল না। এই প্রসঙ্গের আলোচনায় মাঝে মাঝে

২২ মার্কস-এঙ্গেলস : 'রচনাসমগ্র' (গেসামটাউস্‌গাবে), খণ্ড ১:৩, পৃ ৬২৫।

২৩ 'ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস' (হিসট্রি অফ দ ফ্রেন্‌চ্‌ রেভলিউশন), পর্ব ৩:৩, অধ্যায় ১।

২৪ লেনিন, 'নির্বাচিত রচনা' (সিলেকটেড ওয়র্কস), খণ্ড ৭, পৃ ২৯৫।

নামহীনতার সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিকতাকে গুলিয়ে ফেলা হয়। আমরা নাম জানি না বলে মানুষদের মানুষ হওয়া বা ব্যক্তিদের ব্যক্তি হওয়া রদ হয়ে যায় না। এলিঅট-এর 'বিশাল নৈর্ব্যক্তিক শক্তিসমষ্টি' ছিল সেইসব ব্যক্তি যাদের আরও বেশ সাহসী ও খোলাখুলিই রক্ষণশীল ক্ল্যারেন্ডন বলেছিলেন, 'নামছাড়া নোংরা লোকজন।'[২৫] এই নামহীন লক্ষ-লক্ষরা ছিলেন মোটামুটি অচেতনভাবে একত্র ক্রিয়াশীল ব্যক্তিমানুষ এবং তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন একটি সামাজিক শক্তি। সাধারণ পরিস্থিতিতে একটি অসন্তুষ্ট কৃষক বা একটি অসন্তুষ্ট গ্রামকে ঐতিহাসিকরা হিসেবে ধরবেন না। কিন্তু হাজার হাজার গ্রামে লক্ষ লক্ষ অসন্তুষ্ট কৃষক এমন একটি উপাদান যেটিকে কোনো ঐতিহাসিক অগ্রাহ্য করবেন না। যেসব কারণে জোন্‌স্ বিয়ে করতে বাধা পায় তাতে ঐতিহাসিকের আগ্রহ হবে না, যদি-না ঐসব একই কারণ জোন্‌স্-এর প্রজন্মের হাজার হাজার অন্যান্য ব্যক্তিকেও বাধা দেয় ও বিয়ের হারকে যথেষ্ট পরিমাণে নামিয়ে আনে: সেক্ষেত্রে ঐসব কারণ ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। বা, সংখ্যালঘুদের মাধ্যমেই আন্দোলন শুরু হয় — এই আপ্তবাক্য নিয়েও আমাদের বিচলিত হওয়ার দরকার নেই। সব ফলপ্রসূ আন্দোলনেরই অল্পসংখ্যক নেতা ও এক অনুগামী জনতা থাকে; কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের সাফল্যের জন্য জনতা অপরিহার্য নয়। ইতিহাসে সংখ্যার গুরুত্ব আছে।

আমার দ্বিতীয় নিরীক্ষা এমনকি আরও ভালোভাবে প্রতিপন্ন হয়। ব্যক্তিমানুষদের কার্যকলাপের প্রায়ই এমন পরিণতি দেখা যায় যা নির্বাহকদের বা বাস্তবিকই অন্য কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছিল না — এই মন্তব্যে নানান চিন্তাধারার লেখকই একমত হয়েছেন। ক্রিশ্চানরা বিশ্বাস করে, ব্যক্তি যখন সচেতনভাবে প্রায়শই তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিছু করে, সে ঈশ্বরের অভীপ্সার অচেতন কার্যবাহক। ম্যান্ডেভিল-এর 'ব্যক্তিগত কুকর্ম — সাধারণের উপকার' ছিল এই আবিষ্কারের গোড়ার দিকের উচ্চারণ যেটি ইচ্ছাকৃতভাবেই কূটাভাসমূলক। অ্যাডাম স্মিথ-এর গোপন হাত ও হেগেল-এর 'যুক্তির ধূর্ততা' — যা ব্যক্তিদের তার হয়ে কাজে লাগায় তারই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য,

২৫ ক্লারেন্‌ডন, 'মিস্টার হবস-এর 'লেভিয়াথান' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মমণ্ডলী ও রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ভ্রান্তির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমীক্ষা' (আ ব্রিফ ভিউ অ্যান্ড সার্ভে অফ দ ডেনজারাস অ্যান্ড পার্নিসিয়াস এররস্ টু চার্চ অ্যান্ড স্টেট ইন মি.হবস্ বুক এনটাইটল্‌ড্ লেভিয়াথান), ১৬৭৬, পৃ ৩২০।

যদিও ব্যক্তিরা মনে করে তারা নিজেদের আপন বাসনা চরিতার্থ করছে — এ দুটি ধারণা এত পরিচিত যে উদ্‌ধৃতি দেওয়ার দরকার পড়ে না। মার্কস তাঁর 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা' (ক্রিটিক অফ পলিটিকাল ইকনমি)-র মুখবন্ধে লিখেছিলেন, 'উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক উৎপাদনে মানুষ বিভিন্ন নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে যা তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।' অ্যাডাম স্মিথ-এর প্রতিধ্বনি করে টলস্টয় তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি' (ওয়ার অ্যান্ড পিস)-তে লিখেছিলেন, 'মানুষ সচেতনভাবে নিজের জন্য বাঁচে কিন্তু মানবতার ঐতিহাসিক সার্বিক লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য সে এক অচেতন যন্ত্র।'[২৬] আর যে উদ্‌ধৃতি-সংগ্রহ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে সেটি গুটিয়ে আনতে এই হলো অধ্যাপক বাটারফিল্ড-এর উক্তি : 'ঐতিহাসিক ঘটনাবলির চরিত্রে এমন কিছু আছে যেটি ইতিহাসের ধারাকে মোচড় দিয়ে এমন এক দিকে নিয়ে যায় যা কেউই কখনো চায় নি।'[২৭] একশ বছর ধরে শুধুই নানা ছোটোখাটো আঞ্চলিক যুদ্ধের পর ১৯১৪ থেকে আমরা দুটি বড় বিশ্বযুদ্ধ পেয়েছি। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হবে না যে উনিশ শতকের শেষ তিনপাদের চেয়ে বিশ শতকের প্রথম অর্ধেকে আরও বেশি লোক যুদ্ধ চেয়েছিল বা আরও কম লোক শান্তি চেয়েছিল। কোনো ব্যক্তি ১৯৩০-এর দশকের বিরাট আর্থিক মন্দা চেয়েছিল বা (হোক এমন) ইচ্ছে করেছিল — এটা বিশ্বাস করা শক্ত। তা সত্ত্বেও এই মন্দা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যকলাপের ফলেই এসেছিল, যাঁদের প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ আলাদা লক্ষ্য ধরে চলেছিলেন। ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও তার কাজের পরিণতির মধ্যে অসামঞ্জস্যের কারণ নির্ণয়ের জন্য সবসময় একজন পশ্চাৎমুখী ঐতিহাসিকের অপেক্ষা করতেও হয় না। মার্চ ১৯৩৭-এ উডরো উইলসন সম্বন্ধে লজ লিখেছিলেন, 'তিনি যুদ্ধ করতে চান না কিন্তু আমার মনে হয় বিভিন্ন ঘটনা তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'[২৮] 'মানুষের উদ্দেশ্যের নিরিখে ব্যাখ্যা'[২৯] অথবা নির্বাহকরা 'তাঁদের নিজেদের মূল্যায়ন অনুযায়ী যা করেছিলেন তা কেন করেছিলেন' — সেই অভিপ্রেরণার যে-বিবরণ তাঁরা নিজেরাই দেন – এ দু-এর যে-কোনো একটির ভিত্তিতে ইতিহাস লেখা যায় এমন প্রস্তাব সবরকম

২৬ এল টলস্টয়, 'যুদ্ধ ও শান্তি' (ওয়ার অ্যান্ড পিস), পর্ব ৯, অধ্যায় ১।

২৭ এইচ বাটারফিল্ড, 'ইংরেজ ও তার ইতিহাস' (দ ইংলিশম্যান অ্যান্ড হিস হিস্ট্রি), ১৯৪৪, পৃ ১০৩।

২৮ বি ডবলিউ টুশ্‌মান, 'জিমারম্যান টেলিগ্রাম', নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৮, পৃ ১৮০-তে উদ্‌ধৃত।

২৯ এই শব্দগুচ্ছটি আই বার্লিন-এর 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' থেকে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। সেখানে এই ধরনের ইতিহাস-রচনাকে প্রশংসা করা হয়েছে বলেই মনে হয়।

সাক্ষ্যপ্রমাণকে অগ্রাহ্য করে। ইতিহাসের নানান তথ্য নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য, কিন্তু ব্যক্তিদের এককভাবে সম্পাদিত কাজকর্মের সঙ্গে তা সম্পর্কিত নয়, এবং তাদের বাস্তব বা কল্পিত অভিপ্রেরণার সঙ্গেও সম্পর্কিত নয়, যে-অভিপ্রেরণায় ব্যক্তিরা নিজেরা কাজ করেছেন বলে ধরে নেন। এসব তথ্য হলো সমাজে ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য, এবং ব্যক্তিরা তাদের কাজকর্মের যে-পরিণতি প্রত্যাশা করেন প্রায়ই তার থেকে আলাদা ও কখনো-কখনো উল্টো পরিণতি সৃষ্টি করে যেসব সামাজিক শক্তি তাদের সম্পর্কে তথ্য।

ইতিহাস বিষয়ে কলিংউড-এর যে-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমি আমার শেষ বক্তৃতায় আলোচনা করেছিলুম, তাতে আর-একটা মারাত্মক ভুল ছিল এই যে, কোনো কাজের পেছনে যে-চিন্তার তদন্ত করার জন্য ঐতিহাসিককে ডাকা হয় তাকে এককভাবে নির্বাহকদের চিন্তা বলে ধরে নেওয়া। এই পূর্বধারণাটি ভুল। ঐতিহাসিককে যা তদন্ত করতে ডাকা হয় তা হলো কাজটির পেছনে কী নিহিত আছে; এবং সেক্ষেত্রে নির্বাহকদের সচেতন চিন্তা বা অভিপ্রেরণা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে।

ইতিহাসে বিদ্রোহী বা বিক্ষুব্ধের ভূমিকা নিয়ে এখানে আমার কিছু বলা উচিত। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তি — এই জনপ্রিয় ছবিটিকে দাঁড় করানোর অর্থ সমাজ ও ব্যক্তির ভুল বিপক্ষতাকে আবার হাজির করা। প্রত্যেক সমাজই নানান সামাজিক সংঘর্ষের রণভূমি। যেসব ব্যক্তি প্রচলিত কর্তৃত্বের সমর্থক আর যাঁরা ঐ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের দাঁড় করান — এই দু ধরনের লোকই একই পরিমাণে সমাজের সৃষ্টি ও প্রতিচ্ছবি। চোদ্দ শতকের ইংল্যান্ড ও আঠেরো শতকের রাশিয়ার বিভিন্ন ক্ষমতাশালী সামাজিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন যথাক্রমে দ্বিতীয় রিচার্ড ও ক্যাথারিন দ গ্রেট। কিন্তু মহান ভূমিদাস বিদ্রোহের নেতা ওয়াট টাইলার ও পুগাচেভ-ও ঠিক তা-ই করেন। রাজা ও বিদ্রোহী — দুজনেই সমানভাবে তাঁদের যুগ ও দেশের সুনির্দিষ্ট অবস্থানের ফসল। ওয়াট টাইলার ও পুগাচেভ-কে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করাটা এক বিপথদর্শী সরলীকরণ। তাঁরা যদি শুধু তা-ই হতেন, তাহলে ঐতিহাসিকরা কখনোই তাঁদের কথা জানতে পারতেন না। ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকার কারণ তাঁদের অনুগামী জনতা, এবং সামাজিক সংঘটন হিসেবেই তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ, তা না-হলে তাঁরা কিছুই নন। বা, আরও পরিশীলিত স্তরে একজন বিশিষ্ট বিদ্রোহী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর কথা ধরা যাক। নিৎসে-র চেয়ে বেশি উগ্রভাবে ও বেশি র‍্যাডিকাল ভঙ্গিতে তাঁদের স্বকাল ও স্বদেশের সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

খুব কম লোকই দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও নিৎসে ছিলেন ইওরোপীয়, ও আরও নির্দিষ্টভাবে জার্মান, সমাজের প্রত্যক্ষ ফসল — এমন একটি সংঘটন যা চীন বা পেরুতে হতে পারত না। নিৎসে-র সমসাময়িকদের কাছে ব্যাপারটা যতটা পরিস্কার ছিল তাঁর মৃত্যুর পরের প্রজন্মের কাছে তার চেয়ে আরও বেশি পরিস্কার হয়ে যায় যে ইওরোপীয়, বিশেষ করে জার্মান সামাজিক শক্তিগুলি ছিল কত দৃঢ় যার অভিব্যক্তি ছিলেন এই ব্যক্তিটি, আর নিৎসে হয়ে উঠলেন তাঁর নিজের প্রজন্মের চেয়ে ভাবীকালের কাছে আরও বেশি তাৎপর্যসম্পন্ন পুরুষ।

ইতিহাসে বিদ্রোহী ও মহামানবের ভূমিকার মধ্যে কিছু মিল আছে। ইতিহাসের মহামানব-তত্ত্ব — 'ভালো রানী বেস' ভাবধারার একটি বিশেষ উদাহরণ — সাম্প্রতিককালে বাতিলের দলে পড়ে গেছে, যদিও মাঝে মাঝে তার কিম্ভূত মাথাটা চাড়া দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের একটি জনপ্রিয় গ্রন্থমালা বেরোতে শুরু করে। তার সম্পাদক লেখকদের কাছে 'একজন মহামানবের জীবনীর মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাববস্তু তুলে ধরা'র আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর,এ জে পি টেলর তাঁর একটি গৌণ নিবন্ধে আমাদের বলেন, 'নেপোলিয়ন, বিসমার্ক ও লেনিন : এই তিন অতিকায় পুরুষের নিরিখে আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাস লেখা যায়',[৩০] যদিও আরও গুরুত্বপূর্ণ লেখাপত্রে তিনি এই ধরনের কোনো হঠকারী প্রকল্প গ্রহণ করেন নি। ইতিহাসে মহামানবের ভূমিকা কী? মহামানব একজন ব্যক্তি, এবং একজন অতিবিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার ফলে একই সঙ্গে এক অতিবিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংঘটন। গিবন মন্তব্য করেছিলেন, 'এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ যে বিভিন্ন অসাধারণ চরিত্রের সঙ্গে (তাদের) সময়কে যথোপযুক্ত হতে হবে এবং ক্রমওয়েল বা রেৎস-এর প্রতিভা এখন অজ্ঞাত থেকেই ফুরিয়ে যেতে পারে।'[৩১] মার্কস তাঁর 'লুই বোনাপার্ত-এর আঠেরোই ব্রুমেয়ার' (দ এইট্টিন্‌থ্ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্ত)-এ এর বিপরীত সংঘটনের লক্ষণ নির্ণয় করেছিলেন : 'ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রাম যে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সম্পর্ক তৈরি করেছিল তার ফলে স্থূল মাঝারিপনা বীরের পোশাক পরে পেখম মেলে ঘুরতে পেরেছিল।' বিসমার্ক

৩০ এ জে পি টেলর, 'নেপোলিয়ন থেকে স্টালিন' (ফ্রম নেপোলিয়ন টু স্টালিন), ১৯৫০, পৃ ৭৪।

৩১ গিবন, 'রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন' (ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দ রোমান এম্পায়ার), অধ্যায় ৭০।

আঠেরো শতকে জন্মালে — একটি অবাস্তব প্রকল্প, কারণ তাহলে তিনি বিসমার্ক হতেন না — জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন না; হয়তো বা মহামানবই হতে পারতেন না। কিন্তু টলস্টয় যেমন মহামানবদের 'বিভিন্ন ঘটনার ওপর নামকরণের ছাপ' ছাড়া আর কিছু নয় বলে খাটো করেছেন, তেমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। মহামানবপূজা অবশ্য মাঝেমাঝে অশুভ সূচনা করতে পারে। নিৎসে-র অতিমানব এক বিতৃষ্ণাজনক পুরুষ! হিটলার-এর বিষয়ে বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে 'ব্যক্তিপূজা'র অকরুণ পরিণতি সম্পর্কে আমার দিক থেকে স্মরণ করার কোনো দরকার নেই। কিন্তু মহামানবদের মহত্ত্বকে তুচ্ছ করা আমার উদ্দেশ্য নয়: বা 'মহামানবরা প্রায় সর্বদাই বাজে লোক' — এই তত্ত্বের ভাগীও আমি হতে চাই না। আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিবৃত্ত করতে চাই যে-দৃষ্টিভঙ্গি মহামানবদের স্থান দেয় ইতিহাসের বাইরে এবং তাঁদের নিজস্ব মহত্ত্বের দৌলতে ইতিহাসের ওপর তাঁদের নিজেদের আরোপ করতে দেখে, যেন 'বাক্স থেকে বেরুনো পুতুলের মতো, যাঁরা ইতিহাসের বাস্তব ধারাবাহিকতায় ছেদ ফেলার জন্য অলৌকিকভাবে অজানা জগৎ থেকে বেরিয়ে আসেন।'[৩২] আজও আমি জানি না, হেগেল-এর চিরায়ত বর্ণনার চেয়ে আমরা আরও ভালো কিছু করতে পারব কিনা:

'যে-ব্যক্তি তাঁর যুগের এষণাকে বাণীমূর্তি দিতে পারেন, তাঁর যুগকে বলতে পারেন তার এষণা কী, ও তার সার্থক রূপ দেন তিনিই সে যুগের মহামানব। তিনি যা করেন তা তাঁরই যুগের হৃদয় ও সারবস্তু; তিনি রূপায়িত করেন তাঁর যুগকে।'[৩৩]

ড. লীভিস যখন বলেন, মহান লেখকরা 'যে মানবিক অবধানতা উন্নীত করেন তার মাপকাঠিতেই তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ',[৩৪] তখন তিনি এই ধরনেরই কিছু বোঝাতে চান। মহামানবরা সবসময়ই হয় প্রচলিত বিভিন্ন শক্তির প্রতিনিধি, নাহলে প্রচলিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে যেসব শক্তি সৃষ্টি হতে তাঁরা সাহায্য করেন — তার প্রতিনিধি। নেপোলিয়ন বা বিসমার্ক-এর মতো যেসব মহামানব প্রচলিত নানান শক্তির পিঠে চড়ে মহত্ত্বে পৌঁছেছিলেন তার চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের সৃষ্টিশীলতা বোধহয় ধার্য

৩২ ভি জি চাইল্ড, 'ইতিহাস' (হিস্ট্রি), ১৯৪৭, পৃ ৪৩।

৩৩ 'অধিকারের দর্শন' (ফিলজফি অফ রাইট), ইংরিজি তর্জমা, ১৯৪২, পৃ ২৯৫।

৩৪ এফ আর লীভিস, 'মহান ঐতিহ্য' (দ গ্রেট ট্র্যাডিশন), ১৯৪৮, পৃ ২।

করা যায় সেইসব মহামানবদের ক্ষেত্রে যাঁরা, ক্রমওয়েল বা লেনিন-এর মতো, যেসব শক্তি তাঁদের মহত্ত্বে নিয়ে গিয়েছিল তাদের রূপ দিতে সাহায্য করেছিলেন। বা, সেই মহামানবদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যাঁরা তাঁদের নিজেদের সময় থেকে এতদূর এগিয়ে ছিলেন যে তাঁদের মহত্ত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল শুধু পরবর্তী প্রজন্মদের কাছ থেকে। আমার কাছে যা অপরিহার্য মনে হয় তা হলো : একজন মহামানবের মধ্যে একটি অতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া, যিনি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির ফসল ও তার নির্বাহী, যেসব সামাজিক শক্তি পৃথিবী ও মানুষের চিন্তাধারার ধরন বদলে দেয় — একই সঙ্গে যিনি তাদের প্রতিনিধি তথা স্রষ্টা।

ইতিহাস তাহলে, শব্দটির দুটি অর্থেই -- অর্থাৎ ঐতিহাসিক যে তদন্ত করেন এবং অতীতের যেসব তথ্যের মধ্যে তিনি তদন্ত করেন — একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, ব্যক্তিরা যেখানে সামাজিক জীব হিসেবে নিযুক্ত ; এবং সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কাল্পনিক বিপক্ষতাটি আমাদের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আমাদের পথের মাঝে-রাখা মোহন ফাঁদের বেশি কিছু নয়। ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে পরস্পরনির্ভর পদ্ধতি -- যাকে আমি বলেছি বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সংলাপ — তা বিমূর্ত ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংলাপ নয়, বরং আজকের সমাজ ও গতকালের সমাজের মধ্যে সংলাপ। বুর্কহার্ট-এর কথায় ইতিহাস হলো 'এক যুগ অন্য যুগের মধ্যে লক্ষণীয় যা খুঁজে পায় তার নথি।'[৩৫] অতীত আমাদের কাছে শুধু বর্তমানের আলোতেই বোধগম্য ; আর বর্তমানকে আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি শুধু অতীতের আলোতেই। অতীতের সমাজ বুঝতে মানুষকে পারঙ্গম করা, ও বর্তমান সমাজের ওপর তার দখল বাড়ানো — এ-ই হলো ইতিহাসের দ্বিমুখী কার্যধারা।

৩৫ জে বুর্কহার্ট, 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে বিচার', ১৯৫৯, পৃ ১৫৮।

ইতিহাস, বিজ্ঞান, ও নৈতিকতা

যখন আমি খুব ছোটো তখন, দেখে মনে হলেও তিমি যে মাছ নয় — একথা জেনে যথেষ্ট চমৎকৃত হয়েছিলুম। শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত এইসব প্রশ্ন আজকাল আমাকে কম নাড়া দেয় ; আর আমাকে যখন আশ্বাস দেওয়া হয় যে ইতিহাস বিজ্ঞান নয় — তখন তা আমাকে অযথা দুর্ভাবনায় ফেলে না। এই পরিভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নটি ইংরিজি ভাষার খামখেয়াল। আর সব ইওরোপীয় ভাষাতেই 'বিজ্ঞান'-এর সমার্থক শব্দের মধ্যে ইতিহাসকে বিনা দ্বিধায় অন্তর্ভূত করা হয়। কিন্তু ইংরিজি-ভাষী জগতে এই বিষয়টির পিছনে একটি লম্বা কাহিনী আছে, এবং তার থেকে যেসব প্রশ্ন উঠেছে তা ইতিহাসে পদ্ধতি সংক্রান্ত সমস্যাবলির এক সুবিধাজনক মুখবন্ধ।

আঠেরো শতকের শেষে, জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও তার নিজস্ব শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান — এই দুই ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যখন প্রচুর বিষয় জানা যাচ্ছিল, তখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে : বিজ্ঞান মানুষের সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানকে আরও এগিয়ে দিতে পারে কিনা। গোটা উনিশ শতক জুড়ে আস্তে আস্তে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে ; ইতিহাসও ছিল তার একটি। যেসব পদ্ধতিতে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগৎকে অনুধাবন করে তা প্রয়োগ করা হয়েছিল নানান মানবিক বিষয়ের অনুধাবনে। এই পর্যায়ের প্রথমদিকে বজায় ছিল নিউটনীয় ঐতিহ্য। প্রাকৃতিক জগতের মতো সমাজকেও ভাবা হয়েছিল একটি যান্ত্রিক ব্যাপার। ১৮৫১-য় প্রকাশিত হার্বার্ট স্পেন্‌সর-এর একটি বই, 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা' (সোসাল স্ট্যাটিক্‌স্)-কে এখনও মনে রাখা হয়। এই ঐতিহ্যে বড় হয়েছিলেন বারট্রান্ড রাসেল। পরবর্তীকালে তাঁর একটি কালপর্বের কথা মনে পড়েছিল যখন তাঁর আশা ছিল, একসময়ে 'যন্ত্রপাতির অঙ্কের মতোই মানুষের আচরণ সংক্রান্ত যথাযথ অঙ্ক (তৈরি) হবে' [১] এরপর আর-একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আনলেন ডারউইন; আর সমাজবিজ্ঞানীরা জীববিদ্যা থেকে তাঁদের সূত্র নিয়ে সমাজকেও সপ্রাণ বলে ভাবতে শুরু করলেন। কিন্তু

১ বারট্রান্ড রাসেল, 'স্মৃতি থেকে নানান আলেখ্য' (পোর্ট্রেটস ফ্রম মেমরি), ১৯৫৮, পৃ ২০।

ডারউইনীয় বিপ্লবের প্রকৃত গুরুত্ব হলো : ভূতত্ত্বে লাইয়েল যা আগেই শুরু করেছিলেন ডারউইন তাকে সম্পূর্ণ করে বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ে এলেন ইতিহাস। এবার থেকে গতিহীন ও সময়হীন কোনো ব্যাপার নয়,[২] বরঞ্চ বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় হলো পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়া। ইতিহাসে প্রগতিকে সুনিশ্চিত ও পরিপূরণ করল বিজ্ঞানে বিবর্তন। যা-ই হোক, ইতিহাসে অনুসৃত পদ্ধতির যে আরোহী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি আমার শেষ বক্তৃতায় আলোচনা করেছি তাকে পাল্টানোর মতো কিছুই ঘটে নি। প্রথমে তথ্য জোগাড় করো, তারপর সেগুলোর ব্যাখ্যা দাও। প্রশ্নাতীতভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে বিজ্ঞানের পদ্ধতিও এই রকমই। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি নিঃসন্দেহে ব্যুরি-র মনেও ছিল যখন জানুয়ারি ১৯০৩-এ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন, ইতিহাস 'একটি বিজ্ঞান, তার বেশিও নয়, কমও নয়'। ব্যুরি-র উদ্বোধনী বক্তৃতার পরের পঞ্চাশ বছর ধরে ইতিহাস সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দেখা গেল এক তীব্র প্রতিক্রিয়া। ১৯৩০-এর দশকে কলিংউড যখন লিখছেন, তখন যে প্রাকৃতিক জগৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় — তার সঙ্গে ইতিহাসের জগতের একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানার জন্য তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আর এই পর্বে তাচ্ছিল্য করা ছাড়া আর কোনো কারণে ব্যুরি-র বচনটি কদাচিৎ উদ্‌ধৃত হতো। কিন্তু এই সময়ে ঐতিহাসিকরা যা লক্ষ্য করতে পারেন নি তা হলো বিজ্ঞানের মধ্যেই হয়ে গেছে এক প্রগাঢ় বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে, মনে হয়, আমরা যা অনুমান করেছিলুম ব্যুরি হয়তো প্রায় তার চেয়েও বেশি সঠিক ছিলেন, যদিও ভুল কারণে। লাইয়েল ও ডারউইন যথাক্রমে ভূতত্ত্ব ও জীববিদ্যায় যা করেছিলেন, তা এখন জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটে গেছে। বর্তমান মহাবিশ্ব কী করে হলো — সেই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে জ্যোতির্বিদ্যা; আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা আমাদের সারাক্ষণই বলেন যে তাঁরা যা নিয়ে অনুসন্ধান করেন তা তথ্য নয়, ঘটনা। একশ বছর আগে ঐতিহাসিকরা বিজ্ঞানের জগতে যতটা স্বস্তিবোধ করতে পারতেন তার চেয়ে আজ তাঁদের হাতে বেশি স্বস্তি বোধ করার মতো কিছু উপলক্ষ্য আছে।

সূত্রের ধারণাটিকে আগে দেখা যাক। আঠেরো ও উনিশ শতক জুড়ে বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন, প্রকৃতির বিভিন্ন সূত্র — নিউটন-এর গতিসূত্র,

২ অনেক পরে, ১৮৭৪-এও ব্র্যাডলি ইতিহাস থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা করেছেন এই হিসেবে যে বিজ্ঞানের বিবেচ্য হলো কালাতীত ও 'স্থায়ী' (এফ এইচ ব্র্যাডলি, 'প্রবন্ধসংগ্রহ' (কলেক্টেড এসেজ়), ১৯৩৫, খণ্ড ১, পৃ ৩৬)।

মাধ্যাকর্ষণ সূত্র, বয়েল-এর সূত্র, অভিব্যক্তি সূত্র ও এইরকম আরও অনেককিছু — আবিষ্কার ও নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেছে। আর নানান পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য দিয়ে আরোহী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের আরও সূত্র আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করাই বৈজ্ঞানিকের কাজ। সূত্র শব্দটি নেমে এসেছিল গালিলিও ও নিউটন-এর বিজয়সরণি ধরে। সমাজজিজ্ঞাসুরা তাঁদের বিষয় চর্চায় বৈজ্ঞানিক মর্যাদা প্রতিপন্ন করার সচেতন বা অচেতন উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলেন ঐ একই ভাষা এবং নিজেদের ঐ একই পদ্ধতির অনুসারী বলে বিশ্বাস করলেন। গ্রেশাম-এর সূত্র, ও অ্যাডাম স্মিথ-এর বাজারের সূত্রাবলি নিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদরাই এই ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করলেন বলে মনে হয়। বার্ক শরণ নিলেন 'বাণিজ্যের সূত্রে'র কাছে, 'যেগুলি প্রাকৃতিক সূত্র এবং ফলত ঈশ্বরের সূত্র'।[৩] জনসংখ্যা বিষয়ে একটি সূত্র প্রস্তাব করলেন ম্যালথাস; লাসাল্লে — মজুরির লৌহকঠোর সূত্র; আর 'পুঁজি' (ডাস কাপিটাল)-র মুখবন্ধে 'আধুনিক সমাজের আর্থনীতিক গতিসূত্র' আবিষ্কারের দাবি করলেন মার্কস। বিভিন্ন মানবিক গতিপ্রকৃতির ধারাতে 'সার্বজনীন ও অবিচ্যুত নিত্যতাসম্পন্ন এক গৌরবময় নীতি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে' — এই দৃঢ়বিশ্বাস জানালেন বাক্‌ল তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস' (হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশন)-এর উপসংহারে। আজ এই পরিভাষাকে যেমন প্রাচীনগন্ধী, ঠিক তেমনই অতি-আস্থাশীল শোনায়; কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এটি যতটা প্রাচীনগন্ধী লাগে, প্রায় ঠিক ততটাই লাগে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের কাছেও। ব্যুরি-র উদ্বোধনী বক্তৃতার আগের বছর ফরাসি গাণিতিক আঁরি পোয়াঁকাবে 'বিজ্ঞান ও প্রকল্প' (ল সিয়াঁস এ লেপতেজ) নামে একটি ছোটো বই বার করেন। বৈজ্ঞানিক ভাবনায় সেটি এক বিপ্লবের সূচনা করে। পোয়াঁকারে-র প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, বিজ্ঞানীদের উপস্থাপিত নানান সাধারণ প্রতিজ্ঞা যখন সংজ্ঞার্থ বা ভাষা ব্যবহারসংক্রান্ত প্রচ্ছন্ন প্রথামাত্র নয়, তখন সেগুলো আরও বেশি ভাবনাকে সংহত ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি প্রকল্প, এবং নিরূপণ, পরিমার্জন বা খণ্ডন-সাপেক্ষ। এখন এসব মোটামুটি মামুলি ব্যাপারের মতো হয়ে

৩ 'অভাব সম্পর্কে চিন্তা ও অনুপুঙ্খ' (থটস অ্যা গু ডিটেলস অন স্কেয়ারসিটি), ১৭৯৫, 'এডমন্ড বার্ক-এর রচনাবলি' (দ ওয়ার্কস অফ এডমন্ড বার্ক), ১৮৪৬, খণ্ড ৪, পৃ ২৭০; বার্ক সিদ্ধান্ত করেন যে 'সরকারকে সরকার হিসেবে ধরলে, বা এমনকি ধনীদের ধনী হিসেবে ধরলে গরিবদের সেইসব প্রয়োজন-সামগ্রী দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই দৈবশক্তি যেগুলি গরীবদের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন'।

দাঁড়িয়েছে। নিউটন-এর বড়াই 'আমি কোনো প্রকল্প করি না' (হাইপথেসেস নন ফিঙ্গো) আজ ফাঁপা শোনায় আর বিজ্ঞানীরা, এমনকি সমাজবিজ্ঞানীরাও, যদিও এখনও মাঝে মাঝে, বলতে গেলে, পুরনো দিনের কথা ভেবে, বিভিন্ন সূত্রের কথা বলেন, কিন্তু যে-অর্থে আঠেরো ও উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা সকলেই সেগুলোয় বিশ্বাস করতেন, তাঁরা আর সেগুলো আছে বলে বিশ্বাস করেন না। এটি স্বীকৃত যে যথাযথ ও সর্বাত্মক সূত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা নতুন আবিষ্কার ও নতুন জ্ঞান অর্জন করেন না, বরঞ্চ তাঁরা তা করেন নানান প্রকল্প উপস্থাপনার মাধ্যমে, যেগুলো আবার নতুন অনুসন্ধানের পথ খুলে দেয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে দুজন মার্কিন দার্শনিকের একটি চলতি পাঠ্যবই-এ বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে 'মূলত চক্রাকার' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

'বিভিন্ন নীতির সপক্ষে আমরা সাক্ষ্য জোগাড় করি অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য উপাদানের আশ্রয় নিয়ে, যেগুলোকে 'তথ্য' আখ্যা দেওয়া হয়; আর অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য উপাদানের নির্বাচন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান করি নীতির ভিত্তিতে।'[৪]

'একান্তর' শব্দটি বোধহয় 'চক্রাকার'-এর চেয়ে আরও জুতসই হতো, কারণ ফলাফল মানে একই জায়গায় ফেরা নয়, বরঞ্চ নীতি ও তথ্য, এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সবরকম চিন্তাভাবনাতেই কিছু পর্যবেক্ষণভিত্তিক পূর্ব-অনুমানের দরকার পড়ে যার দরুন বৈজ্ঞানিক ভাবনা সম্ভব হয়। কিন্তু এইসব পূর্ব-অনুমান ঐ ভাবনার আলোয় সংশোধন-সাপেক্ষ। কোনো কোনো প্রসঙ্গে বা উদ্দেশ্যে এইসব প্রকল্প বৈধ হতেই পারে, যদিও অন্যত্র সেগুলো অ-বৈধ হয়ে দাঁড়ায়। সেগুলো বস্তুত আমাদের নতুন নতুন অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চারে কার্যকর কিনা এবং আমাদের জ্ঞান বাড়াচ্ছে কিনা এই প্রয়োগবাদী পরীক্ষাটি সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সম্প্রতি রাদারফোর্ড-এর অন্যতম বিশিষ্ট এক ছাত্র ও সহ-কর্মী তাঁর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন :

'নিউক্লিয় সংঘটনগুলি কীভাবে চলে তা জানার জন্যে তাঁর একটা তাড়না ছিল, যে-অর্থে রান্নাঘরে কী হচ্ছে তা জানার ব্যাপারে কেউ কথা বলেন। কিন্তু কয়েকটি মৌলিক সূত্র ব্যবহার করে একটি তত্ত্ব — এই চিরায়ত

৪ এম আর কোহেন ও ই নাগেল, 'যুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভূমিকা' (ইনট্রোডাকশান টু লজিক অ্যান্ড সায়েন্টিফিক মেথড), ১৯৩৪, পৃ ৫৯৬।

ভঙ্গিতে তিনি কোনো ব্যাখার খোঁজ করতেন বলে আমার মনে হয় না। কী হচ্ছে তা জানতে পারলেই তিনি তুষ্ট থাকতেন।'[৫]

এই বর্ণনা সেই ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য যিনি মৌলিক সূত্র খোঁজা ছেড়ে দিয়েছেন, এবং কীভাবে চলে তা জেনেই তুষ্ট'।

অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিকরা যেসব প্রকল্প ব্যবহার করেন তাদের অবস্থানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের ব্যবহৃত প্রকল্পের অবস্থানের লক্ষণীয় মিল আছে বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে মাক্‌স্ ভেবর-এর প্রটেস্টান্টবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্কের বিখ্যাত লক্ষণনির্ণয়টির কথা ভাবুন। আজ এটিকে কেউই সূত্র বলবেন না। যদিও আগের কোনো যুগে এটিকে বোধহয় সেই হিসেবেই স্বাগত জানানো হতো। এটি একটি প্রকল্প; আমাদের অনুসন্ধানে এটি উদ্দীপনা এনেছে এবং অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি খানিকটা পরিমার্জিত হলেও এর মাধ্যমে এই দুই আন্দোলন সম্পর্কেই আমাদের বোধ নিঃসন্দেহে আরও বিস্তৃত হয়েছে। বা, একটি বিবৃতির কথা ভাবুন, যেমন মার্কস-এর : 'হাতে-চালানো কল এনে দেয় সামন্তপ্রভু সমেত এক সমাজ; বাষ্প-চালিত কারখানা এনে দেয় শিল্প-পুঁজিপতি সমেত এক সমাজ।'[৬] আধুনিক পরিভাষায় এটি কোনো সূত্র নয়, যদিও মার্কস হয়তো তেমন দাবিই করতেন। কিন্তু এটি একটি ফলদায়ী প্রকল্প যা আরও অনুসন্ধান ও নতুন বোধের পথ দেখায়। এইসব প্রকল্প ভাবনার অপরিহার্য হাতিয়ার। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে জার্মান অর্থনীতিবিদ ভের্নের সোমবার্ট স্বীকার করেন যে, যাঁরা মার্কসবাদ ত্যাগ করেছিলেন, এক 'অস্থিরতার অনুভূতি' তাঁদের পেয়ে বসেছিল।

[তিনি লেখেন :] যেসব স্বস্তিদায়ক সূত্র এতদিন ধরে আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন জটিলতার মধ্যে পথ দেখানোর কাজ করে, সেগুলো যখন আমরা হারিয়ে ফেলি ... তখন তথ্যের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি বলে মনে হয়, যতক্ষণ-না পা রাখার একটা নতুন জায়গা পাই বা সাঁতার কাটতে শিখি।'[৭]

ইতিহাসের পর্ববিভাগ সংক্রান্ত বিতর্কটি এই পর্যায়ে পড়ে। ইতিহাসকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করাটা কোনো তথ্য নয়, বরঞ্চ একটি প্রয়োজনীয় প্রকল্প বা

৫ 'ট্রিনিটি রিভিউ'-তে সার চার্লস এলিস (কেমব্রিজ, লেন্ট টার্ম, ১৯৬০), পৃ ১৪।

৬ 'মার্কস-এঙ্গেলস: রচনাসমগ্র' (গেসামটাউসগাবে), খণ্ড ১ ভাগ ৬, পৃ ১৭৯।

৭ ডব্লিউ সোমবার্ট, 'পুঁজিবাদের সারমর্ম' (দ কুইন্টএসেন্স অফ ক্যাপিটালিজম), ইংরিজি তর্জমা, ১৯১৫, পৃ ৩৫৪।

চিন্তার হাতিয়ার। এটি ততক্ষণই বৈধ যতক্ষণ পর্যন্ত এটি আঁধারে আলো দেয়, এবং এর বৈধতা ব্যাখ্যান-নির্ভর। কখন মধ্যযুগ শেষ হয়েছিল — এই নিয়ে যে-ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়, তা ঘটে কিছু ঘটনা নিয়ে তাঁদের ব্যাখ্যানের মধ্যে। প্রশ্নটি তথ্যের নয়; কিন্তু অর্থহীনও নয়। একইভাবে ইতিহাসকে বিভিন্ন ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বিভাজনও তথ্য নয়, বরং একটি প্রকল্প : ইওরোপীয় ইতিহাসের কথা বলা কিছু কিছু প্রসঙ্গে বৈধ ও কার্যকর, আবার অন্যত্র বিপথদর্শী ও দুরভিসন্ধিপ্রসূতও হতে পারে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন, রাশিয়া ইওরোপের অংশ; কয়েকজন তা প্রবলভাবে অস্বীকার করেন। ঐতিহাসিক যে-প্রকল্প গ্রহণ করেন তা-ই দিয়ে তাঁর পক্ষপাত বিচার করা যায়। সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি সাধারণ ঘোষণা আমায় উদ্‌ধৃত করতেই হবে, কারণ এটি বলেছেন একজন মহান সমাজবিজ্ঞানী যিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে শিক্ষণ পেয়েছিলেন। জর্জ সোরেল ছিলেন পেশায় ইন্‌জিনিয়ার, চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে তিনি সমাজের নানান সমস্যা নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। কোনো পরিস্থিতিতে, এমনকি অতিসরলীকণের ঝুঁকি নিয়েও, বিশেষ বিশেষ উপাদানকে আলাদা করে দেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দেন :

[তিনি লেখেন :] 'মানুষের উচিত নিজের পথ বুঝে এগোনো। তার উচিত নানান সম্ভাব্য ও আংশিক প্রকল্পকে যাচাই করা এবং বিভিন্ন অস্থায়ী সত্যের কাছাকাছি থেকেই সন্তুষ্ট হওয়া, যাতে ক্রমিক সংশোধনের দরজা খোলা থাকে।' [৮]

উনিশ শতক থেকে এটি অনেক দূরে, যখন বিজ্ঞানীরা, ও অ্যাক্টন-এর মতো ঐতিহাসিকরা, এমন একটি দিনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন যেদিন সুপরীক্ষিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁরা এমন একটি সর্বাত্মক জ্ঞানভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করবেন যেটি সব বিতর্কমূলক বিষয়কে চিরদিনের মতো ফয়সালা করে দেবে। আজকের দিনে বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকরা আরও বিনম্র এই আশা পোষণ করেন যে, তাঁরা একটি টুকরো প্রকল্প থেকে ক্রমেই আর-একটির এগিয়ে যাবেন, তাঁদের ব্যাখ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে আলাদা করবেন ও তাঁদের ব্যাখ্যানকে যাচাই করবেন তথ্য দিয়ে; আর তাঁরা যেভাবে কাজ করেন, তার মধ্যে মূলগত কোনো তফাত আছে

৮ জি সোরেল, 'সর্বহারা বিষয়ক একটি তত্ত্বের মালমশলা' (মাতেরিয় দ্যুন তেওরি দ্যু প্রোলেতারিআ), ১৯১৯, পৃ ৭।

বলে আমার মনে হয় না। আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি অধ্যাপক বারাক্লাফ-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলুম যে, ইতিহাস 'আদৌ তথ্যভিত্তিক নয়, বরঞ্চ এক সারি স্বীকৃত অভিমত'। আমি যখন এই বক্তৃতাগুলো তৈরি করছিলুম তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পদার্থবিদ বি বি সি বেতার-পরিবেশনে বৈজ্ঞানিক সত্যের সংজ্ঞার্থ দিলেন এই বলে যে 'এটি একটি বিবৃতি যাকে বিশেষজ্ঞরা প্রকাশ্যে মেনে নিয়েছেন'।[৯] এই দুই সূত্রের কোনোটাই পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। কেন — তা দেখা যাবে যখন বিষয়নিষ্ঠার প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনায় আসব। কিন্তু একজন ঐতিহাসিক ও একজন পদার্থবিদ পরস্পর-নিঃসম্পর্কিতভাবে একই সমস্যাকে প্রায় ঠিকই একই সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করছেন — তা মনে দাগ কাটে।

অসাবধান লোকের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য-অনুমান কিন্তু একটি কুখ্যাত ফাঁদ। গাণিতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা এইসব পর্যায়ের নানান বিজ্ঞানের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য আছে, তেমনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ খাড়া করা যায়, এবং এই প্রভেদই ইতিহাসকে — ও সেইসঙ্গে বোধহয় অন্যান্য তথাকথিত সমাজবিজ্ঞানকে — বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে: এই বিশ্বাসের পক্ষে যেসব যুক্তি আছে সেগুলোকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করতে চাই। এইসব আপত্তি — তার কয়েকটি অন্যদের চেয়ে বেশি প্রত্যয়বাহী — হলো সংক্ষেপে: (১) ইতিহাস একান্তভাবেই অনন্য নিয়ে চর্চা করে, বিজ্ঞান সাধারণ নিয়ে; (২) ইতিহাস কোনো শিক্ষা দেয় না; (৩) ইতিহাস ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে না; (৪) ইতিহাস মূলত বিষয়ীনিষ্ঠ, কারণ মানুষ নিজেকেই পর্যবেক্ষণ করছে; (৫) ইতিহাসের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত নানান ব্যাপার জড়িয়ে থাকে, বিজ্ঞানে তা নেই। এদের প্রত্যেকটিকে আমি এক-এক করে পরখ করার চেষ্টা করব।

প্রথম, এই অভিযোগ করা হয়েছে যে ইতিহাস অনন্য ও বিশেষ নিয়ে চর্চা করে আর বিজ্ঞান করে সাধারণ ও নির্বিশেষ নিয়ে। এই অভিমত, বলা যায়, আরিস্টটল থেকে শুরু হয়েছে। তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, ইতিহাসের চেয়ে কাব্য 'আরও দার্শনিক' ও 'আরও ভারবান', কারণ কাব্যের বিষয় হলো সাধারণ সত্য আর ইতিহাসের বিশেষ।[১০] উত্তরকালের প্রচুর লেখক,

৯ 'দ লিসনার'-এ ড.জে জিমান, ১৮ অগাস্ট ১৯৬০।

১০ 'কাব্যতত্ত্ব' (পোয়েটিক্‌স), অধ্যায় ৯।

একেবারে কলিংউড[১১] অবধি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে এই একই প্রভেদ খাড়া করেন। এটি একটি ভুল-বোঝাবুঝির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। হবস্-এর বিখ্যাত প্রবচনটি এখনও প্রযোজ্য : 'নাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নির্বিশেষ নয়, কারণ যেসব জিনিসের নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও একক।'[১২] প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি নিঃসন্দেহে সত্য : কোনো দুটি ভৌগোলিক গড়ন, একই প্রজাতির কোনো দুটি প্রাণী, দুটি পরমাণুও অভিন্ন নয়। তেমনি দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাও অভিন্ন নয়। বিশপ বাটলার-এর কাছ থেকে যে বৈশিষ্ট্যহীন মন্তব্যটি মূর আপন করে নিয়েছিলেন সেটি ভাষাতাত্ত্বিক দার্শনিকদের কাছে একদা বিশেষ প্রিয় ছিল : 'প্রত্যেক জিনিস হলো সেটি যা তা-ই আর অন্য কিছু নয়।' কিন্তু এই মন্তব্যটির যেমন অবশ করার প্রভাব ছিল, ঐতিহাসিক ঘটনার অনন্যতার ওপর জোর দিলেও তেমনি ব্যাপার হবে। এই পথে নামার পর আপনি তাড়াতাড়ি একধরনের দার্শনিক নির্বাণ লাভ করবেন যেখানে কোনো কিছুর সম্বন্ধেই কোনো কাজের কথা বলা যাবে না।

ঐতিহাসিক যে-ভাষা ব্যবহার করছেন এই ব্যাপারটি তাঁকে, বিজ্ঞানীর মতোই, সাধারণীকরণের প্রতি দায়বদ্ধ করে দেয়। পেলোপনেসিয়া-র যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল খুবই আলাদা ধরনের, এবং দুটোই ছিল অনন্য। কিন্তু ঐতিহাসিকরা দুটোকেই যুদ্ধ বলেন, এবং পণ্ডিতম্মন্যবাই কেবল তার প্রতিবাদ করবেন। কনস্টান্টিন-এর হাতে খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের উত্থান — এই দুটিকেই গিবন যখন বিপ্লব বলে অভিহিত করেন,[১৩] তখন তিনি দুটি অনন্য ঘটনার সাধারণীকরণ করেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা ইংরিজি, ফরাসি, রুশ ও চীন বিপ্লব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ঐ একই কাজ করেন। ঐতিহাসিক আসলে অনন্যের প্রতি আগ্রহী নন, বরঞ্চ সাধারণের মধ্যে যা অনন্য তাতেই তাঁর আগ্রহ। ১৯২০-র দশকে ১৯১৪-র যুদ্ধের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে আলোচনায় ঐতিহাসিকরা সাধারণত দুটি অনুমানের ভিত্তিতে এগোতেন। সে-দুটি হলো : যেসব কূটনীতিক গোপনে ও জনমত-নিয়ন্ত্রিত না-হয়ে কাজ করতেন তাঁদের অব্যবস্থা, অথবা নানান আঞ্চলিক সার্বভৌম রাষ্ট্রে

১১ আর জি কলিংউড, 'ঐতিহাসিক কল্পনা' (হিস্টোরিকাল ইমাজিনেশান), ১৯৩৫, পৃ ৫

১২ 'লেভিয়াথান', ১, ৪।

১৩ 'রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন', অধ্যায় ২০, অধ্যায় ৫০।

পৃথিবীর দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন। ১৯৩০-এর দশকে যে-অনুমানের ভিত্তিতে আলোচনা চলত তা হলো : যুদ্ধের কারণ ছিল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের চাপের তাড়নায়, দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিজেদের মধ্যে পৃথিবীকে ভাগ করে নেওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সমস্ত আলোচনাতেই যুদ্ধের, বা অন্তত বিশ শতকের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের নানান কারণ নিয়ে সাধারণীকরণের ব্যাপারটি জড়িয়ে ছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাই করার জন্য ঐতিহাসিক সারাক্ষণই সাধারণীকরণ ব্যবহার করেন। টাওয়ার অফ লন্ডন-এ রিচার্ড যুবরাজদের হত্যা করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে যদি পরিষ্কার সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকে, তাহলে ঐতিহাসিক নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন — সচেতনের চেয়ে অচেতনভাবেই মনে হয় — শাসকদের কি তাঁদের সিংহাসনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মেরে ফেলার অভ্যাস ছিল; আর তাঁর বিচার খুব স্বাভাবিকভাবেই সাধারণীকরণ দিয়ে প্রভাবিত হবে। ইতিহাসের পাঠক, ও সেই সঙ্গে তার লেখকও সারাক্ষণ সাধারণীকরণ করে চলেছেন। ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণকে তিনি তাঁর পরিচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেন — বা হয়তো তাঁর নিজের যুগেই। যখন আমি কার্লাইল-এর 'ফরাসি বিপ্লব' (ফ্রেন্চ্ রেভলিউশন) পড়ি, তখন দেখি যে তাঁর বিভিন্ন মন্তব্যকে আমার নিজস্ব বিশেষ আগ্রহের বিষয়, রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমি নিজে বারবার এইসব মন্তব্যের সাধারণীকরণ করে চলেছি। সন্ত্রাস সম্বন্ধে মন্তব্যটিই ধরুন :

'যেসব দেশ সমতামূলক ন্যায়বিচার জানত তাদের কাছে ভয়ঙ্কর — যেসব দেশ কোনোদিনই তা জানে নি তাদের কাছে তত অস্বাভাবিক নয়।'

বা, আরও তাৎপযথপূর্ণভাবে, এইটি :

'খুব স্বাভাবিক হলেও এটি দুর্ভাগ্যজনক যে এই পর্বের ইতিহাস সাধারণত লেখা হয়েছিল অতি উত্তেজনায়। ছড়িয়ে রয়েছে অত্যুক্তি, বিতৃষ্ণা, বিলাপ ; ও সব মিলিয়ে, অন্ধকার।'[১৪]

বা, আর-একটি, এবার ষোলো শতকে আধুনিক রাষ্ট্রের উত্থান সম্পর্কে বুর্কহার্ট-এর রচনা থেকে :

'যত বেশি সাম্প্রতিককালে ক্ষমতার উৎপত্তি হয়, ততই তা কম স্থিতিশীল হতে পারে — প্রথমত, যাঁরা ঐ ক্ষমতা সৃষ্টি করেন, তাঁরা দ্রুত আরও

১৪ 'ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস', ১, ৫, অধ্যায় ৯ ; ৩, ১, অধ্যায় ১।

আলোড়নে অভ্যস্ত হয়ে যান, কারণ তাঁরা চরিত্রগতভাবে উদ্ভাবক ও তা-ই থাকবেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা যেসব শক্তিকে জাগিয়ে তোলেন বা দাবিয়ে রাখেন, সেগুলোকে নিযুক্ত করা যায় শুধুই আরও বেশি হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে।' [১৫]

ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণীকরণ খাপ খায় না — এটা বাজে কথা। সাধারণীকরণেই ইতিহাসের সমৃদ্ধি ঘটে। নতুন 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস' (কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রি)-এর একটি খণ্ডে এল্টন যেমন গুছিয়ে বলেছেন, 'ঐতিহাসিক তথ্যের সংগ্রাহকের থেকে ঐতিহাসিককে যা আলাদা করে দেয় তা হলো সাধারণীকরণ' [১৬] তিনি এর সঙ্গে এও যোগ করতে পারতেন যে ঐ একই জিনিস প্রকৃতিবিজ্ঞানীর থেকে প্রকৃতিজিজ্ঞাসু বা নমুনা-সংগ্রাহককে আলাদা করে দেয়। কিন্তু এমন ধরে নেবেন না যে সাধারণীকরণ ইতিহাসের কোনো বিশাল ছক গড়ে তুলতে দেয় যার মধ্যে বিভিন্ন বিশিষ্ট ঘটনাকে খাপ খাওয়াতেই হবে। আর মার্কস তাঁদেরই অন্যতম, যাঁর বিরুদ্ধে প্রায়ই একধরনের ছক গড়ার বা তাতে বিশ্বাস করার অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি তাই এই অংশের উপসংহার হিসেবে মার্কস-এর একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেব, যার থেকে এর সঠিক পরিপ্রেক্ষিতটি পাওয়া যায় :

'লক্ষণীয় রকমের একই জাতীয় ঘটনা — কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশে ঘটেছে — পুরোপুরি ভিন্ন ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। এইসব বিবর্তনের প্রত্যেকটি আলাদাভাবে অনুধাবন করে ও তারপর সেগুলোর মধ্যে তুলনা করে এই প্রক্রিয়াটিকে বোঝার চাবিকাঠিটি খুঁজে পাওয়া সহজ। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্ব — ইতিহাসের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে থাকাই যার মহাগুণ — তার 'চিচিং ফাঁক' ব্যবহার করে এই বোধে উপনীত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।' [১৭]

১৫ জে বুকহার্ট, 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধে বিচার', ১৯৫৯, পৃ ৩৪।

১৬ 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস', খণ্ড ২, ১৯৫৮, পৃ ২০।

১৭ মার্কস ও এঙ্গেলস, 'রচনাবলি' (রুশ সংস্করণ), খণ্ড ১৫, পৃ ৩৭৮। এই অংশটি যে-চিঠি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটি রুশ পত্রিকা 'ওতেকেস্তভেন্নিয়ে জাপিস্কি'-তে ১৮৭৭-এ বেরিয়েছিল। অধ্যাপক পপার যাকে 'ইতিহাসবাদের কেন্দ্রীয় ভ্রান্তি' বলেন তার সঙ্গে তিনি মার্কসকে যুক্ত করতে চান বলে মনে হয়, অর্থাৎ এই বিশ্বাসকে যে নানারকম ঐতিহাসিক প্রবণতা বা ধারাকে 'বিভিন্ন সর্বজনীন সূত্র থেকেই অব্যবহিতভাবে নির্ণয় করা যায়' ('ইতিহাসবাদের দৈন্য' (দ পভার্টি অফ হিস্টোরিসিজম), ১৯৫৭, পৃ ১২৮-৯) : মার্কস ঠিক এটাই অস্বীকার করেছেন।

অনন্য ও সাধারণের মধ্যে সম্পর্কই ইতিহাসের আলোচ্য। ঐতিহাসিক হিসেবে আপনি যেমন তথ্য ও ব্যাখ্যানকে আলাদা করতে পারেন না, তেমনি আলাদা করতে পারেন না অনন্য ও সাধারণকে, বা এর কোনোটিকে অপরটির তুলনায় অগ্রাধিকারও দিতে পারেন না।

ইতিহাস ও তথ্যের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বোধহয় এইখানে করা যায়। আজকাল সমাজতত্ত্ব দুটি বিপরীত বিপদের মুখোমুখি হয়েছে — অতি-তাত্ত্বিক হওয়ার বিপদ ও অতি-অভিজ্ঞতাবাদী হওয়ার বিপদ। প্রথমটি হলো সাধারণভাবে সমাজ সম্পর্কে বিমূর্ত ও অর্থহীন সাধারণীকরণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার বিপদ। সমাজের আগে 'শ্রী' যোগ করাটা ইতিহাসের আগে 'শ্রী' যোগ করার মতোই সমান বিপথদর্শী ভুল। ইতিহাসে নথিবদ্ধ নানান অনন্য ঘটনা থেকে সাধারণীকরণের ঐকান্তিক দায় যারা সমাজতত্ত্বের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, এই বিপদকে আরও কাছে ডেকে এনেছেন তাঁরাই: এমনকি এও বলা হয়েছে যে সমাজতত্ত্বের নানান 'সূত্র' আছে বলেই ইতিহাসের থেকে এটি আলাদা।[১৮] অন্য যে-বিপদটি কার্ল মানহাইম প্রায় এক পুরুষ আগে দেখতে পেয়েছিলেন এবং আজ যা খুব বেশি করে দেখা যাচ্ছে তা হলো: সমাজতত্ত্বকে 'সামাজিক পুনর্বিন্যাসঘটিত এক সারি বিশিষ্ট প্রকরণগত সমস্যায় ভেঙে ফেলা'।[১৯] বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমাজই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য। তার প্রত্যেকটিই অনন্য ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পূর্ব-ঘটনা ও পরিস্থিতির ছাঁচে ঢালাই হয়েছে। কিন্তু সাধারণীকরণ ও ব্যাখ্যান এড়ানোর চেষ্টায়, তথাকথিত নানান 'প্রকরণগত' সমস্যার বিবরণ ও বিশ্লেষণে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ এক অনড় সমাজের অচেতন অনুমোদকে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮ এটাই মনে হয় অধ্যাপক পপার-এর মত ('অবাধ সমাজ' (দ ওপেন সোসাইটি), দ্বিতীয় সং, ১৯৫২, খণ্ড ২, পৃ ৩২২)। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একটি সমাজতাত্ত্বিক সূত্রের উদাহরণ দিয়েছেন: 'বিভিন্ন বৈধ প্রতিষ্ঠান ও আলোচনার বিস্তার সুনিশ্চিত করে এইরকম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যখনই চিন্তার স্বাধীনতা ও চিন্তার চলাচল কার্যকরভাবে সংরক্ষিত হয় তখনই হবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি।' এটি লেখা হয়েছিল ১৯৪২ বা ১৯৪৩-এ এবং নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বিভিন্ন পশ্চিমী গণতন্ত্র তাদের প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির উৎকর্ষের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সামনের সারিতে থাকবে। তারপর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশের ফলে এই বিশ্বাস প্রতিহত বা প্রচণ্ডভাবে খর্বিত হয়ে পড়েছে। সূত্র হওয়া দূরস্থান, এটি এমনকি বৈধ সাধারণীকরণও নয়।

১৯ কে মানহাইম, 'মতাদর্শ ও কল্পরাজ্য' (ইডিওলজি অ্যান্ড ইউটোপিয়া), ইংরিজি তর্জমা, ১৯৩৬, পৃ ২২৮।

সমাজতত্ত্বকে যদি চর্চার সার্থক ক্ষেত্র হতে হয় তাহলে তাকে ইতিহাসের মতো অনন্য ও সাধারণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতেই হবে। কিন্তু তাকে গতিমান হতে হবে — স্থিত সমাজের চর্চা নয় (কারণ সে ধরনের কোনো সমাজ নেই), সামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশের চর্চা। বাকিটুকুর জন্যে আমি শুধু বলব, ইতিহাস যত বেশি সমাজতাত্ত্বিক হয়ে ওঠে ও সমাজতত্ত্ব যত বেশি ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে, ততই দু-এর পক্ষে আরও মঙ্গল। দু-তরফা যাতায়াতের জন্যে দু-এর মধ্যেকার সীমানা যেন বেশ খোলা থাকে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন : ইতিহাসের শিক্ষা। এর সঙ্গে সাধারণীকরণের প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণীকরণের আসল কথা হলো, এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাস থেকে শেখার চেষ্টা করি, একসার ঘটনা থেকে সংগৃহীত শিক্ষা প্রয়োগ করি অন্য একসারে: আমরা যখন সাধারণীকরণ করি, তখন সচেতন বা অচেতনভাবে এই কাজটিই করার চেষ্টা করছি। যাঁরা সাধারণীকরণকে খারিজ করেন এবং ইতিহাস শুধুই অনন্য নিয়ে মাথা ঘামায় — এর ওপর জোর দেন, তাঁরা হলেন, যথেষ্ট যুক্তিসম্পন্ন কারণেই, সেইসব লোক যাঁরা স্বীকার করেন না ইতিহাস থেকে কিছু শেখা যায়। কিন্তু, মানুষ ইতিহাস থেকে কিছুই শেখে না — এই অভিমতের বিরোধিতা করে প্রচুর পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য। হামেশাই এই অভিজ্ঞতা হয়। ১৯১৯-এ ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের একজন কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমি হাজির ছিলুম পারী শান্তি সম্মেলনে। প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন, একশ বছর আগের শেষ মহান শান্তি কংগ্রেস, অর্থাৎ ভিয়েনা কংগ্রেস-এর শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি। কংগ্রেসের শিক্ষা কী তা একটি প্রবন্ধে লিখে আমাদের জানিয়ে দেন জনৈক ক্যাপ্টেন ওয়েবস্টার (তখন তিনি যুদ্ধদপ্তরে কাজ করতেন, এখন তিনি সার চার্লস ওয়েবস্টার ও এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক)। তার দুটো কথা আমার মনে রয়ে গেছে। একটি হলো, ইওরোপের মানচিত্র নতুন করে আঁকার সময়ে আত্মনির্ধারণের নীতিকে অবহেলা করা বিপজ্জনক। অন্যটি, আপনার বাজে কাগজের ঝুড়িতে গোপনীয় দলিলপত্র ছুঁড়ে ফেলা বিপজ্জনক; অন্য কোনো প্রতিনিধিদলের গুপ্তচর বিভাগ নির্ঘাত তার মালমশলা কিনে নেবে। ইতিহাসের এইসব শিক্ষাকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের আচরণকেও তা প্রভাবিত করে। এই উদাহরণটি সাম্প্রতিক ও তুচ্ছ। কিন্তু তুলনায় সুদূর ইতিহাসে আরও সুদূর অতীতের শিক্ষার প্রভাব খুঁজে বার করতে কোনো কষ্ট হবে না। রোমের ওপর প্রাচীন গ্রীসের অভিঘাতের কথা সবাই জানেন। কিন্তু

হেল্লাস-এর ইতিহাস থেকে রোমানরা যে-শিক্ষা পেয়েছিলেন বা শিখেছেন বলে নিজেরা বিশ্বাস করেছিলেন তার যথাযথ বিশ্লেষণের চেষ্টা কোনো ঐতিহাসিক করেছেন কিনা সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। সতেরো, আঠেরো ও উনিশ শতকে হিব্রুদের প্রাচীন বিধান (ওল্ড টেস্টামেন্ট)-এর ইতিহাস থেকে পশ্চিম ইওরোপ যেসব শিক্ষা নিয়েছে তা পরীক্ষা করলে কষ্টসার্থক ফল পাওয়া যেতে পারে। একে বাদ দিলে ইংল্যান্ড-এর পিউরিটান বিপ্লব পুরোপুরি বোঝা যাবে না; আর, আধুনিক জাতীয়তাবাদের উত্থানে (ঈশ্বরের) বাছাই-করা লোকের ধারণা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উনিশ শতকে গ্রেট ব্রিটেন-এর নতুন শাসকশ্রেণীর ওপর চিরায়ত শিক্ষার ছাপ গভীরভাবে দেগে দেওয়া হয়। আমি যেমন আগেই বলেছি, নতুন গণতন্ত্রের আদর্শ নমুনা হিসেবে গ্রেট এথেন্স-এর দিকে আঙুল দেখান। রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস যেসব বিশদ ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-স্রষ্টাদের মধ্যে সচেতন বা অচেতনভাবে বিস্তার করেছিল সে নিয়ে একটি গবেষণা আমি দেখতে চাই। আমার নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে, ফরাসি বিপ্লবের, অর্থাৎ ১৮৪৮-এর বিপ্লব ও ১৮৭১-এর পারী কমিউন-এর নানান শিক্ষা রুশ বিপ্লবের নায়কদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল — বলা যায়, তাঁরা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের দ্বৈত চরিত্র যে শর্তসীমা আরোপ করে সে-কথা আমি এখানে স্মরণ করব। ইতিহাস থেকে শেখা কখনোই একতরফা প্রক্রিয়া নয়। অতীতের আলোয় বর্তমানকে শেখা মানে একই সঙ্গে বর্তমানের আলোয় অতীতকে শেখা। অতীত ও বর্তমানের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দু-এর সম্পর্কে আরও গভীর এক বোধ সঞ্চারিত করাই ইতিহাসের কাজ।

ইতিহাসে ভবিষ্যদ্‌বাণীর ভূমিকা আমাব তৃতীয় বক্তব্য: বলা হয়, ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাই পাওয়া যায় না, কারণ ইতিহাস বিজ্ঞানের মতো ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে নানা ভুল-বোঝাবুঝির জালে। আমরা যেমন দেখেছি, বিজ্ঞানীরা আর আগের মতো প্রকৃতির বিভিন্ন সূত্র নিয়ে কথা বলতে উৎসুক নন। বিজ্ঞানের যেসব তথাকথিত সূত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলো আসলে প্রবণতা সংক্রান্ত বিবৃতি, অন্যান্য অবস্থা একইরকম থাকলে বা পরীক্ষাগারের পরিবেশে কী হবে সে সম্পর্কে বিবৃতি। বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কী হবে সে নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার দাবি তারা করে না। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র দিয়ে প্রমাণ হয় না যে ঐ বিশেষ আপেলটি মাটিতে পড়বে: কেউ হয়তো সেটিকে ঝুড়িতে ধরে ফেলতে পারে। আলো সরলরেখায় চলে —

আলোকবিদ্যার এই সূত্রটি প্রমাণ করে না যে, একটি বিশেষ আলোকরশ্মি মধ্যবর্তী কোনো বস্তুর মাধ্যমে প্রতিসরিত বা বিচ্ছুরিত হতে পারে না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এইসব সূত্র মূল্যহীন, বা নীতিগতভাবে বৈধ নয়। আমরা জানি, আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের নানান সূত্র বিচার করে শুধু ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা নিয়ে। আজ বিজ্ঞান এটা মনে রাখার বেশি পক্ষপাতী যে আরোহ শুধু যুক্তির দিক দিয়ে নানারকম সম্ভাব্যতা বা যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এবং বিজ্ঞান তার নানান ঘোষণাকে সাধারণ নীতি বা নির্দেশক — যাদের বৈধতা শুধু কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়াতে যাচাই করা যায় — হিসেবে গণ্য করতে বেশি উদ্‌গ্রীব। কোঁত যেরকম বলেছিলেন, 'জ্ঞান থেকে আসে দূরদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি থেকে কর্ম'।[২০] সাধারণ ও বিশেষ, সর্বজনীন ও অনন্যের ভেতর এই পার্থক্যের মধ্যেই ইতিহাসে ভবিষ্যদ্‌বাণীর সূত্রটি নিহিত আছে। আমরা যেমন দেখেছি, ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ করতে বাধ্য; এবং তা করতে গিয়েই তিনি ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন নির্দেশকের যোগান দেন। এইসব নির্দেশক নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণী না হলেও একই সঙ্গে বৈধ ও উপযোগী। কিন্তু ঐতিহাসিক বিভিন্ন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেন না; কারণ নির্দিষ্ট মানে অনন্য, এবং তার মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান এসে পড়ে। এই পার্থক্য দার্শনিকদের বিচলিত করে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এটি পুরোপুরি স্পষ্ট। কোনো স্কুলে দুটি বা তিনটি বাচ্চার হাম হলে আপনি সিদ্ধান্ত করবেন, মহামারীটি ছড়িয়ে পড়বে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী — আপনার যদি তা-ই বলার ইচ্ছে হয় — অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি একটি সাধারণীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্মের ক্ষেত্রে একটি বৈধ ও উপযোগী নির্দেশক। কিন্তু রাম বা সীতার হাম হবে — এই নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণী আপনি করতে পারবেন না। ঐতিহাসিক এভাবেই এগোন। সামনের মাসে আজবপুরে বিপ্লব শুরু হবে — এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটি ঐতিহাসিক করবেন বলে লোকে আশা করে না। খানিকটা আজবপুরের ঘটনাবলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট জ্ঞান থেকে ও খানিক ইতিহাসচর্চা থেকে লোকে যে ধরনের সিদ্ধান্ত করতে চাইবে তা হলো : আজবপুরের অবস্থা এমন যে কিছুদিনের মধ্যেই একটা বিপ্লব শুরু হতে পারে, যদি কেউ তা বাধিয়ে দেয়, অথবা যদি সরকারপক্ষের কেউ তা বন্ধ করার জন্যে কিছু না করে। আর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে নানারকম হিসেব। সেগুলোর ভিত্তি হবে খানিকটা অন্যান্য বিপ্লবের সঙ্গে মিল, জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ

২০ 'প্রত্যক্ষবাদী দর্শন বিষয়ক বক্তৃতাবলি' (ক্যুর দ্য ফিলোজ়ফি পজ়িতিভ), খণ্ড ১, পৃ ৫১।

যে-মনোভাব গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায় তার সঙ্গে মিল। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী — একে যদি তা বলা যায় — বাস্তবায়িত হবে একমাত্র নানান অনন্য ঘটনা ঘটার মাধ্যমে, যেগুলোর সম্পর্কে কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইতিহাস থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব সিদ্ধান্ত টানা যায় তার সবই মূল্যহীন বা সেগুলোর মধ্যে কোনো শর্তাধীন বৈধতা নেই, যে-বৈধতা একই সঙ্গে কর্মের নির্দেশক ও ঘটনা কীভাবে ঘটে সে-বিষয়ে আমাদের বোধের চাবিকাঠি। আমি এমন প্রস্তাব করতে চাই না যে, সুনির্দিষ্টতার দিক দিয়ে সমাজবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ভৌতবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনীয় হবে, বা এই ক্ষেত্রে তাঁদের হীনতার কারণ শুধু এই যে, বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান তুলনায় বড় বেশি পেছিয়ে আছে। যে-কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতেই মানুষ হলো আমাদের জানা সবচেয়ে জটিল প্রাকৃতিক সত্তা এবং তার আচরণ অনুধাবনে এমন ধরনের সমস্যা থাকতে পারে যা ভৌতবিজ্ঞানীর সমস্যার থেকে আলাদা। আমি যেটুকু প্রতিষ্ঠা করতে চাই তা শুধু এই যে তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি মূলত আলাদা নয়।

ইতিহাস সহ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান এবং ভৌতবিজ্ঞানের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানার ব্যাপারে আমার চতুর্থ বক্তব্যটি অনেক বেশি সুসংহত যুক্তি হাজির করে। এই যুক্তিটি হলো : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে আলোচক ও আলোচ্য একই পর্যায়ভুক্ত এবং একে অপরের ওপর পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল। নানারকম প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে মানুষ শুধু সবচেয়ে জটিল ও পরিবর্তনশীলই নয়, তাকে অনুধাবন করতে হবে অন্য মানুষদেরই, অপর কোনো প্রজাতির স্বাধীন পর্যবেক্ষকরা তা করবে না। এখানে জীববিজ্ঞানের মতো মানুষ আর শুধু তার নিজের শারীরিক গঠনপ্রকৃতি ও নানান শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করেই সন্তুষ্ট নয়। মানবিক আচরণের মধ্যে যে-ইচ্ছে ক্রিয়াশীল থাকে সেই আচরণের বিভিন্ন রূপভেদ করার প্রয়োজন হয় সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ বা ঐতিহাসিকের, যাতে তিনি ঠিক ধরতে পারেন তাঁর অনুধাবনের বিষয়বস্তু যে-মানুষ সে যখন সক্রিয় হয়েছে তখন তার কেন সক্রিয় হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। এতে পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত — এই দু-এর মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি হয় যেটি একান্তই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপার। ঐতিহাসিক যা পর্যবেক্ষণ করেন তার প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটি অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়ে; ইতিহাস আগাগোড়াই আপেক্ষিকতায় ভরা। কার্ল মানহাইম-এর কথায়, 'নানান অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভূত, সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করা হয় যেসব

পর্যায়ে এমনকি সেগুলোও পর্যবেক্ষকের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী পাল্টে যায়'।[২১] কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর সব পর্যবেক্ষণেই তাঁর নিজের পক্ষপাত অবধারিতভাবে এসে পড়বে — এটাই একমাত্র সত্যি নয়। এও সত্যি যে, যাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তাকে অনুভাবিত ও অনুশোধিত করে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া। এবং তা হতে পারে দুটি উল্টো পথে। যেসব মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্‌বাণীর লক্ষ্য বলে ঠিক করা হয় তাদের আগের থেকে সতর্ক করা যেতে পারে। তাদের কাছে অবাঞ্ছিত ফলাফলের ভবিষ্যদ্‌বাণীর মধ্যে দিয়ে এই সতর্ক করার ব্যাপারটি ঘটবে, এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেদের কার্যকলাপ অনুশোধন করতে প্রণোদিত হবে। ফলে ভবিষ্যদ্‌বাণীটি যতই সঠিক বিশ্লেষণভিত্তিক হোক না কেন, তা স্বতঃব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়। ইতিহাস-সচেতন লোকেদের মধ্যে ইতিহাস কেন কদাচিৎ নিজের পুনরাবৃত্তি করে তার একটা কারণ এই যে, নাটকের কুশীলবরা দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময়ে প্রথমবারের পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ থাকে, এবং তাদের কার্যকলাপ প্রভাবিত হয় ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে।[২২]

ফরাসি বিপ্লব যে নেপোলিয়ন-এ এসে শেষ হয়েছিল তা বলশেভিকরা জানতেন এবং তাঁদের বিপ্লবও ঐ একই পথে শেষ হতে পারে — এ ভয় তাঁদের ছিল। ফলে তাঁদের নিজস্ব নেতৃবর্গের মধ্যে ট্রট্স্কিকে — যাঁকে সবচেয়ে বেশি নেপোলিয়ন-এর মতো লাগত — তাঁকে তাঁরা অবিশ্বাস করেছিলেন ও যাঁকে সবচেয়ে কম নেপোলিয়ন-এর মতো লাগত-সেই স্টালিনকে তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি উল্টো দিকেও কাজ করতে পারে। প্রচলিত বিভিন্ন আর্থনীতিক লক্ষণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে অর্থনীতিবিদ আসন্ন তেজি বা মন্দার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, যদি তাঁর বিরাট মর্যাদা থাকে ও যুক্তি সুসংহত হয়, তাহলে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাধ্যমেই তিনি যে-সংঘটনের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে তা ঘটার ক্ষেত্রে হাত লাগাতে পারেন। যে-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নানান ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের জোরে এই স্থিরবিশ্বাস পোষণ করেন যে স্বৈরতন্ত্রের পরমায়ু খুব বেশি নয়, তিনি হয়তো সেই স্বৈরতন্ত্রীর পতনের ক্ষেত্রে হাত লাগাতে পারেন। নির্বাচনপ্রার্থীদের আচরণ সবাই জানেন। এঁরা নিজেদের জয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হওয়ার সম্ভাবনা যাতে

২১ কে মানহাইম, 'মতাদর্শ ও কল্পরাজ্য', ১৯৩৬, পৃ ১৩০।

২২ 'বোলশেভিক বিপ্লব' (দ বোলশেভিক রেভলিউশন), ১৯১৭-১৯২৩', খণ্ড ১, ১৯৫০, পৃ ৪২-এ লেখক এই যুক্তিটির বিস্তার করেছেন।

আরও বাড়ে এই সচেতন উদ্দেশ্যে। অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক যখন ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ঝুঁকি নেন তখন সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীটি যাতে তাড়াতাড়ি বাস্তবে পরিণত হয় এই অচেতন আশায় তাঁরা মাঝেমাঝে উদ্বুদ্ধ হন বলে সন্দেহ হয়। পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিতের মধ্যে, সমাজবিজ্ঞানী ও তাঁর উপাত্তের মধ্যে এবং ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া তা অবিচ্ছিন্ন ও অবিরতই পরিবর্তনশীল — এইসব জটিল সম্পর্কের বিষয়ে শুধু এইটুকুই বোধহয় নিরাপদে বলা যায়, এবং এটাই ইতিহাস ও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে মনে হয়।

আমার বোধহয় এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে সাম্প্রতিককালে কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে-ভাষায় কথা বলেছেন তাতে বস্তুজগৎ ও ঐতিহাসিকের জগতের মধ্যে আরও বেশি নজর করার মতো মিল আছে বলে মনে হয়। প্রথমত, তাঁদের গবেষণার ফলাফলের মধ্যে নাকি একটি অনিশ্চয়তা বা অনির্ণেয়তার নীতি জড়িয়ে আছে। আমার পরের বক্তৃতায় আমি ইতিহাসে তথকথিত নির্ধাবণবাদের প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলব। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অনির্ণেয়তা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই আছে, নাকি এটি বিশ্ব সম্পর্কে এযাবৎ আমাদেরই অসম্পূর্ণ বোধের সূচক মাত্র (বিষয়টি নিযে এখনও বিতর্ক চলছে) — ঘটনা যা-ই হোক না কেন, এর মধ্যে আমাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করাব ক্ষমতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে একই সন্দেহ থাকা উচিত, যেমন কয়েকবছর আগে বিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়াকলাপ প্রমাণের সন্ধানে কিছু উৎসাহী মানুষের প্রয়াসকে সন্দেহ করা হতো। দ্বিতীয়ত, আমরা শুনি যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে দেশ ও কালের দূরত্ব ও অতিক্রান্তির যে-পরিমাপ, তা 'পর্যবেক্ষকে'ব গতির ওপর নির্ভরশীল। 'পর্যবেক্ষক' ও পর্যবেক্ষণের বিষয়ের মধ্যে একটি ধ্রুব সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব বলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সব পরিমাপ অন্তর্নিহিত রকমফেরের অধীন; 'পর্যবেক্ষক' ও পর্যবেক্ষিত — বিষয়ী ও বিষয় দুই-ই — পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত ফলাফলের মধ্যে এসে যায়। স্বল্পতম পরিবর্তন করে নিয়ে এইসব বর্ণনা ঐতিহাসিক ও তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, আমি কিন্তু এ ব্যাপারে পরিতুষ্ট নই যে এইসব সম্পর্ক, প্রকৃত কোনো অর্থে, পদার্থবিজ্ঞানী ও তাঁর বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনীয়। যেসব পার্থক্যের দরুন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, যদিও আমি নীতিগতভাবে সেগুলোকে বাড়ানোর চেয়ে কমানোর ব্যাপারেই ভাবি, তাহলেও বেঠিক মিলের ওপর নির্ভর করে সেগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাটা কাজের কাজ হবে না।

কিন্তু, আমার মনে হয়, যদিও এটা বলে নেওয়া ভালো যে, সমাজবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁদের চর্চার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ভৌতবিজ্ঞানীর তাঁর বিষয়ে যুক্ত হওয়ার থেকে অন্য ধরনের, এবং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব প্রসঙ্গ ওঠে তা অনন্ত মাত্রায় জটিলতর, তাহলেও বিষয়টি এখানেই শেষ হয় না। সতেরো, আঠেরো ও উনিশ শতক জুড়ে প্রচলিত জ্ঞানের সবরকম চিরায়ত তত্ত্বই ধরে নিয়েছিল যে জ্ঞাতা বিষয়ী ও জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে আছে তীব্র দ্বৈততা। প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে যেভাবেই ধারণা করা হোক না কেন, দার্শনিকদের তৈরি নমুনায় দেখা গেল বিষয়ী ও বিষয়, মানুষ ও বাহ্যজগৎ বিভক্ত ও বিযুক্ত। এটি ছিল বিজ্ঞানের জন্ম ও বিকাশের মহান যুগ। জ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বিজ্ঞানের দিকপালদের মনোভঙ্গির মাধ্যমে জোরালভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। মানুষকে রাখা হয়েছিল বাহ্যজগতের তীব্র বিপরীতে। বাহ্যজগতের সঙ্গে সে ধস্তাধস্তি করেছিল যেন সেটা অবাধ্য ও সম্ভাব্য শত্রু। অবাধ্য, কারণ একে বোঝা শক্ত, সম্ভাব্য শত্রু, কারণ একে তাঁবে আনা শক্ত। আধুনিক বিজ্ঞানে নানারকম সাফল্যের ফলে এই মনোভঙ্গি আমূল অনুশোধিত হয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি এমন কিছু যার বিরুদ্ধে লড়তে হবে — আজকাল বিজ্ঞানীর মধ্যে এমন চিন্তা করার ঝোঁক অনেক কম। তিনি বরঞ্চ একে দেখেন এমন কিছু হিসেবে যার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে ও নিজের উদ্দেশ্যে বশে আনতে হবে। জ্ঞানের বিভিন্ন চিরায়ত তত্ত্ব এই নতুনতর বিজ্ঞানের সঙ্গে আর খাপ খায় না — সবচেয়ে কম খাপ খায় পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, গত পঞ্চাশ বছরে দার্শনিকরা এইসব চিরায়ত তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, এবং তাঁরা স্বীকার করেছেন যে জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় বিষয়ী ও বিষয়কে অমন বিযুক্ত করা দূরস্থান, তাদের মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা জড়িত আছে। সমাজবিজ্ঞানগুলোর ক্ষেত্রে এটি অবশ্য চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞানের প্রথাগত প্রয়োগবাদী তত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসচর্চাকে খাপ খাওয়ানো শক্ত — আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি সে-আভাস দিয়েছিলুম। আমি এখন এই যুক্তি দিতে চাই যে, বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে যেহেতু বিষয়ী ও বিষয়, তদন্তকারী ও তদন্তের বিষয় — এই দুভাবেই মানুষ জড়িত থাকে, তাই সামগ্রিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের এমন কোনো তত্ত্ব খাপ খাবে না যেখানে বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে অনড় বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়। একটি সুসংবদ্ধ মতবাদের সম্পুট হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সমাজবিজ্ঞানে খুব সঙ্গতভাবেই জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব নামে একটি শাখা তৈরি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এটি কিন্তু খুব বেশি এগোয় নি। তার কারণ, আমার সন্দেহ হয়, এটি প্রধানত একটি

প্রথানির্ভর জ্ঞানতত্ত্বের খাঁচার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েই তুষ্ট রয়েছে। প্রথমে আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের ও এখন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অভিঘাতে দার্শনিকরা যদি এই খাঁচা ভেঙে বেরোতে শুরু করে থাকেন, এবং তাঁবা যদি জ্ঞানের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, নিষ্ক্রিয় চেতনার ওপর উপাত্ত-র অভিঘাত — এই পুরোনো বিলিয়ার্ড-বল নমুনার চেয়ে আরও বেশি হালফিলের কোনো নমুনা খাড়া করেন, তাহলে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান, বিশেষ করে ইতিহাসের পক্ষে তা শুভ লক্ষণ। এর খানিক গুরুত্ব আছে, এবং পরে ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠা বলতে আমরা কী বুঝি তা নিয়ে যখন বিবেচনা করব, তখন আবার এই ব্যাপারটিতে ফিরে আসব।

ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে ইতিহাস সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও এমনকি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের থেকেও আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ — এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমায় আলোচনা করতে হবে। শেষ বিষয় হলেও এটি অকিঞ্চিৎকর নয়। আমার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য যতটুকু দরকার ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আমি শুধু সেইটুকুই বলব। যে-ঈশ্বর বিশ্বকে সৃষ্টি ও বিন্যস্ত করেছেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও একজন সিরিয়স জ্যোতির্বিদ হওয়া — এ দু-এর মধ্যে বোঝাপড়া করা যায়। কিন্তু কোনো গ্রহেব গতিপথ পাল্টানো, সূর্য- বা চন্দ্রগ্রহণ মুলতুবি রাখা বা মহাজাগতিক লীলার নিয়মকানুন বদলানোয় যে-ঈশ্বর ইচ্ছেমতো হস্তক্ষেপ কবেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে এ ধরনের জ্যোতির্বিদ হওয়া ব্যাপারটির বোঝাপড়া হবে না। একইভাবে মাঝে মাঝে বলা হয় যে, একজন সিরিয়স ঐতিহাসিক এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস কবতে পারেন যিনি গোটা ইতিহাসকে বিন্যস্ত ও অর্থময় করে তুলেছেন, যদিও ঐ ঐতিহাসিক 'পুরনো বিধান' (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ধরনের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারেন না, যিনি আমালেকে-এর মানুষদের নিধনে হস্তক্ষেপ করেছেন বা জোসুয়া-র সৈন্যদলের সুবিধের জন্য দিনের আলোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিনপঞ্জি নিয়ে ঠকামি করেছেন। অথবা, ঐ ধরনের ইতিহাসকার বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের দোহাই পাড়তে পারেন না। একটি সাম্প্রতিক বইতে ফাদার ডার্সি এই পার্থক্যটি করার চেষ্টা করেছেন :

'ইতিহাসের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে, "এটি ছিল ঈশ্বরের অঙ্গুলিহেলন" — এই বলে কোনো ছাত্র পার পাবে না। যতক্ষণ-না আমরা বিভিন্ন পার্থিব ঘটনা ও

মানবিক নাটককে যতদূর সাধ্য সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপকতর বিবেচনা নিয়ে আসার অধিকার আমাদের নেই।'[২৩]

যে-কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বেখাপ্পা তা হলো : এখানে ধর্মকে যেন তাসের গোছায় জোকার-এর মতো ধরা হয়েছে, অর্থাৎ যাকে এমন কোনো সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ হাতসাফাই-এর জন্য সরিয়ে রাখা হবে যা অন্য কোনোভাবে সামলানো যায় না। এর চেয়ে ভালো করেছিলেন লুথারপন্থী ধর্মতাত্ত্বিক কার্ল বার্থ। তিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রভেদ ঘোষণা করেন বা পরেরটিকে ধর্মনিরপেক্ষতার হাতে তুলে দেন। অধ্যাপক বাটারফিল্ড, যদি আমি তাঁকে ঠিক বুঝে থাকি, একই ব্যাপার বোঝাতে চেয়েছেন, যখন তিনি 'প্রাকরণিক' ইতিহাসের কথা বলেন। প্রাকরণিক ইতিহাসই একমাত্র সেই ধরনের ইতিহাস যা আপনি বা আমি হয়তো কখনও লিখে উঠতে পারব, বা অধ্যাপক বাটারফিল্ড নিজে যা আজ অবধি লিখেছেন। কিন্তু এই অদ্ভুত চরিত্রনাম ব্যবহার করে তিনি এক গূঢ় বা ঐশ্বরিক ইতিহাসে বিশ্বাস করার অধিকার বজায় রাখেন যা নিয়ে আমাদের আর-সবার মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। বের্দিয়ায়েভ, নিবুহ্‌র ও মারিত্যাঁ-র মতো লেখকরা ইতিহাসের স্বয়ংসম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে চান, কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে ইতিহাসের পরিণতি বা লক্ষ্য আছে ইতিহাসের বাইরে। কোনো অতি-ঐতিহাসিক শক্তি — তা কোনো (ঈশ্বরের) প্রিয় সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, খ্রীস্টীয় ঈশ্বর, ঈশ্বরবাদীর 'সৃষ্টিকর্তার অদৃশ্য হাত' বা হেগেল-এর 'বিশ্বসত্তা' — এর মধ্যে যেটাই হোক না কেন, তার ওপর ইতিহাসের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ভরশীল — এই বিশ্বাসের সঙ্গে ইতিহাসের পূর্ণতাকে মেলানো ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে কঠিন লাগে। এই বক্তৃতামালার জন্য আমি ধরে নেব যে এই ধরনের কোনো দৈবশক্তির আশ্রয় না নিয়েই ঐতিহাসিককে তাঁর নিজের সমস্যার সমাধান করতে হবে; সেই অর্থে ইতিহাস হলো তাসের গোছার মধ্যে জোকার ছাড়া একটি খেলা।

ইতিহাসের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক আরও জটিল এবং অতীতে এই বিষয়ে আলোচনায় বেশ কিছু অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। ঐতিহাসিকের পক্ষে

২৩ এম সি ডার্সি, 'ইতিহাস-বোধ : ধর্মনিরপেক্ষ ও পবিত্র' (দ সেন্স অফ হিস্ট্রি : সেক্যুলার অ্যান্ড সেক্রেড), ১৯৫৯, পৃ ১৬৪ : পলিবিউস তার আগেই বলেছিলেন : 'কী ঘটেছে তার কারণ খুঁজে বার করা যেখানেই সম্ভব হবে সেখানে দেবতাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়'। কে ফন ফ্রিৎস, 'প্রাচীনকালে মিশ্র সংবিধানের তত্ত্ব' (দ থিওরি অফ দ মিক্স্‌ড্‌ কনস্টিটিউশন ইন অ্যান্টিকুইটি), নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃ ৩৯০-এ উদ্‌ধৃত)।

যে তার গল্পের চরিত্রদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায় ঘোষণা করার দায়িত্ব নেই — এর সমর্থনে যুক্তি দেওয়ার আর কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। ঐতিহাসিক ও নীতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। বদ স্বামী হলেও রাজা হিসেবে অষ্টম হেনরি হয়তো ভালোই ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসকার তার প্রথম ভূমিকার প্রতি শুধু ততদূরই আগ্রহী যতদূর সেটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে। যদি তাঁর নানারকম নৈতিক ভ্রষ্টতা দ্বিতীয় হেনরি-র মতোই জনজীবনে অত কম আপাত-প্রভাব রেখে থাকে, তা হলে ঐতিহাসিকের সেসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। গুণ ও অগুণ — দু-এর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। বলা হয় যে পাস্তুর ও আইনস্টাইন-এর ব্যক্তিগত জীবন ছিল দৃষ্টান্তস্থানীয়, এমনকি সন্তসুলভ। কিন্তু ধরা যাক, তাঁরা ছিলেন চরিত্রহীন স্বামী, নিষ্ঠুর পিতা ও অসৎ সহকর্মী। তাহলে কি তাঁদের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব কিছু কম হতো ? আর, এই সব নিয়েই ঐতিহাসিক ব্যাপৃত থাকেন। স্টালিন নাকি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ করেছিলেন, কিন্তু সোভিয়েত ঘটনাবলির ঐতিহাসিক হিসেবে আমি নিজে তাতে খুব একটা ভাবিত হই না। এর মানে এই নয় যে ব্যক্তিগত নৈতিকতার কোনো গুরুত্ব নেই, বা নীতির ইতিহাস ইতিহাসের ন্যায্য অংশ নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের বই-এর পাতায় যেসব ব্যক্তি হাজির হন, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায় ঘোষণা করার জন্য তিনি ঘুরে দাঁড়ান না। করার মতো অন্য অনেক কাজ তাঁব আছে।

প্রকাশ্য কার্যকলাপ প্রসঙ্গে নৈতিক রায়ের প্রশ্নে আরও গুরুতর অস্পষ্টতা দেখা দেয়। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব তাঁর নাটকের কুশীলবদের সম্বন্ধে নৈতিক রায় দেওয়া — এই বিশ্বাসটির একটি লম্বা খানদান আছে। কিন্তু উনিশ শতকের ব্রিটেনে এটি যে-পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সেরকম আর কখনোই হয় নি। সে যুগের নীতি-আরোপের ঝোঁক আর অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ চর্চা — এই দু-এর মাধ্যমেই তখন এই বিশ্বাস আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রোজ়বেরি দেখেছিলেন, নেপোলিয়ন সম্বন্ধে ইংরেজরা যা জানতে চাইত তা হলো তিনি 'ভালো লোক'[২৪] ছিলেন কিনা। ক্রেটন-কে লেখা চিঠিতে অ্যাক্টন ঘোষণা করেন, 'নৈতিক বিধানের অনমনীয়তাই হলো ইতিহাসের কর্তৃত্ব, মর্যাদা ও উপযোগিতার গোপন কথা।' তিনি দাবি করেন, ইতিহাসকে করা হবে 'বিতর্কের নিষ্পত্তিকার,

২৪ রোজবেরি, 'নেপোলিয়ন : শেষ পর্যায়' (নেপোলিয়ন : দ লাস্ট ফেজ), পৃ ৩৬৪।

ভবঘুরের দিশারি ও সেই নৈতিক মানের ধারক যাকে পৃথিবী ও ধর্মের স্বকীয় ক্ষমতা সর্বদাই দাবিয়ে রাখার ঝোঁক দেখায়'।[২৫] এই দৃষ্টিভঙ্গিটির ভিত্তি হলো ঐতিহাসিক তথ্যের বিষয়নিষ্ঠা ও চূড়ান্ততার ওপর অ্যাক্টন-এর প্রায় মরমীয়া বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ফলে, ইতিহাস বলে এক ধরনের অতি-ঐতিহাসিক শক্তির নামে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নৈতিক রায় ঘোষণা করা ঐতিহাসিকের পক্ষে আপাতভাবে দরকার হয়ে পড়ে এবং সেই অধিকারও তাঁর আসে। নানান অপ্রত্যাশিত রূপে এই মনোভাব এখনও মাঝেমাঝে দেখা দেয়। ১৯৩৫-এ মুসোলিনি-র আবিসিনিয়া আক্রমণকে অধ্যাপক টয়েন্‌বি 'ইচ্ছাকৃত ব্যক্তিগত পাপ'[২৬] বলে বর্ণনা করেন। আর যে-রচনাটি আগেই উদ্‌ধৃত করা হয়েছে সেখানে সার আইজ়ায়া বার্লিন প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঙ্গে নাছোড়ভাবে বলেন যে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো 'শার্লমান বা নেপোলিয়ন বা চেঙ্গিস খাঁ বা হিটলার বা স্টালিন-কে তাঁদের হত্যালীলার জন্য বিচার করা'।[২৭] এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যথেষ্ট ধিক্কার জানিয়েছেন অধ্যাপক নোল্‌স্। ব্যক্তির সম্বন্ধে নৈতিক রায়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্বিতীয় ফিলিপ সম্বন্ধে মোট্‌লে-র নিন্দাবাদ ('যদি এমন কোনো পাপ থাকে... যার থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন, তার কারণ এই যে, মানবস্বভাব এমনকি কদাচারেও পরোৎকর্ষ অর্জনের অনুমতি দেয় না') এবং স্টাব্‌স্-প্রদত্ত রাজা জন-এর বর্ণনাকে ('মানুষকে কলঙ্কিত করতে পারে এমন প্রতিটি অপরাধেই দূষিত') অধ্যাপক

২৫ অ্যাক্টন, 'ঐতিহাসিক নিবন্ধাবলি ও চর্চা' (হিস্টোরিক্যাল এসেজ অ্যান্ড স্টাডিজ), ১৯০৭, পৃ. ৫০৫।

২৬ 'সার্ভে অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স', ১৯৩৫, ২:৩।

২৭ আই বার্লিন, 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' (হিস্টোরিক্যাল ইনেভিটেবিলিটি), পৃ ৭৬-৭। সার আইজ়ায়া-র মনোভাব উনিশ শতকের সেই দৃঢ়বদ্ধ রক্ষণশীল আইনজ্ঞ ফিট্‌স্‌জেমস স্টিফেন-এর দৃষ্টিভঙ্গি মনে করিয়ে দেয়: 'অপরাধীদের ঘৃণা করা নৈতিকভাবে সঠিক — ফৌজদারি আইন এই নীতির ভিত্তিতেই এগোয়।... এটি খুবই প্রত্যাশিত যে অপরাধীদের ঘৃণা করা উচিত, তাদের যে শাস্তি দেওয়া হবে তা এমনভাবে খাড়া করা উচিত যাতে ঐ ঘৃণা প্রকাশ পায় এবং সেটি যেন ততদূর অবধি যুক্তিযুক্ত হয় যতদূর পর্যন্ত একটি স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক ভাবনাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যেসব সরকারি ব্যবস্থাপত্র আছে তা শাস্তি প্রদানে ন্যায্যতা আনে ও উৎসাহ দেয়'। ইংল্যান্ডের ফৌজদারি আইনের ইতিহাস' (আ হিস্ট্রি অফ দ ক্রিমিনাল ল অফ ইংল্যান্ড), ১৮৮৩, খণ্ড ২, পৃ ৮১-৮২। এল্ রাজিনোভিচ, 'সার জেমস ফিট্‌স্‌জেমস স্টিফেন', ১৯৫৭, পৃ ৩০-এ উদ্‌ধৃত) এইসব দৃষ্টিভঙ্গিকে অপরাধবিজ্ঞানীরা আর ব্যাপকভাবে সমর্থন করেন না। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে এখানে আমার ঝগড়া এই নিয়ে যে অন্য জায়গায় তাদের বৈধতা যা-ই হোক না কেন, ইতিহাসের রায়ের ক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োজ্য নয়।

নোল্স্ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় উদ্ধৃত করেন, যে-রায় ঘোষণা করা ঐতিহাসিকের যোগ্যতার মধ্যে পড়ে না। 'ঐতিহাসিক বিচারক নয়, ফাঁসি দেওয়ার বিচারক তো নয়ই।'[২৮] কিন্তু এ বিষয়ে ক্রোচে-রও একটি সুন্দর অনুচ্ছেদ আছে। সেটি আমি উদ্ধৃত করতে চাই :

'অভিযোক্তা এই বিরাট পার্থক্য ভুলে যায় যে, আমাদের বিচারালয় জীবিত, সক্রিয় ও বিপজ্জনক মানুষদের জন্যে তৈরি বর্তমানের বিচারালয়, আর ঐসব অন্যান্য মানুষ তাঁদের সময়ের বিচারালয়ে আগেই হাজির হয়েছিলেন ও তাঁদের দুবার দোষী সাব্যস্ত করা বা রেহাই দেওয়া যায় না। যে-কোনো ধরনের বিচারালয়ের কাছেই তাঁদের দায়ী করা যায় না, একমাত্র এই কারণে যে তাঁরা অতীতের মানুষ ও অতীতের শান্তিতেই তাঁদের স্থান। অতএব, তাঁরা ইতিহাসের বিষয় হতে পারেন এবং সে-বিচার তাঁদের ক্রিয়াকলাপের মর্ম ভেদ করে ও বোঝে, তাছাড়া তাঁরা অন্য কোনো বিচার পেতে পারেন না। ... যাঁরা ইতিহাসের বিবরণ দেওয়ার দোহাই পেড়ে বিচারক সেজে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান, এখানে দোষী সাব্যস্ত করেন, ওখানে রেহাই দিয়ে দেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে এটি ইতিহাসের দফ্তর ... সাধারণত তাঁদের ইতিহাসবোধশূন্য বলে চেনা যায়।'[২৯]

আর এই বিবৃতির বিরুদ্ধে কেউ যদি গজগজ করে যে হিটলার বা স্টালিন — বা, আপনি যদি চান, সেনেটর ম্যাকার্থি — এঁদের সম্পর্কে নৈতিক রায় দেওয়া আমাদের কাজ নয়, তাহলে তার কারণ এই যে এঁরা ছিলেন আমাদের অনেকেরই সমসাময়িক, এবং যাঁরা তাঁদের কার্যকলাপের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিগৃহীত হয়েছেন সেরকম হাজার হাজার মানুষ এখনও বেঁচে আছেন, এবং ঠিক এইসব কারণেই আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক হিসেবে এঁদের কাছে হাজির হওয়া এবং নিজেদের অন্যান্য ভূমিকা থেকে মুক্ত করা (যাতে তাঁদের কাজকর্ম বিচার করা যুক্তিগ্রাহ্য হয়) — এই দুটো ব্যাপারই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের পক্ষে এটি অস্বস্তির বিষয় —আমি বলব প্রধান অস্বস্তি —কিন্তু শার্লমান বা নেপোলিয়ন-এর পাপের নিন্দা করে আজ আর কার কী লাভ হবে ?

অতএব ফাঁসি-দেওয়া বিচারকের ভূমিকায় ঐতিহাসিক — এই

২৮ ডি নোল্স্, 'ঐতিহাসিক ও চরিত্র' (দ হিস্টোরিয়ান অ্যান্ড ক্যারেক্টার), ১৯৫৫, পৃ ৪-৫, ১২, ১৯।

২৯ বি ক্রোচে, 'স্বাধীনতার কাহিনী রূপে ইতিহাস', ইংরিজি তর্জমা, ১৯৪১, পৃ ৪৭।

ধারণাটি বর্জন করা যাক এবং ব্যক্তি নয়, বরঞ্চ অতীতের ঘটনা, প্রতিষ্ঠান ও নীতি সম্বন্ধে নৈতিক রায় ঘোষণা সংক্রান্ত আরও কঠিন ও আরও ফলদায়ক প্রশ্নটির দিকে মন দেওয়া যাক। এগুলি ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ রায়, আর যাঁরা ব্যক্তির সম্বন্ধে নৈতিক ধিক্কার জানানোর জন্য আকুলভাবে জোর দেন, তাঁরা মাঝেমাঝে অচেতনভাবে পুরো গোষ্ঠী বা সমাজের পক্ষে অছিলার জোগান দেন। ফরাসি বিপ্লবকে নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধেব বিপর্যয় ও রক্তপাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফরাসি ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র্ তার কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন, 'সেনাপতির একনায়কত্ব যাঁর মেজাজ... শান্তি ও সংযমের সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারে নি'।[৩০] যে সমাজ হিটলার-কে জন্ম দিয়েছিল তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেব নৈতিক রায়ের সন্তোষজনক বিকল্প হিসেবে আজ জার্মানরা হিটলার-এর ব্যক্তিগত বদমাইসির নিন্দাবাদকে স্বাগত জানায়। রুশ, ইংরেজ ও মার্কিনরা তাদের নিজেদের সামগ্রিক কুকর্মের বলির পাঁঠা হিসেবে স্টালিন, নেভিল চেম্বারলেন বা ম্যাকার্থির ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণে তৎক্ষণাৎ যোগ দেয়। ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক নৈতিক রায় তাঁদের সম্বন্ধে নৈতিক নিন্দাবাদের মতোই সমান বিভ্রান্তিকর ও দুরভিসন্ধিপ্রসূত হতে পারে। ব্যক্তি হিসেবে কিছু দাস-মালিকের মানসিকতা উঁচু পর্যায়ের ছিল। এই স্বীকৃতি দাসত্বকে অনৈতিক হিসেবে ধিক্কার না-জানানোর অজুহাত হিসেবে অবিরতই ব্যবহার করা হয়েছিল। মাক্‌স্ ভেবর 'প্রভুহীন দাসত্বে'র উল্লেখ করেন, 'যেখানে পুঁজিবাদ শ্রমিক বা খাতককে ফাঁদে ফেলে দেয়'। আর তিনি সঠিকভাবেই বলেন যে, ঐতিহাসিকের উচিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নৈতিক রায় ঘোষণা করা, যারা সেটিকে সৃষ্টি করেছিল সেই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নয়।[৩১] ব্যক্তি হিসেবে কোনো প্রাচ্য স্বৈরাচারীর বিচার করতে বসেন না ঐতিহাসিক। কিন্তু, যেমন ধরা যাক, প্রাচ্য স্বৈরাচার ও পেরিক্লিস-এর এথেন্স-এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান — এই দু-এর মধ্যে তাঁকে উদাসীন ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে না। একজন ব্যক্তি দাস-মালিক সম্বন্ধে তিনি কোনো রায় দেবেন না। কিন্তু দাস-মালিকানার সমাজের ওপর ধিক্কার জানাতে এটি তাঁকে বাধা দেয় না। ঐতিহাসিক তথ্য যে আগের থেকেই খানিকটা ব্যাখ্যানের অনুমান করে নেয় তা আমরা দেখেছি আর ঐতিহাসিক

৩০ 'মানুষ ও সভ্যতা' (পেপ্‌ল্ এ সিভিলিজাশিওঁ), খণ্ড ১৪: 'নেপোলিয়ন' (নাপোলেওঁ), পৃ ৫৮।

৩১ 'মাক্‌স্ ভেবর থেকে: সমাজতত্ত্ব বিষয়ে নিবন্ধাবলি' (ফ্রম মাক্‌স্ ভেবর: এসেজ ইন সোসিঅলজি), ১৯৪৭, পৃ ৫৮-য় উদ্ধৃত।

ব্যাখ্যানের মধ্যে সর্বদাই জড়িয়ে থাকে নৈতিক বিচার বা, যদি আপনি নিরপেক্ষ শোনায় এমন শব্দ পছন্দ করেন — মূল্যবিচার।

এটি কিন্তু আমাদের অসুবিধার সূচনা মাত্র। ইতিহাস একটি সংগ্রামের প্রক্রিয়া যেখানে কিছু গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে — প্রায়ই পরোক্ষভাবের চেয়ে প্রত্যক্ষভাবেই — অন্যান্যদের দাবিয়ে নানান ফল অর্জন করে, সেগুলোকে আমরা ভালো বা মন্দ যেভাবেই বিচার করি না কেন, পরাজিতরাই তার দাম মেটায়। নিগ্রহ ইতিহাসে স্বভাবসিদ্ধ। ইতিহাসের প্রত্যেক মহান পর্বে ক্ষতি ও বিজয় দুই-ই আছে। এটি একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন, কারণ আমাদের কাছে এমন কোনো পরিমাপ-ব্যবস্থা নেই যা দিয়ে আমরা কিছু লোকের বৃহত্তর মঙ্গলের সঙ্গে অন্যান্যদের ক্ষয়ক্ষতির তুল্যমূল্য ঠিক করতে পারি। তবুও এই ধরনের কোনো তুল্যমূল্য ঠিক না করে উপায় নেই। এটি একান্তভাবেই ইতিহাসের সমস্যা নয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা মাঝেমাঝে যত-না স্বীকার করি তার চেয়ে প্রায়ই অনেক বেশি ক্ষেত্রে তুলনায়-কম মন্দকে পছন্দ করার প্রয়োজনীয়তা, বা ভালো কিছু আসতে পারে তাই মন্দ কাজ করার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে মাঝেমাঝে 'প্রগতির দাম' বা 'বিপ্লবের মূল্য' — এইরকম জমকালো নাম দিয়ে আলোচনা করা হয়। এটি বিভ্রান্তিকর। 'নবীকরণ প্রসঙ্গে' (অন ইনোভেশন) প্রবন্ধে বেকন যেমন বলেছেন, 'কোনো প্রথার নির্বিকার সংরক্ষণ নবীকরণের মতোই অস্থির ব্যাপার'। নবীকরণের ফলে যাঁরা নানারকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের ওপর নবীকরণের মূল্য যেরকম প্রচণ্ডভাবে এসে পড়ে, সংরক্ষণের মূল্য বঞ্চিতদের ওপর ঠিক তেমনিভাবেই আসে। কিছু লোকের ভালোর জন্য অন্যদের ক্ষতি বৈধ — এই তত্ত্বটি প্রত্যেক সরকারের ক্ষেত্রেই স্বনিহিত, আর এটি যতটা রক্ষণশীল ঠিক ততখানিই র‍্যাডিকাল মতবাদ। প্রচলিত বিভিন্ন অসাম্য বজায় রাখার বৈধতা হিসেবে ড. জনসন খুব জোর দিয়ে তুলনায়-কম মন্দের যুক্তিটির দোহাই দিয়েছিলেন :

'একটি সাধারণ সাম্যের অবস্থায় কেউই যে সুখী হবে না তার চেয়ে কিছু লোকের অসুখী থাকা ভালো।'[৩২]

৩২ বসওয়েল, 'ডক্টর জনসন-এর জীবনী' (লাইফ অফ ডক্টর জনসন), এভরিম্যান সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃ ২০। এটির মধ্যে আছে স্বচ্ছতার গুণ। 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে বিচার', পৃ ৮৫-তে প্রগতির সেই বলিদের 'কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হাহাকার' নিয়ে বুর্কহার্ট চোখের জল ফেলেছেন, 'যাঁরা সাধারণভাবে তাঁদের অর্জিত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই চান নি'। কিন্তু তিনি নিজে 'আঁসেঁ রেজ্রিম' (ফরাসি বিপ্লবের আগের শাসনকাল)-এর বলিদের হাহাকার সম্পর্কে চুপ করে থাকেন, যাঁদেরও সাধারণত ধরে রাখার মতো কিছুই ছিল না।

কিন্তু এই বিষয়টি তার সবচেয়ে নাটকীয় চেহারায় দেখা দেয় বিভিন্ন মৌলিক পরিবর্তনের পর্যায়ে ; আর, এখানেই তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মনোভাবকে আমরা সবচেয়ে সহজে সন্ধান করতে পারি।

মোটামুটি ১৭৮০ ও ১৮৭০-এর মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন-এর শিল্পায়নের কাহিনীটি ধরা যাক। বস্তুত প্রত্যেক ঐতিহাসিকই, সম্ভবত কোনো আলোচনা না করেই, শিল্পবিপ্লবকে একটি মহান ও প্রগতিশীল কৃতিত্ব রূপে বিবেচনা করবেন। চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করা; শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর কারখানা ও শৌচব্যবস্থাহীন বাসায় জড়ো করা এবং শিশু শ্রমিকদের শোষণ — ঐতিহাসিক এসবই বর্ণনা করবেন। তিনি সম্ভবত বলবেন যে, ব্যবস্থাটির পরিচালনায় দুর্ব্যবহারের ঘটনা ঘটেছিল ও কিছু নিয়োগকর্তা অন্যদের চেয়ে বেশি নির্মম ছিলেন, এবং একবার যখন ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন এক মানবিকতাসম্পন্ন বিবেকের ক্রমবৃদ্ধি নিয়ে তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু, আবার সম্ভবত কিছু না-বলেই তিনি ধরে নেবেন যে, যা-ই হোক না কেন, প্রাথমিক পর্যায়ে বলপ্রয়োগ ও শোষণ শিল্পায়নের অপরিহার্য অংশ, বা আমি কখনও এমন ঐতিহাসিকের কথা শুনি নি যিনি বলেছেন যে, এই দামের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতির হাতকে রুখে দেওয়া বা শিল্পায়ন না-করাই ছিল ভালো। যদি এই ধরনের কেউ থাকেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে চেস্টারটন ও বেলক সম্প্রদায়ের লোক। আর সিরিয়স ঐতিহাসিকরা ন্যায্য কারণেই তাঁকে সিরিয়াসভাবে বিবেচনা করবেন না। এই উদাহরণটি আমার কাছে বিশেষভাবে আগ্রহজনক, কারণ আমার সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাসে শিল্পায়নের দামের অংশ হিসেবে চাষীদের যৌথকৃষি ব্যবস্থায় আনার সমস্যাটির মুখোমুখি আমাকে অচিরেই হতে হবে বলে আশা করি। আর, আমি ভালোমতো জানি যে, ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি যদি যৌথকৃষির নৃশংসতা ও দুর্ব্যবহার নিয়ে পরিতাপ করি, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটিকে শিল্পায়নের বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় দামের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য করি, তাহলে আমার ওপর অনাস্থাবাদ ও মন্দ ব্যাপারকে মাফ করার অভিযোগ আসবে। উনিশ শতকে বিভিন্ন পশ্চিমী জাতি এশিয়া ও আফ্রিকাকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল — এই ঘটনাটিকে ঐতিহাসিকরা ক্ষমা করবেন পৃথিবীর অর্থনীতিতে তার তাৎক্ষণিক প্রভাবের কারেণ নয়, বরঞ্চ এইসব মহাদেশের পেছিয়ে-পড়া মানুষদের ওপর তার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের জন্যও। যা-ই হোক না কেন, আধুনিক ভারতকে বলা হয় ব্রিটিশ শাসনের সন্তান। আর আধুনিক চীন হলো উনিশ-শতকী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রুশ বিপ্লবের প্রভাবের

দো-আঁশলা ফসল। দুর্ভাগ্যক্রমে যেসব চীনা শ্রমিক খেটেছিল চুক্তি-বন্দরের পশ্চিমী মালিকানাধীন কারখানায় বা দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে, অথবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পশ্চিম রণাঙ্গনে, চীন বিপ্লবের ফলে যা কিছু গৌরব বা উপকার হয়েছে তা উপভোগ করার জন্য তাঁরা বাঁচেন নি। যাঁরা দাম চুকিয়ে দেন ও যাঁরা ফসল ঘরে তোলেন — তাঁরা কদাচিৎ একই মানুষ হন। এঙ্গেলস-এর সুপরিচিত অলঙ্কারবহুল অনুচ্ছেদটি অস্বস্তিকরভাবে যথাযথ :

'সব দেবীর মধ্যে ইতিহাসই প্রায় সবচেয়ে নিষ্ঠুর। শুধু যুদ্ধে নয়, বরঞ্চ 'শান্তিপূর্ণ' আর্থনীতিক বিকাশের সময়েও তিনি তাঁর বিজয়রথ চালান মৃতদেহের স্তূপের ওপর দিয়ে। আর আমরা নরনারীরা দুর্ভাগ্যক্রমে এতই নির্বোধ যে আমরা কখনোই প্রকৃত প্রগতির জন্য সাহস সঞ্চয় করতে পারি না, যতক্ষণ-না আমরা বিভিন্ন নিগ্রহের মাধ্যমে তার জন্য উপরুদ্ধ হই, আর এইসব নিগ্রহ প্রায়ই পরিমাপের অতীত বলে মনে হয়।'[৩৩]

ইভান কারমাজোভ-এর উপেক্ষার বিখ্যাত ভঙ্গিটি এক বীরত্বপূর্ণ ভ্রান্তি। আমাদের জন্ম সমাজে, আমাদের জন্ম ইতিহাসে। এমন কোনো মুহূর্ত আসে না যখন আমাদের একটি প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয় যার সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত যে-কোনো একটিকে গ্রহণ বা বর্জনের বিকল্প থাকে। নিগ্রহের সমস্যার ক্ষেত্রে ধর্মবেত্তার চেয়ে বেশি চূড়ান্ত কোনো উত্তর ঐতিহাসিকের কাছে নেই। তিনিও আশ্রয় নেন তুলনায় কম মন্দ ও বৃহত্তর ভালোর তত্ত্বে

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মতো না হলেও, ঐতিহাসিক তাঁর উপাদানের প্রকৃতির দরুন এইসব নৈতিক রায় সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, আর এই ব্যাপারটি কি ইতিহাসের পক্ষে একটি অতি-ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কাছে আনুগত্য সূচনা করে না? আমি মনে করি না তেমন হয়। ধরা যাক, 'ভালো' ও 'মন্দ' জাতীয় নানান বিমূর্ত ধারণা ও তাদের আরও পরিশীলিত বিকাশ ইতিহাসের আওতার বাইরে থাকে। কিন্তু তা হলেও, ঐতিহাসিক নৈতিকতার চর্চায় এইসব বিমূর্ততা ভৌতবিজ্ঞানে অঙ্ক ও যুক্তিবদ্ধ সূত্রের মতোই একই ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলি চিন্তার অপরিহার্য পর্যায়; কিন্তু এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু না দেওয়া পর্যন্ত এরা অর্থহীন ও প্রয়োগহীন। আপনি যদি অন্য কোনো রূপক পছন্দ করেন, তাহলে বলব :

৩৩ 'কার্ল মার্কস ও ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলস : 'চিঠিপত্র ১৮৪৬-১৮৯৫', ১৯৩৪, পৃ ৫১০-এ ড্যানিয়েলসন-কে লেখা ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩-এর চিঠি।

ইতিহাসে বা দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব নৈতিক বিধান প্রয়োগ করি সেগুলো ব্যাঙ্কের চেক-এর মতো; তাদের একটি ছাপা ও একটি লিখিত অংশ আছে ছাপা অংশে আছে স্বাধীনতা ও সাম্য, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র — এই ধরনের সব বিমূর্ত শব্দ। এগুলি বিভিন্ন অত্যাবশ্যক পর্যায়। কিন্তু যতক্ষণ-না আমরা অন্য অংশটি ভর্তি করছি, ততক্ষণ চেকটি মূল্যহীন। আর এই অংশে জানানো হয়: আমরা কতখানি স্বাধীনতার প্রস্তাব করছি ও কাকে, আমাদের সমান বলে কাকে আমরা স্বীকৃতি দিই, কতটা অবধি। সময়ে-সময়ে আমরা যেভাবে এই চেকটিকে ভর্তি করি তা ইতিহাসের ব্যাপার। বিভিন্ন বিমূর্ত নৈতিক ধারণার মধ্যে আমরা যে-প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু এনে দিই সেটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। আমাদের নৈতিক বিচার নিঃসন্দেহে একটি ধারণামূলক কাঠামোর মধ্যে করা হয়। সেটি নিজেই আবার ইতিহাসের সৃষ্টি। নৈতিক বিষয়ে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিতর্কের মনমতো রূপটি হলো স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়ে প্রতিস্পর্ধী দাবি। এইসব ধারণা বিমূর্ত ও সর্বজনীন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে-বিষয়বস্তু দেওয়া হয় তা পাল্টেছে সমস্ত ইতিহাস জুড়ে, দেশে-দেশে কালে-কালে। তাদের প্রয়োগের যে-কোনো ব্যবহারিক প্রশ্ন বোঝা যায় ও সে নিয়ে তর্ক করা যায় একমাত্র ঐতিহাসিক নিরিখেই। একটু কম জনপ্রিয় উদাহরণ নিলে, 'আর্থনীতিক যৌক্তিকতা'র ধারণাটি ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে একটি বিষয়নিষ্ঠ ও তর্কাতীত মানদণ্ড হিসেবে, যে-মানদণ্ডে বিভিন্ন আর্থনীতিক নীতির বাঞ্ছনীয়তা পরীক্ষা ও বিচার করা যায়। সে-চেষ্টা তৎক্ষণাৎ ব্যর্থ হয়। সনাতন অর্থনীতির নানারকম সূত্রে দীক্ষিত তাত্ত্বিকরা পরিকল্পনাকে যুক্তিগ্রাহ্য আর্থনীতিক প্রক্রিয়ায় একটি অযৌক্তিক অনুপ্রবেশ হিসেবে নীতিগতভাবে ধিক্কার জানান। যেমন, পরিকল্পনাকাররা তাঁদের মূল্যনীতিতে জোগান ও চাহিদার সূত্রে বাঁধা পড়তে অস্বীকার করেন, এবং পরিকল্পনাধীন মূল্যের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি থাকতে পারে না। এটা অবশ্যই সত্যি হতে পারে যে পরিকল্পনাকাররা প্রায়ই অযৌক্তিক, ও সেই কারণে বোকার মতো, আচরণ করেন। কিন্তু যে-মাপকাঠিতে তাঁদের বিচার করতে হবে তা সনাতন অর্থনীতির পুরনো 'আর্থনীতিক যৌক্তিকতা' নয়। অনিয়ন্ত্রিত ও অসংগঠিত অবাধ অর্থনীতিই ছিল মূলত অযৌক্তিক, পরিকল্পনা হলো এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে 'আর্থনীতিক যৌক্তিকতা' নিয়ে আসার চেষ্টা — এই বিপরীত যুক্তিটির দিকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার সহানুভূতি বেশি। কিন্তু এখনকার মতো আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, এমন কোনো বিমূর্ত ও অতি-ঐতিহাসিক মান দাঁড় করানো সম্ভব নয় যার মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ক্রিয়ার বিচার করা যায়। এই ধরনের একটি

ঘোচানোর উপায় এই নয় যে, ঐতিহাসিককে শেখাতে হবে প্রাথমিক বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞানীকে প্রাথমিক ইতিহাস। এটি একটি কানাগলি, ঘোলাটে চিন্তাই আমাদের এর মধ্যে নিয়ে এসেছে। সে যা-ই হোক, বিজ্ঞানীরা নিজেরা কিন্তু এইভাবে আচরণ করেন না। আমি কখনোই শুনি নি যে যন্ত্রবিদদের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রাথমিক শ্রেণীতে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

আমি প্রস্তাব করব যে এর একটা প্রতিকার হলো ইতিহাসের মান উন্নত করা, তাকে — যদি আমার সেরকম বলার স্পর্ধা হয় — আরও বৈজ্ঞানিক করে তোলা, এবং যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন তাঁদের কাছে আরও নিশ্ছিদ্র কাজের দাবি জানানো। যাঁদের কাছে ধ্রুপদী সাহিত্য বড্ড শক্ত ও বিজ্ঞান বড্ড সিরিয়স লাগে, তাঁদের জন্য বিদ্যাচর্চার একটি শাখা রূপে ইতিহাসকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো-কখনো একটা বস্তা হিসেবে দেখা হয়। এই বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে আমি যে ধারণা সঞ্চার করার আশা করি তা হলো : ইতিহাস ধ্রুপদী সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বিষয় ও বিজ্ঞানের মতোই সিরিয়স। কিন্তু এই দাওয়াই-এর মানে দাঁড়াবে : ঐতিহাসিকরা যা করছেন সে-ব্যাপারে তাঁদের মধ্যেই আরও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই। এ বিষয়ে এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় সার চার্লস স্নো বিজ্ঞানীর 'বেপরোয়া' আশাবাদের সঙ্গে, যাকে তিনি 'সাহিত্যসেবী বুদ্ধিজীবী' বলেন তার 'চাপা গলা' ও 'সমাজ-বিরোধী অনুভূতি'র প্রতিতুলনা করেন।[৩৪] তাঁর কথার মধ্যে সারবত্তা আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক — এবং যাঁরা ঐতিহাসিক না-হয়েও ইতিহাস সম্বন্ধে লেখেন তাঁরাই আরও বেশি করে — এই 'সাহিত্যসেবী বুদ্ধিজীবী'র পর্যায়ে পড়েন। ইতিহাস যে বিজ্ঞান নয় তা আমাদের জানাতে, এবং সেই সঙ্গে ইতিহাস কী পারে না ও ইতিহাসের পক্ষে কী হওয়া উচিত নয় বা করা উচিত নয় তার ব্যাখ্যা করতে তাঁরা এত ব্যস্ত যে ইতিহাসের কৃতিত্ব ও সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময়ই তাঁদের নেই।

বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকের মধ্যে লক্ষ্যের অভিন্নতা সম্বন্ধে আরও গভীর বোঝাপড়া গড়ে তোলা হলো এই ব্যবধান ঘোচানোর আর-এক উপায়। আর ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দর্শন নতুন ও ক্রমবর্ধমান আগ্রহের এটিই আসল মূল্য। বিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক — এঁরা সবাই একই চর্চার বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত : মানুষ ও তার পরিবেশ, পরিবেশের ওপর

৩৪ সি পি স্নো, 'দুই সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' (দ টু কালচারস্ অ্যান্ড দ সায়েন্টিফিক রেভলিউশন), ১৯৫৯, পৃ ৪-৮।

মানুষের, এবং মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব। চর্চার উদ্দেশ্যটি একইরকম : পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের বোঝাপড়া ও পরিবেশের ওপর তার প্রভুত্ব বাড়ানো। খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক, মনোবিদ ও ঐতিহাসিকের মধ্যে পূর্বানুমান ও পদ্ধতিতে ব্যাপক পার্থক্য আছে ; বা আমি এই অঙ্গীকার করতে চাই না যে আরও বৈজ্ঞানিক হওয়ার জন্য ঐতিহাসিককে ভৌতবিজ্ঞানের পদ্ধতি আরও নিবিড়ভাবে অনুসরণ করতেই হবে। ব্যাখ্যা করতে চাওয়ার যে মূল উদ্দেশ্য, এবং প্রশ্ন ও উত্তরের যে মূল কার্যপদ্ধতি — তাতে ঐতিহাসিক ও ভৌতবিজ্ঞানী দুজনেই একজোট। অন্য ·যে-কোনো বিজ্ঞানীর মতোই ঐতিহাসিকও একজন জীব যিনি সারক্ষণই 'কেন ?' এই প্রশ্নটি করে চলেন। কী কী উপায়ে তিনি এই প্রশ্নটি রাখেন ও কী কী উপায়ে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন তা আমি আমার পরের বক্তৃতায় বিচার করব।

ইতিহাসের কার্যকারণ

কড়ায় দুধ জাল দিলে উথলে ওঠে। কেন এমন হয় আমি জানি না, কখনও জানতে চাইও নি। চাপাচাপি করলে আমি হয়তো বলব, দুধের মধ্যে উথলে ওঠার একটা ঝোঁক আছে। কথাটা ঠিকই, কিন্তু এতে কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু আমি তো আর প্রকৃতিবিজ্ঞানী নই। তেমনি অতীতের ঘটনাবলি কেন ঘটেছিল তা জানতে না-চেয়েই সে সম্বন্ধে পড়া, এমনকি লেখাও যায়, বা তুষ্ট থাকা যায় এই বলে যে হিটলার চেয়েছিলেন বলেই ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কথাটা ঠিকই, কিন্তু এতে কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। তাহলে নিজেকে ইতিহাসের ছাত্র বা ঐতিহাসিক বলাটা কিন্তু হবে প্রথা-বিরুদ্ধ। ইতিহাস-চর্চা হলো কারণ-এর চর্চা। ঐতিহাসিক, আগের বক্তৃতার শেষে যেমন বলেছি, অবিরত প্রশ্ন তোলেন কেন ?' ; আর যতক্ষণ উত্তরের আশা আছে, ততক্ষণ তিনি থামতে পারেন না। মহান ঐতিহাসিক — বা হয়তো আরও ব্যাপক অর্থে বলতে পারি, মহৎ চিন্তাবিদ — তিনিই, যিনি নতুন বিষয় সম্পর্কে বা নতুন প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন 'কেন ?'

ইতিহাসের জনক হেরোদোতাস তাঁর রচনার গোড়াতেই নিজের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন : গ্রীক ও বর্বরদের কাজকর্মের স্মৃতি সংরক্ষণ, 'এবং বিশেষত, আর সব কিছু ছাড়াও, তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের কারণ দেখানো'। প্রাচীন জগতে তিনি পেয়েছিলেন খুবই অল্প শিষ্য। এমনকি থুকিদিদেস-এর সম্পর্কেও অভিযোগ এই যে, কার্যকারণ বিষয়ে তাঁর কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না।[১] কিন্তু আঠেরো শতকে যখন আধুনিক ইতিহাস রচনার ভিত তৈরি হচ্ছিল, তখন মঁতেস্কিয়ো তাঁর 'রোমানদের মহত্ত্ব তথা তাদের উত্থান-পতনের কারণ বিষয়ক বিবেচনা' গ্রন্থে দুটি নীতি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তা হলো : 'প্রত্যেক রাজতন্ত্রের পেছনেই কিছু সাধারণ নৈতিক বা ভৌত কারণ ক্রিয়াশীল, সেগুলিই তার উত্থান ঘটায়, রক্ষা করে, বা উৎখাত করে', এবং 'যা কিছু ঘটে তার সবই ঐ কারণগুলির অধীন'। কয়েক বছর পরে 'আইনের মর্ম' (দ্য লেস্প্রি দে লোয়া) গ্রন্থে তিনি এই

১ এফ এম কর্নফোর্ড, 'থুকিদিদেস মিথিস্তোরিকুস', প্রায়শ।

ধারণাটিই আরও প্রসারিত ও সাধারণীকৃত করেন। 'পৃথিবীতে কাজের যা যা ফল আমরা দেখি তার সবই অন্ধ নিয়তির তৈরি' -- এমন ভাবাটা উদ্ভট। মানুষ 'শুধুই তার জল্পনা দিয়ে চালিত হয় নি' ; তাদের আচরণ মেনে চলেছে 'বস্তুর স্বভাব'-জাত কতক বিশেষ বিধি বা নীতি। [২]এরপর থেকে, প্রায় ২০০ বছর ধরে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির কারণ এবং যেসব নিয়ম সেগুলোকে পরিচালনা করে তার আবিষ্কার করে মানবজাতির অতীত অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করার চেষ্টায় ব্যস্ত রইলেন ঐতিহাসিক আর ইতিহাসের দার্শনিকরা। এইসব কারণ ও নিয়মকে কখনও ভাবা হতো যান্ত্রিক, কখনও বা জৈব নিরিখে, কখনও আধিদৈবিক, কখনও আর্থনীতিক, কখনও মনস্তাত্ত্বিক বলে। কিন্তু ইতিহাস মানে যে অতীতের ঘটনাবলিকে কার্যকারণের ক্রমপরম্পরা অনুযায়ী সাজানো — এই মতবাদই মেনে নেওয়া হয়েছিল। 'বিশ্বকোষ'-এ ইতিহাস-বিষয়ক নিবন্ধে ভলত্যার লিখেছিলেন, 'অক্ষু ও জরক্ষু নদীর তীরে একদল বর্বরের জায়গায় এসেছিল আর-এক দল, এ ছাড়া যদি আপনাদের আর কিছুই বলার না থাকে, আমাদের তাতে কী ?' গত ক'বছরে এই অবস্থার কিছু হেরফের হয়েছে। আগের বক্তৃতাতেই আমি আলোচনা করেছি, কেন আমরা এখন আর ঐতিহাসিক 'নিয়ম'-এর কথা বলি না ; এমনকি 'কারণ' শব্দটাও আজকাল আর চলে না। এটা হয়েছে, খানিক পরিমাণে, বিশেষ কয়েকটি দার্শনিক দ্ব্যর্থতার ফলে — যার মধ্যে আমার যাওয়ার দরকার নেই — আর, খানিক পরিমাণে, এর সঙ্গে নির্ধারণবাদের যোগ আছে বলে ধরে নেওয়ার জন্য — সে-ব্যাপারে আমি এখনই আসছি। কতক লোক ইতিহাসের 'কারণ'-এর কথা বলেন না, বলেন 'ব্যাখ্যা' বা 'ভাষ্য' বা 'পরিস্থিতির যুক্তি' বা 'ঘটনাবলির আভ্যন্তরীণ যুক্তি' (এটি বলেছেন ডাইসি)-র কথা, বা কারণের সূত্রে দেখা (কেন হয়েছিল)-র বদলে, তাঁরা দেখতে চান ধরনের সূত্রে (কী করে হয়েছিল) ; যদিও এর সঙ্গে নির্ঘাত জড়িয়ে যাবে কেমন করে এটি ঘটল — সেই প্রশ্নও, এবং এইভাবেই আমরা ফিরে যাব 'কেন ?'-র প্রশ্নে। অন্যেরা আবার বিভিন্ন ধরনের কারণের — যান্ত্রিক, জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদির — মধ্যে তফাত করেন, এবং ঐতিহাসিক কারণকে গণ্য করেন একটি নিজস্ব পর্যায় বলে। এই জাতীয় বিভাজন একটা মাত্রা পর্যন্ত যথার্থ। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কারণকে যা বিভক্ত করেছে তার চেয়ে বরং বিভিন্ন কারণের ক্ষেত্রে যা সাধারণ —

২ 'আইনের আত্মা' (লেস্‌প্রি দে লোয়া), ভূমিকা ও অধ্যায় ১।

তার ওপর জোর দিলে এ-ক্ষেত্রে আরও কাজ দেবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য 'কারণ' শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেই তুষ্ট থাকব। আর এইসব বিশেষ সূক্ষ্মতা নিয়ে মাথা ঘামাব না।

ঘটনার পেছনের কারণ-নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিলে কর্মক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কী করেন — সেই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক। কারণ-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে ঐতিহাসিকের এগোনোর প্রথম লক্ষণই হলো এই যে, তিনি সাধারণত একই ঘটনার একাধিক কারণ নির্দেশ করবেন। অর্থনীতিবিদ মার্শাল একবার লিখেছিলেন, 'কোনো কারণের ফলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানা কারণের ফলও মিলেমিশে থাকে ... কোনো একটি কারণের ফল বিবেচনা করার বিষয়ে লোকেদের তাই সর্ব উপায়ে সচেতন করে দেওয়া উচিত যে তাঁরা যেন সেইসব কারণকেও হিসেবে ধরেন'।[৩] 'রুশ বিপ্লব ১৯১৭ সালে হয়েছিল কেন ?' — এই প্রশ্নের উত্তরে যে পরীক্ষার্থী একটাই মাত্র কারণ দেখাবেন, তিনি তৃতীয় বিভাগে পাশ করলে সেটাই তাঁর বরাত-জোর। বলশেভিক বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা করতে বললে তিনি বলতে পারেন রাশিয়ার উপর্যুপরি সামরিক পরাজয়, যুদ্ধের চাপে রুশ অর্থনীতিতে ধ্বস, বলশেভিকদের সফল প্রচার, কৃষি-সমস্যা সমাধানে জারতন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতা, পেত্রোগ্রাদ-এর কল-কারখানায় হতদরিদ্র ও শোষিত সর্বহারাদের কেন্দ্রীভবন, কী চান লেনিন সেটা জানতেন, কিন্তু বিপক্ষের কেউই জানতেন না — এককথায় আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত, ব্যক্তিগত এবং দীর্ঘমেয়াদি তথা স্বল্পমেয়াদি অনেকগুলি কারণের এক এলোমেলো পাঁচমিশেল।

কিন্তু এতে করেই আমরা এসে যাচ্ছি ঐতিহাসিকের এগোনোর দ্বিতীয় লক্ষণে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে যে-পরীক্ষার্থী একের পর এক কারণ সাজিয়ে দিয়ে, সেই অবস্থাতেই খুশি হয়ে ছেড়ে দেবেন, তিনি পেতে পারেন বড়জোর দ্বিতীয় বিভাগ, বোধহয় প্রথম নয়। 'খবর রাখে অনেক কিছুর, কিন্তু কল্পনাশক্তি নেই' — সম্ভবত এ-ই হবে পরীক্ষকের রায়। নিজেরই তৈরি এই কারণ-তালিকার মুখোমুখি হয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক মনে করবেন যে তাঁর আরও কিছু বৃত্তিগত বাধ্যবাধকতা আছে। তা হলো কারণগুলিকে

৩ 'আলফ্রেড মার্শাল-এর স্মৃতি' (মেমোরিয়ালস অফ আলফ্রেড মার্শাল), এ সি পিগু সম্পা, ১৯২৫, পৃ ৪২৮।

কিছুটা ক্রমপরম্পরায় সাজিয়ে দেওয়া, যাতে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক স্থির হয়। কোন্ কারণ বা কারণ-পর্যায়কে 'শেষ বিচারে' বা 'চূড়ান্ত বিশ্লেষণে' (ঐতিহাসিকদের প্রিয় শব্দবন্ধ) চূড়ান্ত কারণ বা সব কারণের কারণ বলে গণ্য করা হবে তা স্থির করার জন্যই সম্ভবত এটা করতে হয়। তাঁর বিষয়টিকে তিনি এইভাবেই ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিককে চেনা যায় তাঁর আহূত কারণগুলি দিয়ে। রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের কারণ, গিবন বলেছিলেন. বর্বরতা ও ধর্মের জয়। উনিশ শতকের ইংরেজ হুইগ ঐতিহাসিকরা ব্রিটিশ শক্তি ও সমৃদ্ধির কারণ দেখিয়েছিলেন এমন সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ যা সাংবিধানিক স্বাধীনতার নীতিগুলিকে ধারণ করে। গিবন তথা উনিশ-শতকী ইংরেজ ঐতিহাসিকদের আজকাল পুরনো লাগে, কারণ তাঁরা উপেক্ষা করেছেন সেইসব আর্থনীতিক কারণ যা আধুনিক ঐতিহাসিকরা নিয়ে এসেছেন সামনে। কোন্ কোন্ কারণকে প্রাধান্য দেওয়া হবে সেই প্রশ্নের চারদিকেই ঘুরে চলেছে প্রতিটি ঐতিহাসিক যুক্তি।

আগের বক্তৃতায় আঁরি পোঁয়াকারে-র যে রচনাটির উল্লেখ করেছি সেখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বিজ্ঞান একই সঙ্গে 'বৈচিত্র্য ও জটিলতা' তথা 'একত্ব ও সরলতা'র দিকে এগিয়ে চলেছে।[৪] ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একথা কিছু কম সত্যি নয়। ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণাকে আরও বিস্তৃত ও গভীরতর করেন, আর এভাবেই, 'কেন?' এই প্রশ্নের জবাবে ক্রমাগতই আরও বেশি উত্তরের সমাবেশ ঘটান। সাম্প্রতিককালে, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনের ইতিহাসের সংখ্যা বেড়ে গেছে, তাই আমাদের উত্তরের সংখ্যা তথা পরিধিও প্রচুর বেড়েছে; রাজনৈতিক ইতিহাসের জটিলতার বিষয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টি এবং মনোবিদ্যা ও সংখ্যাতত্ত্বের নতুন প্রকৌশলের কথা বলাই বাহুল্য। বারট্রান্ড রাসেল লক্ষ্য করেছেন যে, 'প্রাথমিক অবস্থায় পরিলক্ষিত স্থূল সমরূপতার অবস্থা থেকে, বিজ্ঞানের প্রতিটি অগ্রগতিই আমাদের নিয়ে যায় দূরে। পূর্ব-ঘটনা তথা উত্তর-ঘটনার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে, এবং এর ফলে পূর্ব-ঘটনার এক ক্রমবর্ধমান বৃত্ত স্বীকৃতি পায় প্রাসঙ্গিক বলে'।[৫] এখানে তিনি ইতিহাসের অবস্থারই এক

৪ এইচ পোয়াঁকারে, 'বিজ্ঞান ও প্রকল্প' (লা সিয়াঁস এ লিপোতেজ), ১৯০২ পৃ ২০২-৩।

৫ বি রাসেল, 'অতীন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবিদ্যা' (মিস্টিসিজম অ্যান্ড লজিক), ১৯১৮, পৃ ১৮৮।

নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। **কিন্তু ইতিহাসকে বুঝতে চাওয়ার এই প্রয়াসে, বৈজ্ঞানিকের মতো, ঐতিহাসিকও একই সঙ্গে বাধ্য হন অজস্র উত্তরকে সরল** করে দিতে, একটি উত্তরকে অপরটির তলায় রাখতে, এবং ঘটনাবলি ও নির্দিষ্ট কারণসমূহের বিশৃঙ্খলার মধ্যে খানিকটা বিন্যাস ও সমতা নিয়ে আসতে। 'এক ঈশ্বর, এক নিয়ম, এক উপাদান এবং একই দূরস্থিত দৈব ঘটনা' ; বা হেনরি অ্যাডাম-এর খোঁজা 'কোনো মহান সাধারণীকরণ যা শিক্ষার প্রবল দাবিকে নস্যাৎ করে দেবে' [৬] — এসব পড়লে এখন নিশ্চয়ই পুরোনো কেতার ঠাট্টা বলেই মনে হয়। তবুও, একথাও তো সত্যি যে ঐতিহাসিককে একই সঙ্গে কারণের একত্ব তথা বহুত্বের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসও এই দ্বৈত তথা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই এগোয়।

এইবার. খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমি আলোচনা করব আমাদের ভোলানোর জন্য পেতে-রাখা দুটি মোহন ফাঁদের সম্বন্ধে — একটির নাম 'ইতিহাসে নির্ধারণবাদ ; বা হেগেল-এর বদমাইসি', এবং অপরটি 'ইতিহাসে আপতন বা ক্লিওপাট্রার নাক'। প্রথমেই আমি দু-এক কথায় বলব কী করে মতবাদ দুটি এল। বিজ্ঞানের নবরূপ বিষয়ে কার্ল পপার ১৯৩০-এর দশকে ভিয়েনায় একটি ভারী বই লিখেছিলেন (সম্প্রতি বইটির ইংরিজি তর্জমা বেরিয়েছে : 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের যুক্তি' (দ লজিক অফ সায়েন্টিফিক এনকোয়ারি) নামে)। যুদ্ধের সময় তিনি ইংরিজিতে 'অবাধ সমাজ ও তার শত্রুরা' (দ ওপেন সোসাইটি অ্যান্ড ইট্স্ এনিমিজ) ও 'ইতিহাসবাদের দৈন্য', (দ পভার্টি অফ হিস্টোরিসিজম) নামে দুটি আরও জনবোধ্য ধরনের বই লেখেন।[৭] হেগেল-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার একটি তীব্র আবেগজনিত প্রভাবে এগুলি লেখা হয়। প্লেটোর সঙ্গে হেগেল-কেও নাৎসিবাদের আত্মিক পূর্বসূরি বলে গণ্য করা হতো। আর ১৯৩০-এর দশকের ব্রিটিশ বামপন্থীদের মননগত বাতাবরণ ছিল এক অগভীর মার্কসবাদ — বইদুটি ছিল তারও বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া। হেগেল ও মার্কস-এর ইতিহাসের দর্শন নাকি ছিল নির্ধারণবাদী। এঁরা দুজনই ছিলেন আক্রমণের মূল লক্ষ্য। 'ইতিহাসবাদ' এই নাম দিয়ে এঁদের দুজনকে সমপর্যায়ভুক্ত করা

৬ 'হেনরি অ্যাডাম্স্-এর শিক্ষা' (দ এডুকেশন অফ হেনরি অ্যাডাম্স্), বস্টন, ১৯২৮, পৃ ২২৪।

৭ 'ইতিহাসবাদের দৈন্য' (দ পভার্টি অফ হিস্টোরিসিজম) বই হয়ে প্রথম বেরোয় ১৯৫৭-য়, কিন্তু এর অন্তর্ভূত নিবন্ধগুলি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪৪ ও ১৯৪৫-এ।

হয়।[৮] ১৯৫৪-য় সার আইজায়া বার্লিন 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' বিষয়ে তাঁর রচনাবলি প্রকাশ করেন। তিনি অবশ্য প্লেটোর ওপর আক্রমণ ত্যাগ করেন, হয়তো অক্স্ফোর্ড প্রতিষ্ঠানের এই প্রাচীন স্তম্ভটির জন্য অবশিষ্ট কিছু শ্রদ্ধার জন্যই।[৯] আর পপার-এর তালিকায় পাওয়া যায় না এমন একটি যুক্তি অবশ্য তিনি যোগ করেছেন। তা হলো, হেগেল ও মার্কস-এর 'ঐতিহাসিকতা' আপত্তিকর, কারণ তা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার পরিপন্থী, এবং ইতিহাসের শার্লমান, নেপোলিয়ন ও স্টালিন-দের নৈতিকভাবে নিন্দা করার যে-দায়িত্ব ঐতিহাসিকদের আছে বলে ধরা হয় (আমার আগের বক্তৃতায় সে-বিষয়ে বলেছি), তা এড়িয়ে যেতে তাঁদের উৎসাহিত করে এই

৮ 'ইতিহাসবাদ' বিষয়ে অধ্যাপক পপার-এর বহুপঠিত লেখাগুলির দরুন শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই আমি দু-একটি ক্ষেত্রে, যেখানে তেমন সূক্ষ্মতার কোনো প্রয়োজন নেই, সেখানে ছাড়া শব্দটির ব্যবহার করি নি। শব্দের সংজ্ঞার্থের ব্যাপারে সর্বক্ষণ জিদ ধরাটা নেহাতই পণ্ডিতিপনা। কিন্তু যা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, সেটা কী, তা অবশ্যই জানা দরকার। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমস্ত মত অধ্যাপক পপার-এর অপছন্দ, তার সবগুলোকেই একযোগে ধরার জন্য তিনি 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে কতকগুলোকে আমার যথেষ্ট মজবুত বলেই মনে হয়; আর বাকিগুলো সম্বন্ধে সন্দেহ হয় যে আজকালকার কোনো সিরিয়স লেখকই আর সে-মত পোষণ করেন না। তিনি স্বীকার করেছেন ('ইতিহাসবাদের দৈন্য', পৃ ৩) যে তিনি এমন সব 'ইতিহাসবাদী' যুক্তি আবিষ্কার করেছেন, যা কোনো জানা 'ইতিহাসবাদী'ই কখনও ব্যবহার করেন নি। কোনো কোনো মতবাদে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে দেওয়া হয়, কোথাও আবার এ-দুটিকে করা হয় সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক পপার-এর রচনায় এই দুই মতবাদই ইতিহাসবাদের আওতায় পড়ে। ভবিষ্যৎ-কথনের ব্যাপারটা হেগেল এড়িয়ে গিয়েছিলেন। 'অবাধ সমাজ' (দ ওপেন সোসাইটি)-এ তাঁকেই ইতিহাসবাদের মহাচার্যরূপে গণ্য করা হয়েছে; 'ইতিহাসবাদের দৈন্য'-র ভূমিকায় ইতিহাসবাদকে বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, এ হলো 'সমাজবিজ্ঞানগুলির এমন এক পরিমার্গ, যাতে ধরে নেওয়া হয় যে, ঐ তি হা সি ক ভ বি ষ্য ৎ ক থ ন-ই তাদের মুখ্য লক্ষ্য।' এ যাবৎ 'ইতিহাসবাদ' (হিস্টোরিসিজম) শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হতো জার্মান 'হিস্টোরিসমুস' শব্দের ইংরিজি প্রতিশব্দ হিসেবে। এখন অধ্যাপক পপার 'ইতিহাসবাদ' (হিস্টোরিসিজ্‌ম)-এর সঙ্গে 'ঐতিহাসিকতা' (হিস্টোরিজম)-র তফাৎ করলেন। এইভাবে, শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যে-বিভ্রান্তি ছিল, তাতে তিনি যোগ করলেন আরও খানিকটা বিভ্রান্তির উপাদান। এম সি ডার্সি, 'ইতিহাসবোধ: ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়' (দ সেন্স অফ হিস্ট্রি: সেক্যুলার অ্যান্ড সেক্রেড), ১৯৫৯, পৃ ১১-য় 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'ইতিহাসের দর্শনের অভিন্নার্থক' হিসেবে।

৯ প্রথম ফ্যাসিবাদী হিসেবে প্লেটোর ওপর আক্রমণ অবশ্য শুরু হয় এক বেতারভাষণমালায়। এটি দিয়েছিলেন অক্স্ফোর্ড-এরই লোক, আর এইচ ক্রসম্যান, 'আজকের দিনে প্লেটো' (প্লেটো টুডে), ১৯৩৭।

'ঐতিহাসিকতা'। অন্যথায় আর বিশেষ কিছু বদলায় নি। কিন্তু যথাযোগ্যভাবেই সার আইজায়া বার্লিন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুপঠিত লেখক। গত পাঁচ-ছ বছর ধরে এদেশে (ইংল্যান্ডে) অথবা আমেরিকায় যে-কেউই ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো নিবন্ধ বা এমনকি কোনো ইতিহাস বই-এর গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা লিখেছেন তিনিই হেগেল, মার্কস তথা নির্ধারণবাদকে একহাত নিয়েছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিহাসে আকস্মিকের ভূমিকা বুঝতে না-পারাটা কতটা উদ্ভট। সার আইজায়া-কে অবশ্য তাঁর শিষ্যদের কাজের জন্য দায়ী করাটা অনুচিত হবে। এমনকি বাজে বকার সময়েও, সুচারু ও আকর্ষণীয়ভাবে বকে তিনি আমাদের প্রশ্রয় আদায় করে নেন। তাঁর শিষ্যরা বাজে কথাগুলোই আবার বলেন, কিন্তু তা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন না। যাই হোক, এ সব কথায় নতুন কিছুই নেই। আমাদের ইতিহাসের রিজিয়স অধ্যাপকদের মধ্যে চার্লস কিংস্‌লি খুব একটা বিখ্যাত নন। তিনি বোধহয় হেগেল পড়েন নি, বা মার্কস-এর নামও শোনেন নি। ১৮৬০-এর উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ইতিহাসে কোনো 'অবশ্যম্ভাবী পরম্পরা' থাকতে পারে না, মানুষের 'স্বীয় সত্তার নিয়ম ভঙ্গ করার রহস্যময় ক্ষমতাই তার প্রমাণ'।[১০] সৌভাগ্যবশত, কিংস্‌লি-কে আমরা ভুলে গেছি। এখন অধ্যাপক পপার ও সার আইজায়া বার্লিন — এই দুজনের প্রয়াসে ঐ বিষয়টির মৃতদেহে কিঞ্চিৎ প্রাণসঞ্চার হয়েছে। এই গোলমেলে অবস্থা পরিষ্কার করতে কিছুটা ধৈর্য লাগবে।

প্রথমেই নির্ধারণবাদের কথা ধরা যাক। আমার মতে — আশা করি এ নিয়ে কোনো বিরোধ হবে না — এর সংজ্ঞার্থ : এমন কোনো বিশ্বাস যে, যা কিছু ঘটছে তার সবেরই এক বা একাধিক কারণ আছে, এবং সেই কারণ বা কারণগুলি যদি অন্যরকম না হতো তাহলে এর চেয়ে আলাদা কিছুই হতে পারত না।[১১] নির্ধারণবাদ শুধু ইতিহাসের সমস্যা নয়, সমস্ত মানব-আচরণেরই সমস্যা। আগের বক্তৃতায় আমরা যে সমাজ-বহির্ভূত মানুষদের কথা আলোচনা করেছি, তাঁদের মতোই, যেসব মানুষের

১০ সি কিংস্‌লি, 'ইতিহাসে প্রযুক্ত যথার্থ বিজ্ঞানের সীমা' (দ লিমিটস্ অফ একজ্যাক্ট সায়েন্স অ্যাজ অ্যাপ্লায়েড টু হিস্ট্রি), ১৮৬০, পৃ ২২।

১১ 'নির্ধারণবাদ ... মানে ... তথ্যগুলো একই থাকলে, যা ঘটবেই, কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। অন্যরকম ঘটতে পারে বলে মনে করার অর্থ শুধু এই যে তথ্যগুলো আলাদা হলে তবেই অন্যরকম কিছু হতো।' 'আর্নস্ট কাসিরের-কে উপহৃত নিবন্ধাবলি' (এসেজ প্রেজেন্টেড টু আর্নস্ট কাসিরের, ১৯৩৬) গ্রন্থে এস ডবলিউ আলেকজান্ডার-এর প্রবন্ধ, পৃ ১৮।

কার্যকলাপের কোনো কারণ নেই, এবং সেহেতু অনির্ধারিত, তাঁরাও হলেন এক বিমূর্তন। 'মানুষের ক্ষেত্রে সবকিছুই সম্ভব' [১২]অধ্যাপক পপার-এর এই দাবি হয় অর্থহীন নয় ভ্রান্ত। সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে কেউই একথা বিশ্বাস করে না বা করতে পারে না। সব কিছুরই একটা কারণ আছে — এই স্বতঃসিদ্ধটি হলো আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা অনুধাবন করার একটা শর্ত। [১৩] কাফ্‌কা-র উপন্যাসের দুঃস্বপ্নের প্রতিবেশের কারণ হলো সেখানে এমন কিছুই ঘটে না যার কোনো দৃশ্যমান কারণ আছে, বা যার কোনো কারণ নির্ণয় করা যায়। এর ফলে মানব-ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। ব্যক্তিত্বের ভিত্তিই হলো এই ধারণা যে, কোনো ঘটনাই অকারণ নয়, এবং যথেষ্ট সংখ্যক কারণকেই নির্ধারণ করা যায়, আর তা দিয়ে মানুষের মনে গড়ে তোলা যায় অতীত-ভবিষ্যতের একটা ধাঁচ। মানুষের আচরণ নির্ধারিত হয়েছে এমন সব কারণ দিয়ে যা মূলত নির্ণয়যোগ্য — একথা ধরে না-নিলে দৈনন্দিন জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে যাবে। একসময়ে কিছু লোকে মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক সংঘটনের কারণ অনুসন্ধান করাটা ধর্মদ্রোহীর কাজ, কারণ এগুলি দৈব ইচ্ছার অধীন। মানুষ যে-কাজ করছে, সেটা সে করছে কেন — আমরা তা ব্যাখ্যা করতে চাই, আর সার আইজ়ায়া বার্লিন এতেই আপত্তি করেন। তাঁর যুক্তি : এইসব কাজ মানুষের ইচ্ছার অধীন। তাঁর ধারণা ঐ ধর্মদ্রোহিতার ধারণারই সামিল। এই জাতীয় আপত্তি থেকে মনে হয়, প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিরুদ্ধে যখন এইসব যুক্তি দেওয়া হতো তখন সেগুলি বিকাশের যে-স্তরে ছিল, আজকের সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাও সেই স্তরেই আছে।

দেখা যাক, দৈনন্দিন জীবনে কী করে আমরা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। রোজ কাজে বেরোবার সময়ে আপনার সঙ্গে স্মিথ-এর দেখা হয়। তার সঙ্গে বন্ধুর মতো, কিন্তু অসার কিছু কথা আপনি বলে থাকেন। যেমন আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা আপিসের সহকর্মীর সম্বন্ধে কিছু কথা। সে-ও আবহাওয়া বা কাজের জায়গা সম্বন্ধে

১২ কে আর পপার, 'অবাধ সমাজ' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯৭।

১৩ 'পৃথিবী আমাদের ওপর কার্যকারণ বিধি চাপিয়ে দেয় না', কিন্তু 'পৃথিবীর সঙ্গে অভিযোজনের ব্যাপারে এটিই সম্ভবত আমাদের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি' (জে রুয়েফ, 'পদার্থবিজ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞানে' (ফ্রম ফিজ়িকাল টু সোসাল সায়েন্সেস), বাল্‌টিমোর, ১৯২৯, পৃ ২৫। অধ্যাপক পপার নিজেই বলেছেন যে, কার্যকারণে বিশ্বাস হলো 'সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য একটি পদ্ধতিতে নিয়মের মূর্ত আধিবিদ্যক রূপ'। 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের যুক্তি' (দ লজিক অফ সায়েন্টিফিক এনকোয়ারি), পৃ ২৪৮।

সমানভাবেই বন্ধুর মতো কিন্তু অসার কিছু উত্তর দেয়। কিন্তু ধরা যাক কোনো এক সকালে স্মিথ, স্বভাবসিদ্ধভাবে আপনার কথার উত্তর না দিয়ে, আপনার চেহারা বা চরিত্র নিয়ে চীৎকার করে ভীষণ গালাগালি শুরু করল। কী করবেন আপনি ? কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে যাবেন ? ভাববেন যে এটা স্মিথ-এর ইচ্ছার স্বাধীনতার বিশ্বাসযোগ্য নমুনা, আর মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে সবকিছুই সম্ভব ? মনে হয় আপনি তা করবেন না। বরং আপনি বলবেন যে, 'বেচারা স্মিথ! জানেন নিশ্চয়ই ওর বাবা পাগলা-গারদে মারা গিয়েছিলেন', কিংবা 'বেচারা স্মিথ, বউ-এর সঙ্গে নিশ্চয়ই আবার খুব ঝামেলা হচ্ছে'। অন্যভাবে বলা যায়, স্মিথ-এর আপাতদৃষ্টিতে অকারণ আচরণের কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন আপনি, কেননা আপনার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা করতে গেলেই, আমার মনে হয়, আপনি সার আইজায়া বার্লিন-কে চটিয়ে ফেলবেন। তিনি বলবেন যে, হেগেল ও মার্কস-এর নির্ধারণবাদী ধারণা গিলেছেন বলেই আপনি স্মিথ-এর আচরণের কার্যকারণসম্মত ব্যাখ্যা দিতে চান এবং অস্বীকার করতে চান স্মিথ-কে ছোটোলোক বলে নিন্দে করার দায়িত্ব। কিন্তু সাধারণ জীবনে কারওই এরকম হয় না, বা কেউ ভাবেন না যে নির্ধারণবাদ বা নৈতিক দায়িত্ব কোনোটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। স্বাধীন ইচ্ছা তথা নির্ধারণবাদের মধ্যে যুক্তিগত এই উভয়সঙ্কট বাস্তব জীবনে ওঠে না। এমন নয় যে, মানুষের কিছু কিছু কাজ স্বাধীন আর অন্যগুলি নির্ধারিত। ঘটনা এই যে, মানুষের সব কাজই একই সঙ্গে স্বাধীন ও নির্ধারিত। ব্যাপারটা নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজটি দেখা হচ্ছে তার ওপর। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রশ্নটি আবার আলাদা। স্মিথ-এর কাজের এক বা একাধিক কারণ আছে ; শুধু বাহ্যিক কারণে বাধ্য হয়েই সে এ-কাজ করে নি, কিছুটা করেছে নিজের ব্যক্তিস্বরূপের বাধ্যবাধকতায়। তাই নৈতিকভাবে সে-ই দায়ী, কারণ সমাজ-জীবনের একটি শর্তই এই যে, স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাঁর নিজের ব্যক্তিস্বরূপের জন্য নৈতিকভাবে নিজেই দায়ী। এই বিশেষ ঘটনায় তাকেই দায়ী করা চলে কিনা সেটা ঠিক করবে আপনার বাস্তব বিচারবুদ্ধি। কিন্তু আপনি যদি তাকে দায়ী করেন তাহলেও তার মানে এই দাঁড়াবে না যে, আপনি মনে করেন তার কাজের কোনো কারণ নেই : কারণ ও নৈতিক দায়িত্ব হলো দুটো আলাদা পর্যায়। এই (কেমব্রিজ) বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি অপরাধবিদ্যার একটি গবেষণা-কেন্দ্র ও অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে যাঁরা রত, তাঁদের কারওই মনে হবে না যে, এর ফলে অপরাধীর নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করার দায়ও তাঁদের ওপর এসে পড়ল।

এবার ঐতিহাসিকের দিকে তাকানো যাক। সাধারণ মানুষের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন যে মানুষের প্রত্যেক কাজেরই কারণ আছে, এবং তত্ত্বগতভাবে সেগুলি নির্ণয়যোগ্য। এটা ধরে না-নিলে দৈনন্দিন জীবনের মতো ইতিহাসও হয়ে উঠবে অসম্ভব। ঐতিহাসিকের বিশেষ কাজই হলো এই সব কারণ অনুসন্ধান করা। হয়তো মনে হবে, এর ফলে মানুষের আচ-রণের নির্ধারিত দিকটি সম্বন্ধে তাঁর মনে এক বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হবে : কিন্তু তিনি তো স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপারটা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। স্বেচ্ছাকৃত কাজ মাত্রেরই কোনো কারণ নেই — এই অগ্রাহ্য প্রকল্পটি তিনি শুধু মানেন না। অবশ্যম্ভাবিতার প্রশ্নটি নিয়েও তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। অন্যান্য লোকের মতো ঐতিহাসিকরাও যখন আলঙ্কারিক ভাষার প্রভাবে পড়েন এবং বলেন যে কোনো ঘটনা 'অবশ্যম্ভাবী', তখন তাঁরা শুধু এটুকুই বোঝাতে চান যে বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ থেকে আশা করা যায় যে, এ-ঘটনার সম্ভাবনাই ছিল সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি আমি আমার নিজের লেখা ইতিহাস-বই ঘেঁটে দেখছিলুম এই আপত্তিকর শব্দটি পাওয়া যায় কিনা। এ-বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে আমি ঘোষণা করতে পারি না। এক জায়গায় আমি লিখেছিলুম যে, ১৯১৭-র বিপ্লবের পর বলশেভিক ও অর্থোডক্স্ ধর্মমণ্ডলীর মধ্যে সংঘাত ছিল 'অবশ্যম্ভাবী'। নিঃসন্দেহে 'হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল' লেখাটাই হতো আরও বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এই সংশোধনীটিকে যদি আমার খানিকটা পণ্ডিতি বলে মনে হয় তাহলে কি মাফ মিলবে না? কার্যত, কোনো ঘটনা ঘটার আগে ঐতিহাসিকরা সেটিকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেন না। কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের আর কী কী পথ খোলা ছিল তা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করা হয়, ধরে নেওয়া হয় আরও বিকল্প রাস্তা খোলাই ছিল, যদিও সঠিকভাবেই ব্যাখ্যা করা হয় কেন শেষ পর্যন্ত একটি রাস্তার বদলে অন্যটিকে বেছে নেওয়া হলো। শুধু পোশাকি অর্থে ছাড়া ইতিহাসে কোনো কিছুই অবশ্যম্ভাবী নয়। এখানে অবশ্যম্ভাবী মানে — কোনো ঘটনা অন্যভাবে ঘটতে গেলে তার পূর্বতন কারণগুলোকে আলাদা হতে হতো। ঐতিহাসিক হিসেবে আমি 'অবশ্যম্ভাবী', 'অনিবার্য', 'অবধারিত', 'অনস্বীকার্য' এইসব শব্দ বর্জন করতে পুরোপুরি তৈরি। জীবনের অনেকটা রঙই তাতে চলে যাবে। কিন্তু এই শব্দগুলো শুধু কবি আর অধিবিদ্যাবিশারদদের জন্যেই তোলা থাক।

অবশ্যম্ভাবিতার এই অভিযোগ এত বন্ধ্যা ও অর্থহীন মনে হয়, এবং সাম্প্রতিককালে এত তীব্রভাবে এ নিয়ে লড়াই চালানো হয়েছে যে, এর গোপন উদ্দেশ্যটা খুঁজে বার করা উচিত বলে মনে হয়। আমার সন্দেহ, এর মূল উদ্দেশ্য হলো, যাকে বলা যায় 'হলেও-হতে-পারত' ঘরানার চিন্তা —

বা, বলা যায়, আবেগ। এটি প্রায় পুরোপুরিই সাম্প্রতিক ইতিহাস-লগ্ন। এই কেমব্রিজ-এই গত শিক্ষাবর্ষে দেখেছিলুম, কোনো একটি সংস্থা একটি ভাষণের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তার শিরোনাম 'রুশ বিপ্লব কি অনিবার্য ছিল ?' আমি নিশ্চিত, এর উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই ভারিক্কি। কিন্তু আপনি যদি একটা বিজ্ঞাপন দেখেন যে 'গোলাপের যুদ্ধ কি অনিবার্য ছিল ?', তাহলে তক্ষুনি আপনার সন্দেহ হবে এটা ঠাট্টা। নর্মান বিজয় বা আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথা ঐতিহাসিকরা এমনভাবে লেখেন যেন যা ঘটেছে তা-ই ছিল অনিবার্য, আর ঐতিহাসিকের কাজই হলো শুধু কী হয়েছিল আর কেন হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়া। কেউই তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন না যে তিনি নির্ধারণবাদী এবং বিজয়ী উইলিয়াম বা মার্কিন বিদ্রোহীদের হেরে যাওয়ার কী কী বিকল্প সম্ভাবনা ছিল তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন নি। কিন্তু আমি যখন একই উপায়ে — ঐতিহাসিকের একমাত্র সঠিক উপায়ে — ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব সম্পর্কে লিখি, তখন দেখি, সমালোচকরা আমাকে আক্রমণ করছেন, কারণ, আমি নাকি যা ঘটেছিল তাকে অবশ্যম্ভাবী হিসেবে দেখিয়েছি, আর অন্য যা যা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেগুলো বিচার-বিবেচনা করি নি। বলা হয়, স্টোলিপিন কৃষি-সংস্কার শেষ করার সময় পেলে, বা রাশিয়া যুদ্ধে যোগ না-দিলে হয়তো বিপ্লব হতো না; কিংবা ধরা যাক, কেরেনস্কি সরকার যদি ঠিক-ঠাক কাজ করত বা বলশেভিকদের হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব না-গিয়ে মেনশেভিক বা সোশাল রেভলিউশনারিদের হাতে যেত। তাত্ত্বিকভাবে দেখলে এই সব অনুমানই করা চলে; বৈঠকখানায় বসে ইতিহাসে-কী-হতে-পারত-র খেলা যে কেউ যখন ইচ্ছে খেলতে পারেন। কিন্তু এসবের সঙ্গে নির্ধারণবাদের কোনো যোগই নেই; কারণ নির্ধারণবাদী শুধু এটুকুই বলবেন যে, এইসব ঘটনা অন্যভাবে ঘটবার কারণগুলোকেও হতে হতো আলাদা। ইতিহাসের সঙ্গেও এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। কথাটা হলো, আজকের দিনে কেউই আর সত্যিসত্যিই চান না যে, নর্মান বিজয় বা আমেরিকায় স্বাধীনতার পরিণতি উল্টে যাক, কিংবা কেউই আর এইসব ঘটনা ঘটার বিরুদ্ধে তীব্র আবেগময় আপত্তি তোলেন না; এবং ঐতিহাসিকরা যখন এই অধ্যায়গুলি সমাপ্ত বলে ধরে নেন, তখন আর আপত্তি করেন না কেউই। কিন্তু বহু লোক, যাঁরা সরাসরি বা কারও তরফে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, বা যাঁরা এর আরও দূরবর্তী পরিণামের আশঙ্কা করেন, তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চান। যখন তাঁরা ইতিহাস পড়েন, তখন এই প্রতিবাদের চেহারাটা হয় এইরকম: যা-যা হলে তাঁরা খুশি হতেন সে-বিষয়ে তাঁরা কল্পনার ফানুস ওড়ান, এবং সেই ঐতিহাসিকের ওপর রেগে যান, যিনি শুধু

শান্তভাবে ব্যাখ্যা করেন কী কী হয়েছিল, এবং তাদের মনমতো স্বপ্নের ইচ্ছেগুলো কেন ফলে নি। সাম্প্রতিক ইতিহাসের সমস্যাটা হলো অন্য, যা-যা হতে পারত সেই সময়টার কথা লোকে তখনও মনে রাখে; কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে এবং এ নিয়ে তর্ক করা নিরর্থক। লোকের পক্ষে ঐতিহাসিকের এই মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। এটা একেবারেই আবেগজাত ও অনৈতিহাসিক একটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তথাকথিত 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা'র নীতির বিরুদ্ধে এই মনোভাবেই জুগিয়েছে সবচেয়ে বেশি ইন্ধন। এই মোহন ফাঁদ থেকে এবারের ও চিরকালের মতো মুক্তি পাওয়া যাক।

আক্রমণের অন্য উৎস হলো 'ক্লিওপাট্রার নাক'-এর বিখ্যাত হেঁয়ালি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাস হলো মোটের ওপর আকস্মিকের এক-একটি অধ্যায়, এক ঘটনাপ্রবাহ যা নির্ধারিত হয়েছে শুধু আকস্মিক সমাপতন দিয়ে এবং ইতিহাস শুধু অত্যন্ত আকস্মিক কিছু কারণের ফল। ঐতিহাসিকরা সাধারণত যেসব কারণের কথা অনুমান করেন অ্যাক্টিয়ুম যুদ্ধের ফল তাই দিয়ে নির্ধারিত হয় নি, হয়েছিল ক্লিওপাট্রার প্রতি অ্যান্টনির রূপমোহ দিয়ে। বাতে পঙ্গু হয়ে বায়াজেত মধ্য ইওরোপে সৈন্য নিয়ে যেতে পারেন নি। গিবন মন্তব্য করেছেন, 'একটিমাত্র লোকের স্নায়ুতন্তুতে ধাতুদোষ গোটা জাতির দুর্ভাগ্য রোধ করতে বা স্থগিত রাখতে পারে' [১৪] ১৯২০-র শরতে গ্রীসের রাজা আলেকজান্ডার পোষা বাঁদরের কামড়ে মারা যান। এই দুর্ঘটনার ফলে যে ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয় সার উইনস্টন চার্চিল সে-সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'এই বাঁদরের কামড়ে মারা গেলেন আড়াই লক্ষ লোক' [১৫] কিংবা ট্রট্স্কির কথাই ধরা যাক। ১৯২৩-এর শরতে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও স্টালিন-এর সঙ্গে বিতর্ক চলাকালীন একটা সঙ্কটের সময়ে তিনি কিছুই করতে পারেন নি, কারণ হাঁস-শিকার করতে গিয়ে তিনি জ্বর বাধিয়ে বসেছিলেন। এ-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: 'বিপ্লব বা যুদ্ধ আগে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু শরৎকালে হাঁস মারতে যাওয়ার ফল কী হবে তা আগে দেখতে পাওয়া অসম্ভব' [১৬] প্রথমেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নিতে হবে যে

১৪ 'রোম সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন' (ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দ রোমান এম্পায়ার), অধ্যায় ৬৪।

১৫ ডব্লিউ চার্চিল, 'বিশ্ব সঙ্কটের পরিণাম' (দ ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস: দ আফটারম্যাথ), ১৯২৯, পৃ ৩৮৬।

১৬ এল ট্রট্স্কি, 'আমার জীবন' (মাই লাইফ), ইং অনু ১৯৩০, পৃ ৪২৫।

এই প্রশ্নের সঙ্গে নির্ধারণবাদের কোনো সম্পর্কই নেই। ক্লিওপাট্রা সম্পর্কে অ্যান্টনির মোহ, বায়াজেত-এর গেঁটে বাত, ট্রটস্কির ঠাণ্ডা লেগে জ্বরজ্বর ভাব — অন্যান্য যে-কোনো ঘটনার মতোই এগুলিও কার্যকারণসূত্রে নির্ধারিত। অ্যান্টনির মোহের কোনো কারণ ছিল না বললে ক্লিওপাট্রার রূপের প্রতি অযথা অসৌজন্য দেখানো হয়। দৈনন্দিন জীবনে কার্যকারণ সম্পর্কের যেসব নিয়মিত পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়, নারীর রূপের প্রতি পুরুষের মোহ তার অন্যতম। ইতিহাসের এইসব তথাকথিত আকস্মিক ঘটনাগুলিও এক কার্যকারণ শৃঙ্খলেরই প্রতিরূপ। ঐতিহাসিক মূলত যে-পরম্পরাটির অনুসন্ধানে রত এই পরম্পরাটি তাতে ব্যাঘাত ঘটায় — কিংবা বলা যায় তার সঙ্গে এর সংঘাত হয়। ব্যুরি সঠিকভাবেই 'দুটি পরস্পর-নিরপেক্ষ কার্যকারণ শৃঙ্খলের মধ্যে সংঘাত'-এর কথা বলেছেন।[১৭] বার্নার্ড বেরেনসন-এর "ইতিহাস বিষয়ে আকস্মিকতার মতবাদ" (অ্যাক্সিডেন্টাল ভিউ অফ হিস্ট্রি) নিবন্ধ থেকে সপ্রশংস উদ্‌ধৃতি দিয়ে সার আইজ্জায়া বার্লিন তাঁর 'ঐতিহিসিক অনিবার্যতা' রচনাটি শুরু করেন। আকস্মিকতা বলতে কেউ কেউ বোঝেন কোনো নির্ধারণযোগ্য কার্যকারণ সম্পর্কের অভাব। আমরা যে-অর্থে আকস্মিতার কথা বলেছি তার সঙ্গে এই দ্বিতীয় অর্থটিকে কেউ কেউ গুলিয়ে ফেলেন। সার আইজায়াও তেমনই একজন। কিন্তু এই বিভ্রান্তি ছাড়াও আমাদের হাতে একটা সত্যিকারের সমস্যা আছে। কী করে বার করা যায় ইতিহাসে কার্য ও কারণের একটি সুসংহত পরম্পরা ? আমাদের দৃষ্টিতে অবান্তর অন্য একটি কার্যকারণ-পরম্পরা যদি আমাদের পরম্পরাটিকে যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে দিতে বা অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারে, তাহলে ইতিহাসের কোনো অর্থ আমরা কেমন করে খুঁজে বার করব ?

সম্প্রতি যে সবাই মিলে ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকার কথা খুব জোর দিয়ে বলছেন, তার উৎস কী ? এখানে এক মুহূর্ত থেমে সেটা দেখে নেওয়া যাক। পলিবিউস হচ্ছেন প্রথম ঐতিহাসিক যিনি ব্যাপারটি নিয়ে ঠিকমতো চিন্তাভাবনা করেন ; আর গিবন তাড়াতাড়ি এর কারণটিও বার করে ফেলেন। 'রোমানরা যখন গ্রীকদের হারিয়ে তাদের দেশকে পরিণত করল একটি প্রদেশে, তখন', গিবন মন্তব্য করেন, 'গ্রীকরা এর কারণ হিসেবে

১৭ এ বিষয়ে ব্যুরি-র যুক্তির জন্য দ্রষ্টব্য 'প্রগতির ধারণা' (দ আইডিয়া অফ প্রগ্রেস), ১৯২০, পৃ ৩০৩-৪।

দায়ী করেন সাধারণতন্ত্রের গুণকে নয়, তার ভাগ্যকে।'[১৮] আর-একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক তাকিতুস-ও ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকা নিয়ে প্রচুর ভেবেছেন। ইনিও তাঁর দেশের অবক্ষয়কালের এক ঐতিহাসিক। বর্তমান শতকের শুরু থেকেই তৈরি হচ্ছিল অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার এক পরিমণ্ডল এবং ১৯১৪-র পরে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকা সম্পর্কে ব্রিটিশ লেখকরা নতুন করে জোর দিতে শুরু করেন তখন থেকেই। ব্যুরি-ই মনে হয় প্রথম ব্রিটিশ ঐতিহাসিক যিনি এ-বিষয়ে দীর্ঘদিন পরে প্রথম পোঁ ধরলেন। ১৯০৯ সালে লেখা "ইতিহাসে ডারউইনবাদ" নিবন্ধে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'ইতিহাসে আকস্মিক সমাপতনের উপাদান'-এর প্রতি, যা বহুল পরিমাণে 'সমাজ বিবর্তনের ঘটনাবলি নির্ধারণে সাহায্য করে'। ১৯১৬-য় পুরোপুরি এই বিষয় নিয়েই "ক্লিওপাট্রার নাক" নামে একটি আলাদা নিবন্ধ লেখা হয়।[১৯] আগেই উদ্‌ধৃত এইচ এ এল ফিশার-এর রচনাটিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে উদারনৈতিক স্বপ্নের ব্যর্থতায় তাঁর মোহমুক্তিই প্রতিফলিত। সেখানে তিনি ইতিহাসে 'অনিশ্চিত তথা অদৃষ্টপূর্বের ভূমিকা' মেনে নিতে পাঠকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন।[২০] ইতিহাসকে অনিশ্চয়ের এক অধ্যায় হিসেবে দেখার এই তত্ত্ব আমাদের দেশে জনপ্রিয় হতে শুরু করার ঠিক একই

১৮ 'রোম সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন', অধ্যায় ৩৮। দেখে মজা লাগে যে রোমানদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর, গ্রীকরাও — পরাজিতের প্রিয় সান্ত্বনা — ইতিহাসে 'হলেও-হতে-পারত'-র খেলায় মেতে ওঠেন। যদি মহান আলেকজান্ডার অল্প বয়েসে মারা না যেতেন, তাঁরা নিজেরাই বলতেন, 'তাহলে তিনি পাশ্চত্য (জগৎ) জয় করতেন, এবং রোম হতো গ্রীক রাজাদের অধীন।' (কে ফন ফ্রিৎস্, 'প্রাচীনকালে মিশ্র সংবিধানের তত্ত্ব' (দ থিওরি অফ দ মিক্‌স্‌ড কন্‌স্টিটিউশন ইন অ্যান্টিক্যুইটি),নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃ ৩৯৫।

১৯ দুটি রচনাই জে বি ব্যুরি-র 'নির্বাচিত প্রবন্ধাবলি' (সিলেকটেড এসেজ), ১৯৩০-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ব্যুরি-র মতামত বিষয়ে কলিংউড-এর মন্তব্যের জন্য দ্র 'ইতিহাসের ধারণা' (দ আইডিয়া অফ হিস্ট্রি), পৃ ১৪৮-৫০।

২০ রচনাংশটির জন্য (এই বই-এর) পৃ ৩৮ দ্রষ্টব্য। 'ইতিহাস সমীক্ষা' (আ স্টাডি অফ হিস্ট্রি), খণ্ড ৫, পৃ ৪১৪-য় টয়েন্‌বি-উদ্‌ধৃত ফিশার-এর বাণীটি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এটি পুরোপুরিই ভুল বুঝেছেন। তিনি মনে করেন যে 'আকস্মিকতার সর্বক্ষমতা সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা', যা অবাধ-নীতির 'জন্ম দিয়েছিল' — এ হলো তারই ফসল। অবাধ-নীতির তাত্ত্বিকরা আকস্মিকতায় বিশ্বাস করতেন না, বরং করতেন সেই গোপন হাতে, যা মানুষের আচরণের বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপন করে এক হিতকারী নিয়মনিষ্ঠা; আর ফিশার-এর মন্তব্যটি অবাধ উদারনীতির ফল নয়, এ হলো ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশকে তার ভাঙনের ফল।

সময়ে ফ্রান্সে এক দার্শনিক ঘরানার সূচনা হয়। তাঁরা প্রচার করতেন — সার্ত্র-এর বিখ্যাত 'অস্তি ও নাস্তি' (লে'তর এল নেয়াঁ) থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি — অস্তিত্বের 'না আছে কোনো কারণ, না কোনো যুক্তি বা অনিবার্যতা'। জার্মানিতে, আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, প্রধান ঐতিহাসিক মাইনেকে জীবনের শেষদিকে ইতিহাসে আকস্মিকের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। রাঙ্কে এ ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেন নি বলে তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিগত চল্লিশ বছরের জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে তিনি কিছু আকস্মিক ঘটনার সমাহারের কথা বলেছেন: কাইজারের দম্ভ, ভাইমার সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে হিন্ডেনবুর্গ-এর নির্বাচন, হিটলারের একবগ্‌গা চরিত্র ইত্যাদি। এ হলো স্বদেশের ভাগ্যবিপর্যয়ের চাপে এক মহৎ ঐতিহাসিকের মনের নিঃস্বতা।[২১] কোনো গোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাসপ্রবাহে যখন জোয়ার নয়, ভাঁটার টান আসে, তখনই দেখা যায় সেইসব তত্ত্ব যাতে আকস্মিক বা আপতনের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়। পরীক্ষার ফল হলো শুধুই লটারি — এই মত সাধারণত সেইসব ছাত্রদের মধ্যেই প্রিয় যারা তৃতীয় বিভাগে পাশ করে

কিন্তু, কোনো বিশ্বাসের উৎসগুলো খুলে ধরলেই তার মীমাংসা হয় না; এবং ক্লিওপাট্রার নাক ইতিহাসের পাতায় ঠিক কী করছে তা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। মনে হয়, মঁতেস্‌কিয়ো-ই প্রথম এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ইতিহাসের নিয়মগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। 'কোনো বিশেষ কারণ, যেমন কোনো যুদ্ধের অভাবিত ফলাফল যদি কোনো রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে', রোমানদের মহত্ত্ব ও অবনতি বিষয়ক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'তাহলে এমন কোনো সাধারণ কারণ নিশ্চয়ই ছিল যার ফলে একটিমাত্র যুদ্ধেই এই রাষ্ট্রের পতন ঘটে।' প্রশ্নটি নিয়ে মার্কসবাদীদেরও খানিক অসুবিধে হয়েছিল। মার্কস একবারই মাত্র এই ব্যাপারটা নিয়ে লিখছেন, তাও একটি চিঠিতে:

'বিশ্ব ইতিহাসে যদি আকস্মিকের কোনো স্থানই না থাকত, তাহলে তার চরিত্র হতো খুবই দুজ্ঞেয়। স্বভাবত, এই আকস্মিকতা নিজেই বিকাশের সাধারণ ধারার একটা অংশ হয়ে যায় এবং এর পূরণ হয় অন্যান্য ধরনের আকস্মিকতা দিয়ে। কিন্তু গতিবেগের হ্রাসবৃদ্ধি যেসব 'অনিশ্চয়তা'র ওপর নির্ভর করে, তার মধ্যে পড়ে গোড়া থেকেই যাঁরা আন্দোলনের নেতৃত্ব

২১ এফ মাইনেকে-র 'ম্যাকয়াভেলবাদ' (মাকিয়াভেলিজম)-এর ভূমিকায়, পৃ (৩৫)-(৩৬)-এ প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করেছেন ডব্লিউ স্টার্ক।

দিচ্ছেন সেইসব ব্যক্তির 'আকস্মিক' চরিত্র।'[২২]

মার্কস তাহলে ইতিহাসে আকস্মিকের ভূমিকার তিন দফা কৈফিয়ত দিয়েছেন। প্রথমত, ব্যাপারটির খুব একটা গুরুত্ব নেই; এতে ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগ 'বাড়ে' বা 'কমে'। অর্থাৎ, এর থেকে বোঝা যায়, কখনোই তার আমূল দিক-পরিবর্তন হয় না। দ্বিতীয়ত, কোনো একটি আকস্মিকের পূরণ হয়ে যায় অপর এক আকস্মিক দিয়ে, যাতে আকস্মিকের উপাদানটাই মূলত পাওয়া যায় ব্যক্তি-চরিত্রে।[২৩] সম্পূরক তথা স্ব-নিরোধক আকস্মিকের এই তত্ত্বটিকে আরও জোরদার করছেন ট্রট্স্কি তাঁর একটি চমৎকার তুলনা দিয়ে:

'ইতিহাসের সমগ্র প্রক্রিয়াটি হলো আকস্মিকের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক নিয়মাবলির প্রতিসরণ। জীববিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলতে পারি, বিভিন্ন আকস্মিকের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই মূর্ত হয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।'[২৪]

আমি স্বীকার করছি যে এই তত্ত্বটিকে আমার যথেষ্ট সন্তোষজনক ও প্রত্যয়গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসে আকস্মিকের ভূমিকাকে গুরুত্বসহকারে অতিরঞ্জিত করেছেন তাঁরাই, এর গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়ায় যাঁদের স্বার্থ আছে। কিন্তু এটি থাকে, তবু কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, ঘটায় শুধু গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি — এমন বলা শুধু শব্দের কসরত। একথা বিশ্বাস করারও কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না যে, কোনো একটি ঘটনার — যেমন ধরা যাক, চুয়ান্ন বছর বয়সে লেনিন-এর অকালমৃত্যু — সম্পূরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হয়ে যায় অন্য কোনো আকস্মিক ঘটনা দিয়ে, এবং এটা হয় এমনভাবে যাতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভারসাম্য ফিরে আসে।

একইভাবে, ইতিহাসের আকস্মিকতা নিছকই আমাদের অজ্ঞতার মাপকাঠি — এই দৃষ্টিভঙ্গিও যথেষ্ট নয়। আমরা যা বুঝতে অক্ষম এ শুধু তারই নামান্তর।[২৫] নিঃসন্দেহে কখনও কখনও এমন ঘটে। 'প্ল্যানেট' (গ্রহ)

২২ মার্কস-এঙ্গেলস, 'রচনাবলি' (রুশ সংস্করণ), খণ্ড ২৬, পৃ ১০৮।

২৩ 'যুদ্ধ ও শান্তি' (ওয়র অ্যান্ড পিস)-র উত্তরকথনে টলস্টয় 'প্রতিভা' ও 'আকস্মিকতা'কে এক করে দেখেছেন — দুটি শব্দই চূড়ান্ত কারণ বুঝতে মানুষের অক্ষমতাই প্রকাশ করে।

২৪ এল ট্রট্স্কি, 'আমার জীবন' (মাই লাইফ), ১৯৩০, পৃ ৪২২।

২৫ টলস্টয়-এর মত ছিল: 'অযৌক্তিক ঘটনাবলির — অর্থাৎ, সেইসব ঘটনা, যার কারণ আমরা বুঝতে পারি না — কারণ হিসেবে আমরা নিয়তিবাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হই' (যুদ্ধ ও শান্তি', খণ্ড ৯, অধ্যায় ১)। আরও দ্রষ্টব্য টীকা ২৩-এ উদ্ধৃত অংশ।

শব্দটির অর্থ 'যা ঘুরে বেড়ায়'। অবশ্যই তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল যখন ভাবা হতো, তারা আকাশে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়, আর তাদের গতিবিধির নিয়ম বোঝা যায় নি। কোনো কিছুর কারণ অনুসন্ধানের ক্লান্তিকর দায় থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার একটা পছন্দসই উপায় হলো ব্যাপারটিকে অঘটন বলে বর্ণনা করা; এবং যখন আমাকে কেউ বলেন যে, ইতিহাস হলো আকস্মিকের এক অধ্যায়, তখন আমার সন্দেহ হয়, তিনি মননগতভাবে অলস, অথবা তাঁর মননের প্রাণশক্তি কম। কোনো ঘটনা, যাকে এতকাল আকস্মিক ভাবা হতো তা যে আদৌ আকস্মিক নয়, বরং তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, এবং বৃহত্তর ঘটনাপ্রবাহের ছাঁদে সেটিকে অর্থবহভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় — সেটা দেখিয়ে দেওয়াই নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকদের নিত্যকর্ম। কিন্তু এতেও আমাদের প্রশ্নের পুরো উত্তর পাওয়া যায় না। আকস্মিক মানে শুধু এমন কিছু নয় যা আমরা বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়, ইতিহাসে আকস্মিকের এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে হবে সম্পূর্ণ অন্য কোনো ধরনের ভাবনার মধ্যে।

এর আগে দেখেছি যে ইতিহাস তখনই শুরু হয় যখন ইতিহাসকার তথ্যগুলোকে নির্বাচিত ও বিন্যস্ত করার ফলে সেগুলো হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক তথ্য। সব তথ্য ঐতিহাসিক তথ্য নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক তথ্যের এই পার্থক্য অটল বা ধ্রুব নয়; এবং, কোনো তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য নির্ধারিত হওয়ার পরে বলা যায়, সেটি ঐতিহাসিক তথ্যের স্তরে উন্নীত হতে পারে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঐতিহাসিক যখন কারণের দিকে এগোন, তখন তার পেছনেও অনুরূপ এক প্রক্রিয়াই কাজ করে। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক যে রকম দ্বৈত ও পরস্পর-নির্ভর, ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর কারণের সম্পর্কও একই রকমের। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা কী হবে তা নির্ধারিত হয় কারণ দিয়ে, আর তাঁর ব্যাখ্যাই নির্ধারণ করে তাঁর কারণ-নির্বাচন ও বিন্যাস। কারণের ক্রমবিন্যাস, একটি কারণ বা কারণসমষ্টির তুলনায় আর-একটির আপেক্ষিক তাৎপর্য — এই হলো তাঁর ব্যাখ্যানের সারবস্তু। আর এর থেকেই পাওয়া যায় ইতিহাসে আকস্মিকতা-সমস্যা সমাধানের সূত্র। ক্লিওপাট্রা-র নাকের গড়ন, বায়াজেত-এর বাত ধরা, বাঁদরের কামড়ে রাজা আলেকজান্ডার-এর প্রাণহানি, লেনিন-এর মৃত্যু — এসব হলো আকস্মিক ঘটনা যা ইতিহাসের ধারাকে কিছুটা পাল্টে দেয়। এদের অদৃশ্য করে দেওয়ার চেষ্টা, বা কোনোভাবেই এদের প্রভাব পড়ে না — এমন ভান করা অর্থহীন। অপরপক্ষে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো আকস্মিক, ততক্ষণ ইতিহাসের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিকের (নিজস্ব) গুরুত্বপূর্ণ

তথ্যের ক্রমবিন্যাসে তারা পড়ে না। অধ্যাপক পপার ও অধ্যাপক বার্লিন — এই ঘরানোর সবচেয়ে বিশিষ্ট তথা বহুপঠিত দুই প্রতিনিধির নাম আবার উল্লেখ করলুম — ধরে নেন যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থ খুঁজে পাওয়া ও তার থেকে সিদ্ধান্ত টানার জন্য ঐতিহাসিকের চেষ্টা 'গোটা অভিজ্ঞতা'কে একটি সুসমঞ্জস বিন্যাসে পরিণত করার চেষ্টারই নামান্তর, এবং ইতিহাসে আকস্মিকতার উপস্থিতি এই ধরনের যে-কোনো চেষ্টাকে ব্যর্থ করে। কিন্তু কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ঐতিহাসিকই 'গোটা অভিজ্ঞতা'কে ধরতে চাওয়ার মতো উদ্‌বাস্তব কাণ্ড করেন না; এমনকি ইতিহাসের যে-এলাকা বা দিকটি বেছে নিয়ে তিনি লিখবেন বলে ঠিক করেছেন তারও একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বেশি তিনি ধরতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকের জগতের মতো ঐতিহাসিকের জগৎও বাস্তব জগতের আলোকচিত্র নয়, বরং তা বাস্তবের একটা কাজ-চালানো প্রতিরূপ। সে দিয়ে তিনি কমবেশি কার্যকরভাবে বাস্তবকে অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে পারেন। অতীত অভিজ্ঞতা বা তার যতটুকু তাঁর হাতে এসেছে তার থেকে ঐতিহাসিক সেই অংশটুকুই ছেঁকে নেন, যেটুকুর যুক্তিগ্রাহ্য বয়ান-ব্যাখ্যান দেওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। আর তার থেকেই তিনি এমন সব সিদ্ধান্ত টানেন যা কর্মের দিশারি হতে পারে। বিজ্ঞানের সিদ্ধি প্রসঙ্গে এখনকার এক জনপ্রিয় লেখক বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন মানবমনের সেইসব প্রক্রিয়ার কথা যা 'নিরীক্ষিত "তথ্য"-র থলে হাতড়ে প্রা স ঙ্গি ক নিরীক্ষিত তথ্যগুলি নির্বাচন করে, ভাঙে ও একত্র করে একটা ধাঁচে সাজিয়ে নেয়, বর্জন করে অ প্রা স ঙ্গি-ক-কে, যতক্ষণ-না সেই টানাপোড়েনে বোনা হচ্ছে যুক্তিগ্রাহ্য এক "জ্ঞান"-এর নকশি কাঁথা।'[২৬] অযথা বিষয়ীসর্বস্বতার বিপদ কিছুটা বাদ দিয়ে, ঐতিহাসিকের মন কীভাবে কাজ করে — এটিকেই আমি তার প্রতিচ্ছবি হিসেবে গ্রহণ করব।

দার্শনিকের, এমনকি কিছু ঐতিহাসিককেও এই পদ্ধতি হতচকিত ও বিমূঢ় করতে পারে। কিন্তু জীবনের ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত সাধারণ মানুষের কাছে এই পদ্ধতি খুবই পরিচিত। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জোন্‌স্ পার্টিতে গিয়ে, মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খেয়ে একটা গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল। দেখা গেল তার ব্রেক খারাপ। রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ বাঁক খেয়েছে সেখানে আলো এত কম যে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। সেখানে সে রবিনসনকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলল। রবিনসন তখন মোড়ের দোকান

২৬ এল পল, 'মানুষের বিলোপ' (দ অ্যানিহিলেশন অফ ম্যান) ১৯৪৪, পৃ ১৪৭।

থেকে সিগারেট কিনবে বলে রাস্তা পেরোচ্ছিল। সব হুজ্জত কাটবার পর, আমরা — ধরা যাক স্থানীয় থানায় — ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে বসলুম। ড্রাইভারের আধা-মাতাল অবস্থাই কি এর জন্যে দায়ী? তাহলে তো ফৌজদারি মামলা হতে পারে। নাকি ব্রেকের গলতির জন্যেই এটা হয়েছে। তাহলে তো যে-গ্যারেজে মাত্র হপ্তাখানেক আগে গাড়ি মেরামত হয়েছে তাদের কিছু বলতে হয়। নাকি এর জন্যে দায়ী রাস্তার হঠাৎ বাঁক? তাহলে সড়ক কর্তৃপক্ষকে এ দিকে নজর দিতে বলা দরকার। যখন আমরা এইসব বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি, দুজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক — তাঁদের নাম করতে চাই না — হঠাৎ দরজা ঠেলে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে অকাট্য যুক্তিসহকারে সাবলীলভাবে আমাদের বলতে লাগলেন, যদি-না সেই সন্ধেয় রবিনসন-এর সিগারেট ফুরিয়ে যেত, তাহলে সে রাস্তা পেরুত না, মারাও পড়ত না ; সুতরাং রবিনসন-এর সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেই তার মৃত্যুর কারণ, এবং কোনো তত্ত্বতল্লাশে এই কারণটিকে গণ্য না-করা হলে তা হবে সময়ের অপচয়, আর তার থেকে যে-কোনো সিদ্ধান্ত টানাটা নিরর্থক ও নিষ্ফল। ভালো কথা, কিন্তু আমরা কী করি? যে-মুহূর্তে আমাদের দুই অতিথির বক্তৃতার তোড় আমরা ঠেকাতে পারব, সেই মুহূর্তে ভদ্র কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাঁদের পৌঁছে দেব দরজার দিকে, দারোয়ানকে বলে দেব, কোনো অবস্থাতেই যেন তাঁদের আর ঢুকতে না-দেওয়া হয়, আর আমরা আমাদের তত্ত্বতল্লাশ চালিয়ে যাব। কিন্তু এই যাঁরা আমাদের বাধা দিলেন, তাঁদের আমরা কী উত্তর দেব? নিশ্চয়ই, রবিনসন ধূমপায়ী ছিল বলেই মারা গেছে। ইতিহাসে আকস্মিকতা ও হঠাৎ-ঘটা ঘটনার ভক্তরা যা বলেন তার সবকিছুই পুরোপুরি সত্যি ও যুক্তিসঙ্গত। 'আজব দেশে অ্যালিস' (অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড) আর 'আয়নার মধ্যে দিয়ে' (থ্রু দ লুকিং গ্লাস)-এও এই ধরনের অকাট্য যুক্তি আমরা পাই। কিন্তু অক্স্‌ফোর্ড পাণ্ডিত্যের এই সুপরিণত দৃষ্টান্তগুলো তারিফ করায় যদিও আমি কারও চেয়ে কম যাই না, তাহলেও আমার বিভিন্ন প্রণালীর যুক্তিকে আলাদা-আলাদা করে রাখারই আমি পক্ষপাতী। ডজসন-এর প্রণালী ইতিহাসের প্রণালী নয়।

ইতিহাস তাহলে ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুযায়ী নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া। ট্যালকট্ পারসন্স্-এর কথাগুলো আর একবার ধার করে বলা যায়, ইতিহাস শুধু বাস্তবতার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণেই নয়, কারণসম্মত সম্পর্ক নির্ধারণেও 'নির্বাচনমূলক পদ্ধতি'। অনন্ত তথ্যসমুদ্র থেকে ঐতিহাসিক যেমন শুধু তাঁর কাজের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলিই বাছাই করে নেন, তেমনিই কার্যকারণ-পরম্পরার অজস্র ক্রমের মধ্যে থেকে তিনি নিষ্কাষণ করে নেন সেগুলোই, আর শুধুই সেগুলোকে, যেগুলো

ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ; এবং এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যের মান হলো তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য বয়ান-ব্যাখ্যানের ধাঁচটির মধ্যে সেগুলোকে খাপ খাইয়ে নিতে পারার ক্ষমতা। অন্যান্য কার্যকারণ-পরম্পরাকে আপতন বলে বাতিল করতে হয়, কেননা তাদের কার্য-কারণের সম্পর্কই যে শুধু আলাদা তা নয়, পরম্পরাটিও অপ্রাসঙ্গিক। ঐতিহাসিক এ বাবদে কিছুই করতে পারেন না ; এর কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যান দেওয়া যায় না এবং অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনো ক্ষেত্রেই এর কোনো অর্থ হয় না। একথা সত্যি যে ক্লিওপাট্রা র নাক, বা বায়াজেত-এর গেঁটেবাত, বা আলেকজান্ডারকে বাঁদরের কামড়, বা লেনিন-এর মৃত্যু বা রবিনসন-এর ধূমপান — এ সবেরই পরিণাম ছিল। কিন্তু সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসেবে একথা বলার কোনো অর্থ হয় না যে, সুন্দরী রানীদের রূপমুগ্ধ হন বলেই সেনাপতিরা যুদ্ধ হারেন, রাজারা বাঁদর পোষেন বলেই যুদ্ধ হয়, কিংবা লোকে সিগারেট খায় বলেই রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে ও মারা যায়। অপরপক্ষে, কোনো সাধারণ মানুষকে যদি বলা হয় যে, ড্রাইভারের মদ-খাওয়া বা ব্রেক কাজ না-করা, বা রাস্তার একটা হঠাৎ-বাঁকের দরুনই রবিনসন মারা গেছে, তাহলে তার মনে হবে এটা পুরোপুরি বোধগম্য তথা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। যদি তিনি তফাত করতে চান, তাহলে তিনি এমনকি এও বলতে পারেন যে, রবিনসন-এর সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে নয়, ঐ ঘটনাচক্রই হলো তার মৃত্যুর 'আসল' কারণ। তেমনি, ইতিহাসের কোনো ছাত্রকে যদি বলা যায় যে, ১৯২০-র দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে সব সংঘাত হয়েছিল তার কারণ হলো কয়েকটি বিষয় যেমন, শিল্পায়নের হার বা শহরের লোকেদের খাদ্য সরবরাহের জন্যে আরও বেশি শস্য উৎপাদনকরতে কৃষকদের উৎসাহিত করার সেরা উপায় ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা, বা এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা — তাহলে তার মনে হবে, এগুলো যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা, এই অর্থে যে অন্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেও এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং সেখানে যা যা ঘটেছিল এগুলোই তার 'আসল' কারণ, লেনিন-এর অকালমৃত্যু — এই আপতিক ঘটনাটি নয়। এমনকি এই ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলে তাঁর হয়তো মনেও পড়তে পারে 'অধিকার বিষয়ক দর্শন' (ফিলজ়ফি অফ রাইট)-এর ভূমিকায় হেগেল-এর সেই বাণী: 'যা কিছু যৌক্তিক তা-ই বাস্তব, এবং যা কিছু বাস্তব, তা-ই যৌক্তিক।' বাণীটি উদ্‌ধৃত হয়েছে বহুবার এবং ভুল বোঝাও হয়েছে বহুবার।

এক লহমার জন্য রবিনসন-এর মৃত্যুর কারণে ফেরা যাক। কিছু কিছু কারণ যে যুক্তিগ্রাহ্য তথা 'বাস্তব', এবং কিছু যে যুক্তিগ্রাহ্য নয় ও আপতিক

— সেটা ঠাহর করতে আমাদের কোনো অসুবিধেই হয় না। কিন্তু এই পার্থক্য আমরা নির্ধারণ করি কী দিয়ে? যুক্তিবৃত্তি সাধারণত প্রয়োগ করা হয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই। বুদ্ধিজীবীরা কখনও কখনও বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, বা ভাবেন যে যুক্তিপ্রয়োগ করেন, নিছক মজার জন্যে। কিন্তু মোটের ওপর কোনো লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যেই মানুষ যুক্তি প্রয়োগ করে। এবং যখন আমরা কিছু কিছু ব্যাখ্যাকে যুক্তিগ্রাহ্য এবং কিছুকিছুকে যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে স্বীকার করেছি, তখন, আমি বলতে চাই, আমরা তফাত করেছি যে-ব্যাখ্যাগুলো কোনো লক্ষ্যে পৌঁছনোর কাজে লাগে এবং যেগুলো কোনো কাজে লাগে না — তাদের মধ্যে। আলোচ্য ঘটনাটির ক্ষেত্রে দেখা যাবে, চালকদের মদ্যাসক্তি কমানো, বা গাড়ির ব্রেকের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ, বা ঠিকমতো জায়গায় রাস্তা করা — এগুলির ফলে যান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কমতে পারে। কিন্তু লোকের সিগারেট খাওয়া বন্ধ করলে যান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমবে এমন ভাবা অর্থহীন। বিচারের এই মাপকাঠি দিয়েই আমরা ঐ তফাত করেছি। এবং ইতিহাসের কারণ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। সেখানেও আমরা যুক্তিগ্রাহ্য আপতিক কারণের মধ্যে তফাত করি। যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে প্রযোজ্য হতে পারে বলে সেগুলিকে শেষ অবধি ফলদায়ী সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং সেগুলো থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। সেগুলো তাই আমাদের বোধ বিস্মৃত ও গভীর করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগে।[২৭] আপতিক কারণগুল্যের কোনো সাধারণীকরণ করা যায় না; আর যেহেতু সর্ব অর্থেই সেগুলো অনন্য তাই শেষ অবধি সেগুলো থেকে না পাওয়া যায় কোনো শিক্ষা, না পৌঁছনো যায় কোনো সিদ্ধান্তে। কিন্তু এইখানে আমায় অবশ্যই আর-একটা বিষয়ের কথা তুলতে হবে। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার ঠিক এই ধারণাটি থেকেই পাওয়া যায় ইতিহাসে কার্যকারণ নির্ণয়ে আমাদের পর্যালোচনার চাবিকাঠি; এবং এর সঙ্গে মূল্যবিচারের প্রশ্নটিও অবধারিতভাবেই জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের

২৭ ঠিক এর জায়গাটিতে অধ্যাপক পপার এক মুহূর্তের জন্য হোঁচট খেয়েছেন, তবু সেটা দেখতে পান নি। যদিও তিনি ধরে নিয়েছেন যে, 'ব্যাখ্যা হয় বহুরকম, যেগুলি ইঙ্গিতময়তা ও যথেচ্ছা-র' (শব্দ দুটির মানে যা-ই হোক না কেন) 'দিক দিয়ে মূলত একই স্তরের', তাহলেও, বন্ধনীর মধ্যে তিনি যোগ করেছেন যে, 'তাদের মধ্যে কতকগুলিকে চিহ্নিত করা যায় উর্বরতার লক্ষণ দিয়ে — এই একটা দিকের খানিক গুরুত্ব আছে' ('ইতিহাসবাদের দৈন্য', পৃ ১৫১)। একটা দিকের খানিক গুরুত্ব আছে — তা নয়, এটাই হলো সেই দিক যাতে প্রমাণ হয় যে 'ইতিহাসবাদ' (কয়েকটি অর্থে অন্তত) অতটা দীন নয়।

ব্যাখ্যান, আমরা আগের বক্তৃতাতেই দেখেছি, সর্বদাই মূল্যবিচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আর ব্যাখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কার্যকারণ নির্ণয়। মাইনেকে — মহান মাইনেকে, ১৯২০-র দশকের মাইনেকে-এর কথায়, 'মূল্য বাদ দিয়ে ইতিহাসে কার্যকারণ অনুসন্ধান অসম্ভব... কার্যকারণ অনুসন্ধানের পেছনে সর্বদাই থাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মূল্য-অনুসন্ধান।'[২৮] এবং এইখানেই মনে পড়ে ইতিহাসের দ্বৈত তথা পরস্পর-নির্ভর ভূমিকা বিষয়ে আমি আগে যা বলেছি তার কথা। তা হলো বর্তমানের আলোয় অতীতকে তথা অতীতের আলোয় বর্তমানকে আরও ভালো করে বুঝতে সাহায্য করা। যা কিছু এই দ্বৈত উদ্দেশ্যে সাধনে সহায় হতে পারে না, যেমন ক্লিওপাট্রার নাকের প্রতি অ্যান্টনির মোহ, ঐতিহাসিকের চোখে তা-ই মৃত ও নিষ্ফল।

এই বাঁকে এসে আমার স্বীকার করার সময় হয়েছে যে আমি আপনাদের সঙ্গে একটা বস্তাপচা চালাকি করেছি। আপনাদের পক্ষে সেটা বোঝা আদৌ শক্ত হবে না ; এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এটি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও সরল করতে পেরেছি। তাই মনে হয় আপনারা এটিকে শর্টহ্যান্ড-এর সুবিধাজনক নমুনা হিসেবে ধরে নিয়ে ক্ষমার চোখে দেখবেন। এখনও পর্যন্ত সর্বত্রই আমি 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' এই প্রথাগত শব্দই ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি কাল্পনিক বিভাজন-রেখা হিসেবে ছাড়া বর্তমানের আর কোনো ধারণাগত অস্তিত্ব নেই। বর্তমানের কথা বলতে গিয়ে আমি ইতোমধ্যেই আমার যুক্তির মধ্যে আর-একটি কাল-মাত্রা পাচার করেছি। আমার মনে হয়, এটা দেখানো সহজ হবে যে, অতীত তথা ভবিষ্যৎ যেহেতু একই কালসীমার অংশ, তাই অতীত বিষয়ে আগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে আগ্রহ পরস্পর-সংযুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালের এই বিভাজন-রেখা তখনই পেরোনো যায় যখন মানুষ আর শুধু বর্তমানেই বাঁচে না, তাদের অতীত তথা ভবিষ্যৎ দু-এর সম্বন্ধে সচেতনভাবেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যকে এক হাত থেকে অন্য হাতে তুলে দিয়েই ইতিহাসের সূচনা ; আর ঐতিহ্য বলতে বোঝায় অতীতের অভ্যাস ও শিক্ষা ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকারের জন্যেই শুরু হয়েছিল অতীতে বিবরণ রেখে যাওয়ার কাজ। 'ঐতিহাসিক চিন্তা', ওলন্দাজ ঐতিহাসিক

২৮ 'ইতিহাসে কার্যকারণবিধি ও মূল্য' (কাউসালিট্যাটেন উন্ড ভের্টে ইন ডোর গেসিশ্‌টে), ১৯২৮, এফ স্টার্ন, 'নানা রকমের ইতিহাস' (ভ্যারাইটিজ্ অফ হিস্‌ট্রি), ১৯৫৭, পৃ ২৬৮, ২৭৩-এ অনূদিত।

হুইৎসিঙ্গা বলেছেন, 'সর্বদাই পরিণতিমূলক।'[২৯] সার চার্লস স্নো সম্প্রতি রাদারফোর্ড সম্বন্ধে লিখেছেন যে 'সব বিজ্ঞানীর মতোই ... তাঁরও মজ্জায় ছিল ভবিষ্যৎ, যদিও এর অর্থ নিয়ে তিনি মাথাই ঘামাতেন না।'[৩০] আমার মনে হয় ভালো ঐতিহাসিকদেরও মজ্জায় থাকে ভবিষ্যৎ, সে নিয়ে তাঁরা ভাবুন আর না-ই ভাবুন। 'কেন ?' এই প্রশ্নটি ছাড়াও ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন 'কোন্ দিকে ?'

২৯ জে হুইৎসিঙ্গা, 'নানা রকমের ইতিহাস', এফ স্টার্ন সম্পা, ১৯৫৭, পৃ ২৯৩-এ অনূদিত।

৩০ 'বলডুইন যুগ' (দ বলডুইন এজ), জন রেমন্ড সম্পা, ১৯৬০, পৃ ২৪৬।

প্রগতি-রূপে ইতিহাস

অক্‌স্‌ফোর্ড-এ তিরিশ বছর আগে আধুনিক ইতিহাসের রিজিয়স অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপক পোউইক যে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন, তার একটা জায়গা উদ্‌ধৃত করে শুরু করা যাক:

'ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার অভিলাষের মূল এতই গভীরে যে অতীত সম্পর্কে একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি না-থাকলে আমরা আকৃষ্ট হব হয় অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে নয়তো অনাস্থাবাদের দিকে।'[১]

'অতীন্দ্রিয়বাদ' হলো, আমার মনে হয়, সেই মত যাতে মনে করা হয় যে ইতিহাসের অর্থ আছে ইতিহাসের বাইরে কোথাও, যেমন ধর্মতত্ত্ব বা পরিনির্বাণতত্ত্বের জগতে — বের্দিয়ায়েভ বা নিবুহ্‌র বা টয়েন্‌বি-র মতো লেখকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।[২] 'অনাস্থাবাদে'র উদাহরণ আমি আগেই বেশ কয়েকবার দিয়েছি। এ হলো সেই মত যাতে মনে করা হয় যে ইতিহাসের কোনো অর্থই নেই, কিংবা সমভাবে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য অজস্র অর্থ আছে, অথবা সেই অর্থটিই আছে যেটি আমরা যথেচ্ছ চাপাতে চাই। সম্ভবত এ দুটিই হলো হালে ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি মত। আমি কিন্তু দুটিকেই নির্দ্বিধায় বাতিল করব। আমাদের জন্যে তাহলে পড়ে থাকবে সেই অদ্ভুত, অথচ ইঙ্গিতবাহী উক্তিটি: 'অতীত বিষয়ে একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি'। এই কথাগুলি লেখার সময় অধ্যাপক পোউইক-এর মনে কী ছিল তা জানার কোনো উপায় না থাকায়, আমি নিজের ব্যাখ্যাই দেওয়ার চেষ্টা করব।

এশিয়ার সব প্রাচীন সভ্যতার মতোই গ্রীস ও রোমের ধ্রুপদী সভ্যতাও ছিল মূলত অনৈতিহাসিক। ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি, ইতিহাসের জনক হেরোদোতাস-এর মানসসন্তান ছিলেন অল্পই; এবং ধ্রুপদী অতীতের লেখকরা মোটের ওপর ভবিষ্যৎ নিয়েও অতীতের মতোই

১ এফ পোউইক, 'আধুনিক ঐতিহাসিকবৃন্দ ও ইতিহাসচর্চা' (মডার্ন হিস্টোরিয়ান্‌স্‌ অ্যান্ড দ স্টাডি অফ হিস্‌ট্রি), ১৯৫৫, পৃ ১৭৪।

২ টয়েন্‌বি যেমন বিজয়গর্বে ঘোষণা করেছেন, 'ইতিহাস পরিণতি পায় ধর্মতত্ত্বে।' 'কাঠগড়ায় সভ্যতা' (সিভিলাইজেশন অন ট্রায়াল), ১৯৪৮, মুখবন্ধ।

কম মাথা ঘামাতেন। থুকিদিদেস বিশ্বাস করতেন, তিনি যেসব ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন তার আগে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি, এবং পরেও তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা ক্ষীণ। লুক্রেতিউস অনুমান করেছিলেন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের ঔদাসীন্যের কারণ আসলে অতীত সম্পর্কে তার অনাগ্রহ :

'ভেবে দেখো, আমাদের জন্মের আগে চিরন্তন কালের বিগত যুগগুলি আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। আমাদের মৃত্যুর পর ভাবীকাল যা হবে এ হলো তারই দর্পণ, প্রকৃতি যা আমাদের সামনে ধরে রেখেছে।'[৩]

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাব্যিক ধ্যানমূর্তি রূপ নেয় অতীতের এক স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তনের — এটি এক চক্রবৎ দৃষ্টি যাতে ইতিহাসের প্রক্রিয়াকে প্রকৃতির প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়। ইতিহাস কোথাওই যাচ্ছিল না : কারণ অতীতের কোনো ধারণা ছিল না; আর, একইভাবে, ছিল না ভবিষ্যতের কোনো ধারণাও। ভার্জিল তাঁর চতুর্থ রাখালিয়া গাথা (এক্‌লোগ)-য় সুবর্ণযুগে প্রত্যাবর্তনের এক ধ্রুপদী চিত্র উপস্থিত করেছেন। তিনি শুধু ক্ষণিকের জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন চক্রবৎ ধারণা ভেঙে বেরিয়ে আসতে। 'আমি তাদের অন্তহীন রাজ্য দিয়েছি' ছিল খুবই অ-ধ্রুপদী চিন্তা। এর ফলেই ভার্জিল পরবর্তীকালে স্বীকৃতি লাভ করেছেন প্রায় খ্রীস্টান প্রবক্তা হিসেবে।

ইহুদিরা, ও তাঁদের পরে খ্রীস্টানরা আনলেন সম্পূর্ণ নতুন এক উপাদান। তাঁরা ধরে নিলেন যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে কোনো এক লক্ষ্যের দিকে। এ হলো ইতিহাসের পরিণতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এইভাবে ইতিহাস অর্জন করল অর্থ ও উদ্দেশ্য, কিন্তু হারাল তার অ-ধর্মীয় চরিত্র। আপনা থেকেই ইতিহাসের লক্ষ্য অর্জন করার মানে দাঁড়াবে ইতিহাসের পরিশেষ। ইতিহাস নিজেই হয়ে দাঁড়াল ঈশ্বরের পক্ষ সমর্থনের মতো। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ছিল মধ্যযুগীয় মতবাদ। মানবকেন্দ্রিক বিশ্বের ধ্রুপদী মতবাদ তথা যুক্তির প্রাধান্য ফিরে এল নবজাগরণের সময়ে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশাবাদী ধ্রুপদী মতবাদের জায়গায় বসানো হলো ইহুদি-খ্রীস্টীয় ঐতিহ্য থেকে পাওয়া এক আশাবাদী মত। কাল একদা ছিল বৈরী ও ক্ষয়সাধক, তা-ই এখন হয়ে উঠল মিত্রোচিত ও সৃষ্টিশীল : হোরেস-এর 'ক্ষতিকর কাল কিসের না লাঘব করে?' আর বেকন-এর 'সত্য কালের সন্তান' — এই দুটি বাণীর প্রতিতুলনা করুন। আধুনিক ইতিহাস রচনার

৩ 'প্রকৃতির স্বভাব' (দে রেরুম নাতুরা), ৩, পঙ্‌ক্তি ৯৯২-৫।

যাঁরা জনক, দীপায়ন পর্বের সেই যুক্তিবাদীরা, ইহুদি-খ্রীস্টীয় পরিণতিবাদী মতটিই রক্ষা করলেন, কিন্তু লক্ষ্যটিকে করে নিলেন ধর্মনিরপেক্ষ; ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ব্যাপারটির যুক্তিভিত্তিক চরিত্র তাঁরা ফিরিয়ে আনতে পারলেন। পৃথিবীতে মানুষের অবস্থার পরোৎকর্ষের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলাই হয়ে উঠল ইতিহাস। দীপায়ন পর্বের ইতিহাসবিদদের মধ্যে যিনি মহত্তম, সেই গিবন লিখেছিলেন — তিনি যাকে বলেছেন — 'এই তৃপ্তিকর উপসংহার যে পৃথিবীর প্রত্যেক যুগই মানব জাতির প্রকৃত সম্পদ, সুখ, জ্ঞান ও সম্ভবত সদ্‌গুণও বাড়িয়েছে এবং এখনও বাড়াচ্ছে'।[৪] তাঁর বিষয়ের প্রকৃতির দরুন এ কথা লিখতে তিনি বাধা পান নি। ব্রিটিশদের উন্নতি, ক্ষমতা তথা আত্মবিশ্বাস যখন তুঙ্গে, প্রগতি-ভজনাও তখনই পৌঁছয় শীর্ষবিন্দুতে; আর এই বিশ্বাসের সবচেয়ে গোঁড়া ভক্তদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ লেখক ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা। সংঘটনটি এতই পরিচিত যে উদাহরণ দেওয়ার দরকার নেই; সাম্প্রতিককালেও আমাদের যাবতীয় ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিতে বিশ্বাস কতখানি স্বীকার্য হয়েছিল তা দেখানোর জন্যে দু-একটি উদ্‌ধৃতি দিলেই চলবে। 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস' প্রকল্প বিষয়ে অ্যাক্টন-এর ১৮৯৬-এর প্রতিবেদন থেকে আমি আমার প্রথম বক্তৃতাতেই উদ্‌ধৃতি দিয়েছি। সেখানে তিনি ইতিহাসকে উল্লেখ করেছেন একটি 'প্রগতিশীল বিজ্ঞান' হিসেবে, এবং ('কেমব্রিজ) ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, 'ইতিহাস- যার ভিত্তিতে লেখা হবে সেরকম একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হিসেবে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে প্রগতিকে আমরা ধরে নিতে বাধ্য'। স্নাতক পর্যায়ে যে-কলেজে আমি পড়েছি সেখানকার শিক্ষক ছিলেন ড্যাম্পিয়ার। ১৯১০-এ প্রকাশিত ('কেমব্রিজ) ইতিহাসে'র শেষ খণ্ডে তিনি নিঃসংশয়ে বলেছিলেন যে, 'প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং মানবজাতির কল্যাণে সেই সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহারের কোনো সীমা থাকবে না আগামী

৪ গিবন, 'রোম সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন' (ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দ রোমান এম্পায়ার), অধ্যায় ৩৮। অপ্রাসঙ্গিক এই মন্তব্যের উপলক্ষ্য হলো পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের বিলয়। এই অংশটি উদ্‌ধৃত করে 'টাইম্‌স্‌ সাহিত্য ক্রোড়পত্র' (টাইম্‌স্‌ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট), ১৮ নভেম্বর, ১৯৬০-এ, জনৈক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, গিবন-এর মনে কি ঠিক এই কথাই ছিল? হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই ছিল। তিনি যে-সময় নিয়ে লিখছেন, তার চেয়ে বরং তিনি যে-সময় বাস করছেন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটারই প্রতিফলন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই সমালোচকই এ-সত্যের ভালো দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর মধ্য-বিংশ-শতকের সংশয়বাদকে চালান করতে চেয়েছেন আঠেরো শতকের শেষদিকের লেখকের ওপর।

যুগে'।[৫] যে-কথা আমি বলতে চলেছি সে-দিক থেকে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া শোভন হবে যে এ-ই সেই বাতাবরণ যাতে আমি লেখাপড়া শিখেছি, এবং আমার চেয়ে আধ পুরুষ বড় বারট্রান্ড রাসেল যে বলেছিলেন, 'আমি বড় হয়েছি ভিক্টোরীয় আশাবাদের ভরা জোয়ারে, আর... যে আশাভরপুর ভাব তখন ছিল সহজ তার কিছুটা এখনও আমার মধ্যে রয়ে গেছে',[৬] তার সঙ্গে আমি নির্দ্বিধায় একমত হতে পারি।

১৯২০-তে ব্যুরি যখন 'প্রগতির ধারণা' বইটি লিখেছেন, তার মধ্যেই এসে গেছে এক মলিনতর আবহাওয়া। প্রচলিত কেতা মেনে তিনিও এর জন্যে দায়ী করেন 'সেইসব মতান্ধদের যারা রাশিয়ায় বর্তমান সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করেছে', যদিও তখনও তিনি প্রগতিকেই 'পশ্চিমী সভ্যতার প্রাণদায়ী ও নিয়ন্ত্রক ধারণা'[৭] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর পরেই নিশ্চুপ হয়ে গেল এই সুর। বলা হয় রাশিয়ার প্রথম নিকোলাস 'প্রগতি' শব্দটি নিষিদ্ধ করে এক হুকুম জারি করেছিলেন ; পশ্চিম ইওরোপের, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা এখন তার সঙ্গে দেরিতে হলেও একমত হয়েছেন। প্রগতির প্রকল্পটি খণ্ডন করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিলয় — এই কথাদুটি এতই পরিচিত হয়ে উঠেছে যে এর জন্যে আর উদ্‌ধৃতি-চিহ্ন লাগে না। কিন্তু, এইসব শোরগোল বাদে, ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছে ? এই নতুন মতের ধারা গড়ে তুলেছিলেন কে বা কারা ? এই সেদিন আমি চমকে উঠেছিলুম বারট্রান্ড রাসেল-এর মন্তব্য দেখে, যেটি, আমার মনে হয়, আমার দেখা রাসেল-এর একটি মন্তব্য যাতে তীব্র শ্রেণী চেতনা ধরা পড়েছে : 'সব মিলিয়ে, একশ বছর আগের তুলনায়, পৃথিবীতে এখন অল্পই স্বাধীনতা আছে।'[৮] আমার হাতে স্বাধীনতার কোনো গজকাঠি নেই, আর অল্পসংখ্যকের অল্পতর স্বাধীনতার সঙ্গে বহুজনের বহুতর স্বাধীনতার তুলনা কী করে করা যায় তাও আমি জানি না। কিন্তু যে-মাপকাঠিতেই হোক না কেন, বিবৃতিটিকে আমি শুধু অবাস্তব রকমের অসত্য বলেই গণ্য করতে পারি। বরং অক্‌স্‌ফোর্ড-এর বিদ্বৎ-জীবন সম্বন্ধে এ জে পি টেলর কখনও

৫ 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস : উৎপত্তি, লেখন ও গ্রন্থরূপ', ১৯০৭, পৃ ১৩ ; 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস', খণ্ড ১, ১৯০২, পৃ ৪ ; খণ্ড ১২, ১৯১০, পৃ ৭৯১।

৬ বি রাসেল, 'স্মৃতির পট' (পোর্ট্রেটস্ ফ্রম মেমরি), ১৯৫৬, পৃ ১৭।

৭ জে বি ব্যুরি, 'প্রগতির ধারণা' (দ আইডিয়া অফ প্রগ্রেস), ১৯২০, পৃ সাত-আট।

৮ বি রাসেল, 'স্মৃতির পট', ১৯৫৬, পৃ ১২৪।

কখনও যেসব চমকপ্রদ আভাস দেন, তারই একটি আমাকে টানে অনেক বেশি। সভ্যতার বিলয় সম্পর্কে এইসব কথাবার্তার অর্থ, তিনি লিখেছেন, 'শুধু এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আগে চাকর-বাকর ছিল আর এখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সাফা-মাজার কাজ করেন'।[৯] অবশ্যই অধ্যাপকদের নিজেদের সাফা-মাজা করাটা আগেকার চাকরদের কাছে প্রগতির প্রতীক হতে পারে। আফ্রিকায় শ্বেত-প্রভুত্ব হারানোয় দুশ্চিন্তিত হন সাম্রাজ্যভক্ত, আফ্রিকানের সাধারণতন্ত্রী তথা সোনা ও তামার শেয়ার-এ বিনিয়োগকারীরা ; কিন্তু অন্যদের চোখে এটাকেই মনে হতে পারে প্রগতি। প্রগতির প্রশ্ন কেন ১৮৯০-এর দশকের অভিমতের চেয়ে ১৯৫০-এর দশকের অভিমত, রাশিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকার অভিমতের চেয়ে ইংরিজি-ভাষী দুনিয়ার অভিমত, বা [রক্ষণশীল দলভুক্ত ইংল্যান্ড-এর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী] ম্যাকমিলন-এর মতে যাদের অবস্থা আগে কখনও এত ভালো ছিল না, সেই রাস্তার লোকেদের অভিমতের চেয়ে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের অভিমতকে আমি স্বয়ংপ্রমাণ তথ্য বলে বেছে নেব — তার কোনো কারণ আমি দেখি না। আমরা প্রগতির পর্যায়ে বাস করছি, না বিলয়ের — সে বিচার আপাতত মুলতুবি থাক। আর-একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাক প্রগতির ধারণার নিহিতার্থ কী, এর পেছনে কী কী ব্যাপার ধরে নেওয়া হয়েছে, আর সেগুলি কতটা বাতিলযোগ্য হয়ে গেছে।

প্রগতি আর অভিব্যক্তি মিলে যে জগাখিচুড়ি হয়ে আছে প্রথমেই আমি সেটা পরিষ্কার করে নিতে চাই। দীপায়ন পর্বের চিন্তাবিদরা গ্রহণ করেছিলেন আপাত-অসমঞ্জস দুটি মত। প্রকৃতির জগতে মানুষের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা : ইতিহাসের নিয়ম আর প্রকৃতির নিয়ম এক করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য দিকে, তাঁরা প্রগতিতেও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু, প্রকৃতি প্রগতিশীল, সে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে কোনো লক্ষ্যের দিকে — এমন ধরে নেওয়ার কী ভিত্তি ছিল ? হেগেল এই অসুবিধার মোকাবিলা করেন ইতিহাস আর প্রগতির মধ্যে সুস্পষ্ট ফারাক করে: প্রথমটি প্রগতিশীল. দ্বিতীয়টি নয়। প্রগতির সঙ্গে অভিব্যক্তির সমীকরণ ঘটিয়ে ডারউইনীয় বিপ্লব এই সব অসোয়াস্তির অবসান ঘটাল বলে মনে হলো। ইতিহাসের মতো প্রকৃতিও শেষ অবধি প্রগতিশীল বলে দেখা দিল। কিন্তু জৈব উত্তরাধিকার (যা অভিব্যক্তির উৎস) ও সামাজিক অর্জন (যা ইতিহাসে প্রগতির উৎস) — দু-এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলে, ডারউইনীয় বিপ্লব

৯ 'পর্যবেক্ষক' (দ অবজারভার), ২১ জুন ১৯৫৯।

আরও বেশি ভুল-বোঝাবুঝির রাস্তা খুলে দিল। এ দু-এর পার্থক্য খুবই পরিচিত ও স্পষ্ট। কোনো ইওরোপীয় শিশুকে চীনা পরিবারে রাখা হোক, বড় হলে তার চামড়া হবে সাদা, কিন্তু সে বলবে চীনা ভাষা। চামড়ার রঙ হলো জৈব উত্তরাধিকার, আর ভাষা একটি সামাজিক অর্জন, যা মানুষের মস্তিষ্কের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অভিব্যক্তির পরিমাপ করতে হয় লক্ষ লক্ষ বছরে, লিখিত ইতিহাস শুরুর সময় থেকে মানুষের কোনো পরিমেয় জৈব পরিবর্তন হয়েছে বলে জানা যায় না। কিন্তু অর্জিত প্রগতির পরিমাপ করা যায় কয়েক পুরুষেই। যুক্তিশীল প্রাণী হিসেবে মানুষের সারবস্তু হলো এই যে, পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে তার সম্ভাব্য ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। বলা হয় যে, ৫০০০ বছর আগের পূর্বপুরুষের চেয়ে আধুনিক মানুষের কোনো বৃহত্তর মস্তিষ্ক ও অধিকতর সহজাত চিন্তাশক্তি নেই। কিন্তু, শিক্ষা তথা মধ্যবর্তী প্রজন্মগুলির অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতায় ঢুকিয়ে নেওয়ার ফলে তার চিন্তার কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে গেছে। জীববিজ্ঞানীরা যাকে বাতিল করে দেন, অর্জিত চরিত্রলক্ষণগুলির সেই সঞ্চারণই হলো সামাজিক প্রগতির ভিত্তি। ইতিহাস হলো পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে অর্জিত দক্ষতা সঞ্চারণের মাধ্যমে প্রগতি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এমন ধারণা করার কোনো দরকার নেই, বা করা উচিতও নয় যে প্রগতির সসীম শুরু বা শেষ আছে। এই কিছুদিন আগেও, বছর পঞ্চাশেকও হবে না, একটা বিশ্বাস খুব চালু ছিল যে সভ্যতার আবিস্কার হয়েছিল চার হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দে, নীল নদের অববাহিকায়। যে-কালক্রমে বলা হয়েছে, বিশ্বের সৃষ্টি খ্রী পূ ৪০০৪-এ, তার মতোই ঐ ধারণাটিও আজকাল আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। সভ্যতার জন্মকেই আমরা সম্ভবত আমাদের প্রগতি প্রকল্পের সূচনা-বিন্দু হিসেবে ধরতে পারি। এই সভ্যতা অবশ্যই কোনো উদ্ভাবন নয়; এটি বিকাশের এক অতি মন্থর প্রক্রিয়া যেখানে চমকদার এক লাফে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার ঘটনাও হয়তো ঘটেছে। প্রগতির — বা সভ্যতার — শুরু কখন হয়েছিল সে-প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিব্রত হওয়ার কোনো দরকার নেই। প্রগতির সসীম সমাপ্তির প্রকল্পটি টেনে নিয়ে গেছে আরও গুরুতর ভুল-বোঝার দিকে। প্রুশিয়ার রাজতন্ত্রে প্রগতির সমাপ্তি দেখার জন্যে হেগেলকে সঠিকভাবেই নিন্দা করা হয়েছে। মনে হয়, এ হলো ভবিষ্যদ্‌বাণীর অসম্ভাব্যতা সংক্রান্ত তাঁর মতবাদেরই বেশি-বাড়ানো ব্যাখ্যার ফল। কিন্তু হেগেল-এর বিপথগামিতারও ওপরে যান বিশিষ্ট ভিক্টোরীয়, রাগবি বিদ্যায়তনের (টমাস) আর্নল্ড। ১৮৪১-এ অক্‌স্‌ফোর্ড-এ আধুনিক ইতিহাসের রিজিয়স

অধ্যাপক হিসেবে তিনি মনে করেছিলেন, আধুনিক ইতিহাসই হবে মানবজাতির ইতিহাসের শেষ পর্ব। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'মনে হয়, এতে রয়েছে কালের পরিপূর্ণতার ছাপ, যেন এর পর ভবিষ্যৎ-ইতিহাস থাকবে না।'[১০] মার্কস ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, সর্বহারার বিপ্লবই শ্রেণীহীন সমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দেবে। যুক্তি তথা নৈতিকতার বিচারে কথাটা কম নড়বড়ে। কিন্তু ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে — এই পূর্বানুমানের চতুর্দিকে যে পরিনির্বাণবাদী বলয়, ঐতিহাসিকের চেয়ে ধর্মতত্ত্ববিদকেই তা মানায় বেশি, আর ফিরে যায় ইতিহাস-বহির্ভূত লক্ষ্যের ভুলে। সন্দেহ নেই, মানুষের মনে সসীম সমাপ্তির দিকে একটা টান আছে, কিন্তু অ্যাক্টন ইতিহাসের মহাযাত্রাকে যেভাবে দেখেছিলেন — মুক্তির দিকে এক অসমাপনীয় প্রগতি হিসেবে — তা শীতল ও আবছা বলেই মনে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিককে যদি তাঁর প্রগতির প্রকল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হয় তাহলে, আমার মনে হয়, প্রগতিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করার জন্যে তাঁকে অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে ; সেই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী সব কালপর্বের বিভিন্ন চাহিদা ও শর্ত তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট আধেয় এনে রাখবে। অ্যাক্টন-এর প্রতিপাদ্যের অর্থও এই যে, ইতিহাস শুধু প্রগতির নথিই নয়, তা এক 'প্রগতিশীল বিজ্ঞান', বা, বলতে পারেন, ঘটনাপ্রবাহ তথা ঘটনাবলির নথি — এই দু অর্থেই ইতিহাস প্রগতিশীল। ইতিহাসে স্বাধীনতার অগ্রগতি সম্বন্ধে অ্যাক্টন-এর বর্ণনা স্মরণ করা যাক :

'শক্তির দৌরাত্ম্য তথা বিরামহীন অনাচার রুখতে বাধ্য দুর্বলদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই, চার শ বছর ধরে দ্রুত পরিবর্তন কিন্তু ধীর প্রগতির দ্বারা স্বাধীনতা ব্যাপারটি রক্ষিত, নিশ্চিত, বিস্তৃত ও অবশেষে উপলব্ধ হয়েছে।'[১১]

অ্যাক্টন ভেবেছিলেন, ঘটনাপ্রবাহ হিসেবে ইতিহাস হলো স্বাধীনতার দিকে প্রগতি আর ঐ ঘটনাবলির নথি হিসেবে স্বাধীনতার অর্থ-উপলব্ধি করার দিকে প্রগতি : এই দুই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছিল পাশাপাশি।[১২] দার্শনিক

১০ টি আর্নল্ড, 'আধুনিক ইতিহাস চর্চা বিষয়ে এ টি উদ্বোধনী ভাষণ' (অ্যান ইনঅগুরাল লেকচার অন দ স্টাডি অফ মডার্ন হিস্ট্রি), ১৮৪১, পৃ ৩৮।

১১ অ্যাক্টন, 'আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতামালা', ১৯০৬, পৃ ৫১।

১২ কে মানহাইম, 'ভাবাদর্শ ও কল্পরাজ্য' (ইডিওলজি অ্যান্ড ইউটোপিয়া), ইং অনু ১৯৩৬, পৃ ২৩৬। মানুষের 'ইতিহাসকে রূপ দেওয়ার ইচ্ছা'-র সঙ্গে তিনিও যুক্ত করেছেন 'ইতিহাসকে বুঝতে পারার ক্ষমতা'-কে।

ব্র্যাডলি যে-যুগে লিখতেন, তখনকার কেতাই ছিল বিবর্তনের সঙ্গে তুলনা দেওয়া। তিনি মন্তব্য করেন, 'ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিবর্তনের পরিণতিকে যা ... ইতোমধ্যেই বিবর্তিত সেইরূপে উপস্থিত করা হয়।'[১৩] ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রগতির পরিণতি ইতোমধ্যেই বিবর্তিত হয় নি। এ হলো এমন একটা কিছু যা এখনও অসীম দূরবর্তী; যতই আমরা এঁগিয়ে চলি ততই এর নির্দেশগুলো নজরে পড়ে। এতে তার গুরুত্ব কমে না। দিকনির্ণয় যন্ত্র একটি মূল্যবান ও সত্যিই অপরিহার্য দিশারি। কিন্তু এটি যাত্রাপথের নক্‌শা নয়। ইতিহাসের আধেয়কে বোঝা যেতে পারে কেবল তখনই, যখন তা আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে।

আমার তৃতীয় বক্তব্য হলো, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই কোনোদিন এমন ধরনের প্রগতিতে বিশ্বাস করেন নি, যা অভঙ্গ ঋজুরেখায় এগিয়ে যায়, যার কোনো পশ্চাদ্‌গতি নেই, বিচ্যুতি নেই, ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ নেই, আর তাই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হলেও তা যে বিশ্বাসের পক্ষে অবধারিতভাবেই মারাত্মক হবে — এমন কোনো মানে নেই। স্পষ্টতই, প্রতিগতির পর্ব আছে, আছে প্রগতিরও। উপরন্তু, পশ্চাদপসরণের পর আবার অগ্রসরণের ধারা শুরু হবে একই বিন্দু থেকে অথবা একই রেখা ধরে — এমন মনে করাও হঠকারিতা। হেগেল কিংবা মার্কস-এর চারটি বা তিনটি সভ্যতা, টয়েনবি-র একুশটি সভ্যতা, উত্থান, বিলয় তথা পতনের মাধ্যমে প্রবহমান সভ্যতার জীবন-চক্রের তত্ত্ব — এইসব কাঠামোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু এ সবই হলো এক নিরীক্ষিত তথ্যের লক্ষণ : সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্যে যে-প্রয়াসের প্রয়োজন, তা এক জায়গায় প্রাণ হারায়, অন্যত্র আবার জেগে ওঠে। তাই ইতিহাসে যা কিছু প্রগতি আমরা দেখতে পাই কাল বা স্থানের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। বাস্তবিকই, ইতিহাসের সূত্র তৈরিতে আমার আসক্তি থাকলে, একটা সূত্র হতো এইরকম : কোনো গোষ্ঠী — তাকে শ্রেণী, জাতি, মহাদেশ, সভ্যতা বা যা-ই বলুন না কেন — যেটি কোনো এক পর্বে সভ্যতার অগ্রগতিতে মুখ্য ভূমিকা নেয়, সম্ভবত পরের পর্বে তা অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে না। তার একটা কারণ এই যে, সেই গোষ্ঠীটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের ঐতিহ্য, উদ্দীপনা তথা ভাবাদর্শে এতই আপ্লুত থাকে যে পরবর্তী পর্যায়ের সব চাহিদা

১৩ এফ এইচ ব্র্যাডলি, 'নৈতিক সমীক্ষাবলি' (এথিকাল স্টাডিজ), ১৮৭৬, পৃ ২৯৩।

ও শর্তের সঙ্গে আর নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।[১৪] তাই এমন হতেই পারে যে একটি গোষ্ঠীর কাছে যাকে বিলয়ের পর্ব বলে মনে হয়, অন্যের কাছে তা এক নতুন অগ্রগতির সূচনা। সবারই সমান তথা যুগপৎ প্রগতি — প্রগতির অর্থ কখনোই তা নয় এবং হতেও পারে না। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে আমাদের সমস্ত উত্তরকালীন বিলয়ের প্রবক্তা, আমাদের সন্দেহবাদীরা যাঁরা ইতিহাসে কোনো অর্থই খুঁজে পান না এবং ধরেই নেন যে প্রগতি মরে গেছে, তাঁরা সবাই পৃথিবীর সেই অংশের ও সমাজের সেই শ্রেণীর লোক, যাঁরা সভ্যতার অগ্রগতিতে কয়েক পুরুষ ধরে বিজয়ীর মতো নেতৃস্থানীয় তথা মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। তাঁদের যদি বলা হয়, তাঁদের গোষ্ঠীটি আগে যে-ভূমিকা পালন করেছিল এখন তা অন্যের হাতে চলে গেছে, এ-কথা শুনে তাঁরা কোনো সান্ত্বনা পান না। স্পষ্টতই, যে-ইতিহাস তাঁদের এইরকম নাকাল করেছে তা কখনোই অর্থবহ বা যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া হতে পারে না। কিন্তু, প্রগতির প্রকল্পটিকে যদি মেনে নিতেই হয় তাহলে, আমার মনে হয়, ভঙ্গরেখার শর্তটি অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে।

শেষত, আমি এই প্রশ্নে আসছি যে, ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের নিরিখে প্রগতির সারগত আধেয়টি কী। যাঁরা লড়াই করেন, ধরা যাক, নাগরিক অধিকারের প্রসার, বা প্রচলিত শাস্তিবিধির সংস্কার, বা জাতি- বা সম্পদ-গত বৈষম্য দূর করার জন্যে, তাঁরা সচেতনভাবে ঠিক ঐ জিনিসগুলোই করতে চাইছেন ; তাঁরা সচেতনভাবে প্রগতির চেষ্টা করছেন না, করছেন না কোনো ঐতিহাসিক 'নিয়ম' বা 'প্রকল্প' বা প্রগতির বাস্তব রূপ দিতে। ঐতিহাসিকই সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁদের কাজের ওপর তাঁর প্রগতির প্রকল্পটি চাপিয়েছেন, এবং তাঁদের কাজকর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রগতি বলে। কিন্তু এতে প্রগতির ধারণাটি মিথ্যে হয়ে যায় না। এক্ষেত্রে সার আইজায়া বার্লিন-এর সঙ্গে একমত হতে পেরে আমি আনন্দিত। তিনি বলেছেন, 'প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া শব্দদুটির যতই অপব্যবহার হয়ে থাক না কেন, এগুলি কোনো ফাঁকা ধারণা নয়'[১৫] ইতিহাসের একটি পূর্বানুমান এই

১৪ এই জাতীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য আর এস লিন্ড, 'কিসের জন্য জ্ঞান?' (নলেজ ফর হুইচ?)নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৯, পৃ ৮৮ : 'আমাদের সংস্কৃতিতে প্রধান ব্যক্তিরা প্রায়শই অতীতের — তাঁদের শৌর্য ও ক্ষমতার কালের — অভিমুখী হন, এবং ভীতিকর জ্ঞানে প্রতিরোধ করেন ভবিষ্যৎকে। এমন হতেই পারে যে আপেক্ষিক ক্ষমতা হ্রাস তথা ভাঙনের অগ্রবর্তী পর্যায়ে স্থিত একটা গোটা সংস্কৃতি হয়তো প্রবলভাবে এক লুপ্ত স্বর্ণযুগের অভিমুখী হয়ে রইল, আর বর্তমান জীবন যাপিত হতে থাকল মন্থরভাবে।'

১৫ 'বৈদেশিক বিষয়াদি' (ফরেন অ্যাফেয়ার্স), খণ্ড ২৮, নং ৩, জুন ১৯৫০, পৃ ৩৮২।

যে, মানুষ তার পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে পারে (এমন নয় যে সে অবধারিতভাবেই লাভবান হয়), আর ইতিহাসের প্রগতি ঠিক প্রকৃতির বিবর্তনের মতো নয়, এটি দাঁড়িয়ে আছে সঞ্চিত পরিসম্পদ সঞ্চলনের ওপর। এই পরিসম্পদের মধ্যে পড়ে দুটো জিনিস : অধিকৃত পার্থিব বিষয় এবং নিজ পরিবেশের ওপর প্রভুত্ব ও তাকে রূপান্তর তথা ব্যবহারের ক্ষমতা। আসলে, এই দুটি বিষয়ই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-সংযুক্ত এবং পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল। মার্কস শ্রমকেই গোটা ইমারতের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন ; এবং 'শ্রম' শব্দটিকে যথেষ্ট ব্যাপক অর্থ দিলে এই সূত্রটি গ্রাহ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু শুধু সম্পদ-সঞ্চয় কোনো কাজে আসবে না, যদি-না সেই সঙ্গে তা নিয়ে আসে আরও বেশি পরিমাণে প্রযুক্তি-বিষয়ক জ্ঞান তথা অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপকতর অর্থে পরিবেশের ওপর মানুষের উন্নততর কর্তৃত্বও। প্রগতি হলো বস্তুগত বিত্ত তথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এই দু-এরই সঞ্চয়, প্রযুক্তিগত অর্থে প্রতিবেশের ওপর কর্তৃত্ব — এ ব্যাপারে এখন খুব বেশি লোক প্রশ্ন তুলবেন বলে মনে হয় না। যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় তা হলো : বিংশ শতকে সমাজকে সুবিন্যস্ত করার ব্যাপারে, কিংবা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দিক থেকে সামাজিক পরিবেশের ওপর কর্তৃত্ব অর্জনে আমরা কি এগোতে পেরেছি ? সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিবর্তন কি মারাত্মকভাবে প্রযুক্তির অগ্রগতির পেছনে পড়ে নেই ?

যেসব লক্ষণ থেকে প্রশ্নটি ওঠে সেগুলো স্পষ্ট। তাহলেও আমার সন্দেহ হয়, প্রশ্নটি ভুলভাবে রাখা হচ্ছে। ইতিহাসে এমন অনেক বাঁকের কথা জানা আছে যেখানে নেতৃত্ব ও উদ্যোগ চলে গেছে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে, পৃথিবীর এক ভূ-ভাগ থেকে অন্য ভূ-ভাগে : হাল আমলে এর চোখে-পড়ার মতো উদাহরণ হলো আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে পশ্চিম ইওরোপে ক্ষমতা-কেন্দ্রের স্থানান্তরের পর্ব, এবং ফরাসি বিপ্লবের পর্ব। এ ধরনের পর্ব সর্বদাই উত্তাল ওঠাপড়া আর ক্ষমতার লড়াই-এর কাল। পুরনো কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে যায়, লুপ্ত হয় প্রাচীন দিকচিহ্নগুলি — উচ্চাশা আর অভিমানের তিক্ত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে আবির্ভূত হয় নতুন বিধান। আমি বলতে চাই, এখন আমরা চলেছি তেমনই এক পর্বের মধ্যে দিয়ে। সমাজ-সংগঠনের সমস্যাগুলো বুঝতে পারা বা সেই বোধের আলোয় সমাজকে বিন্যস্ত করার সদিচ্ছায় ঘাটতি পড়েছে বললে সেটাকে আমার একেবারেই অসত্য বলে মনে হয়। আমি একথাই জোর দিয়ে বলব, সেগুলো আসলে প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। এমন নয় যে আমাদের ক্ষমতা কমেছে বা অবনতি ঘটেছে আমাদের নৈতিক গুণাবলির। কিন্তু মহাদেশ, জাতি ও শ্রেণীগুলির মধ্যে শক্তির ভারসাম্যে এধার-ওধার

হওয়ার ফলে আমরা রয়েছি সংঘাত ও উত্তাল ওঠাপড়ার এক পর্বের মধ্যে। ঐসব ক্ষমতা ও গুণাবলির ওপর চাপ প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে এই পর্ব, আর সীমাবদ্ধ ও ব্যাহত করেছে প্রকৃত অভীষ্ট লাভের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকারিতাকে। বিগত পঞ্চাশ বছরে পাশ্চাত্য জগতে প্রগতির ধারণা যে চ্যালেন্জ্-এর মুখোমুখি হয়েছে তার শক্তিকে আমি যেমন খাটো করে দেখতে চাই না, তেমনি আবার ইতিহাসে প্রগতি শেষ হয়ে গেছে — একথা মানতে আমি এখনও রাজি নই। কিন্তু প্রগতির আধেয় নিয়ে আমাকে যদি আরও পেড়াপিড়ি করা হয়, তাহলে আমি মনে করি আমার উত্তরটা হবে খানিকটা এরকম। উনিশ শতকের চিন্তাবিদরা প্রায়শই ইতিহাসের যে নির্দিষ্ট তথা সুস্পষ্টভাবে নির্ণেয় লক্ষ্যের কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই ধারণাটি অপ্রযোজ্য ও নিস্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রগতিতে বিশ্বাস মানে কোনো স্বয়ংক্রিয় ও অনিবার্য প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস নয়, এ হলো মানুষের ভাবী ক্ষমতার ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস। প্রগতি একটি বির্মূত পদ ; এবং মানুষ যে মূর্ত উদ্দেশ্যের সন্ধান করে তা সময়ে-সময়ে জেগে ওঠে ইতিহাসের ধারা থেকেই, তার বাইরের কোনো উৎস থেকে নয়। মানুষ একদিন পরোৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছবে বা ভবিষ্যতে স্বর্গ তৈরি হবে পৃথিবীতেই — এমন কোনো বিশ্বাস আমি রাখি না। পরোৎকর্ষের শেষ সীমা ইতিহাসে অর্জিত হওয়ার নয় — যেসব ধর্মতত্ত্ববিদ ও মরমী জোর দিয়ে একথা বলেন, তাঁদের সঙ্গে এই পর্যন্ত আমি একমত। কিন্তু আমি তুষ্ট থাকব এক সীমাহীন প্রগতি — বা যে-প্রগতির কোনো সীমা দেখা যায় না, বা দেখার কোনো দরকার নেই — তার সম্ভাবনায়, যে-প্রগতি চলেছে এমন লক্ষ্যের দিকে, যার সংজ্ঞার্থ নির্ধাবণ করা যায় শুধু তার দিকে অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে, আর যার সত্যতা নির্ধারণ করা যায় সেটিকে পাওয়ার প্রক্রিয়ায়। আমি জানি না প্রগতি সম্বন্ধে ঐ ধরনের কোনো ধারণা ছাড়া সমাজ কী করে টিঁকে থাকতে পারে। অনাগত প্রজন্মের জন্যে প্রত্যেক সভ্য সমাজই জীবিত প্রজন্মের কাছ থেকে দাবি করে কিছু আত্মত্যাগ। কোনো দৈব উদ্দেশ্যের নামে এই আত্মত্যাগের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার ঐহিক প্রতিরূপই হলো ভবিষ্যতের সুন্দরতর পৃথিবীর নামে এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন। ব্যুরি-র ভাষায়, 'প্রগতির ধারণারই একটি সরাসরি অনুসিদ্ধান্ত হলো উত্তরকালের প্রতি কর্তব্যের নীতি'।[১৬] এই কর্তব্যের সম্ভবত কোনো ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার দরকার পড়ে না। যদি পড়েও, তাহলে তার অন্য কোনো রাস্তা আমার জানা নেই।

১৬ জে বি ব্যুরি,'প্রগতির ধাবণা', ১৯২০, পৃ ৯

এতে করে আমি আবার চলে এলুম ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠার বিখ্যাত খট্‌কায়। এই কথাটাই ভুল পথে নিয়ে যায় ও সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে নেয়। ইতোমধ্যেই আগের একটি বক্তৃতায় আমি দেখিয়েছি যে, সমাজবিজ্ঞানগুলি — যার মধ্যে ইতিহাসও পড়ে — নিজেদেব খাপ খাইয়ে নিতে পারে না সেই জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে যাতে বিষয় ও বিষয়ী ভিন্ন, এবং যা নিরীক্ষক ও নিরীক্ষিত বস্তুর মধ্যে জল-অচল ভাগ চাপিয়ে দেয়। আমাদের প্রয়োজন এক নতুন প্রতিকল্প যাতে এদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়ার জটিল প্রক্রিয়াটির প্রতি সুবিচার করা হয়। ইতিহাসের তথ্যাবলি কখনোই নির্ভেজাল বিষয়নিষ্ঠ হতে পারে না, কেননা ঐতিহাসিক তাদের ওপর তাৎপর্য আরোপ করার সুবাদেই সেগুলো ইতিহাসের ঘটনা হয়ে ওঠে। ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠা — যদি আমাদের এখনও সেই প্রথাগত শব্দটিই ব্যবহার করতে হয় — কখনোই তথ্যের বিষয়নিষ্ঠা হতে পারে না, বরং হতে পারে সম্পর্কের — ঘটনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সম্পর্কের — বিষয়নিষ্ঠা। ইতিহাসের বাইরে, এবং ইতিহাস-নিরপেক্ষ একটি ধ্রুব মূল্যমান খাড়া করে তার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে বিচার করার প্রচেষ্টাকে কেন আমি অনৈতিহাসিক বলে খারিজ করার দিকে গেছি আবার তার সব যুক্তিতে ফিরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। কিন্তু ধ্রুব সত্যের এই ধারণাটি ইতিহাসের জগতে — কিংবা, আমার সন্দেহ হয়, বিজ্ঞানের জগতেও — প্রযোজ্য নয়। সবচেয়ে সহজ ধরনের ঐতিহাসিক বিবৃতিকেই শুধু ধ্রুব সত্য বা পুরোপুরি মিথ্যা বলে রায় দেওয়া যায়। আর একটু পরিশীলিত স্তরে, যে-ঐতিহাসিক, ধরা যাক, পূর্ববর্তী কারও মত খণ্ডন করেছেন, তিনি সাধারণত পুরোপুরি অসত্য বলে এর বিরোধিতা করবেন না। বরং তিনি একে বলবেন অপর্যাপ্ত বা একপেশে বা বিপথদর্শী, বা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গিজাত যা পরবর্তী সাক্ষ্যপ্রমাণের ফলে বাতিল বা অবান্তর বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। রুশ বিপ্লব হয়েছিল দ্বিতীয় নিকোলাস-এর মূর্খামি বা লেনিন-এর প্রতিভার ফলে — এমন বলাটা একেবারেই অপর্যাপ্ত — এতটাই অপর্যাপ্ত যে প্রায় পুরোপুরিই বিপথদর্শী। কিন্তু একে ধ্রুব মিথ্যেও বলা চলে না। ঐতিহাসিক ঐ ধরনের ধ্রুব নিয়ে কারবার করেন না।

আবার ফিরে যাওয়া যাক রবিনসন-এর মৃত্যুর দুঃখজনক ব্যাপারটিতে। ঘটনাটি সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়নিষ্ঠা সঠিক তথ্য পাওয়ার ওপর নির্ভর করে নি — সে নিয়ে কোনো বিরোধই ছিল না — বরং নির্ভর করেছে প্রকৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য (যাতে আমাদের আগ্রহ ছিল) এবং আকস্মিক তথ্য (যা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারতুম) — এ দু-এর মধ্যে তফাত করার ওপর। এই তফাত করা ছিল সহজ, কারণ তাৎপর্যের

মাপকাঠি বা পরীক্ষার উপায়, [অর্থাৎ] আমাদের পরীক্ষার বিষয়নিষ্ঠার ভিত্তি ছিল স্পষ্ট, আর তার মূল কথা ছিল সামনের লক্ষ্যের পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক : রাস্তায় মৃত্যুর সংখ্যা কমানো। কিন্তু যে-তদন্তকারীর সামনে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর মতো সরল ও সীমিত উদ্দেশ্য রয়েছে, ঐতিহাসিক তার চেয়ে কিছুটা কম সৌভাগ্যবান। ব্যাখ্যার কাজে ঐতিহাসিকেরও দরকার পড়ে তাৎপর্যের মাপকাঠি। এটি তাঁর বিষয়নিষ্ঠার মাপকাঠিও বটে। এ দিয়ে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ ও আকস্মিক ঘটনার মধ্যে তফাত করতে পারেন ; এবং তিনিও এটিকে খুঁজে পাবেন কেবল সামনের লক্ষ্যের প্রসঙ্গে। কিন্তু, এই লক্ষ্যও অবধারিতভাবে বিবর্তিত হয়, সেহেতু অতীতের বিবর্তমান ব্যাখ্যাও ইতিহাসের এক অবধারিত কাজ। কোনো স্থির তথা অপরিবর্তনীয়ের নিরিখেই পরিবর্তনকে বিচার করতে হবে — এই প্রথাগত পূর্বধারণা ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। 'পরিবর্তনই', অধ্যাপক বাটারফিল্ড বলেছিলেন, 'ঐতিহাসিকের কাছে একমাত্র ধ্রুবক।'[১৭] সম্ভবত, এখানে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে নিজেকে এমন এক গণ্ডিতে আলাদা করে রেখেছেন, যেখানে অন্য ঐতিহাসিকদের তাঁকে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। ইতিহাসের ধ্রুবক নয় অতীতের কোনোকিছু, যা থেকে আমরা শুরু করতে পারি ; এটি বর্তমানেরও কিছু নয়, কারণ সমস্ত বর্তমান চিন্তাই অবধারিতভাবে আপেক্ষিক। এ হলো এমন কিছু যা এখনও অপূর্ণ এবং হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেই রয়েছে। এটি নিহিত আছে ভবিষ্যতে ; তার দিকে আমরা এগিয়ে চলি, এবং আমরা যেমন এগিয়ে চলি, এটিও তেমনি রূপ পেতে শুরু করে, আর তার আলোতেই, এগিয়ে যেতে যেতে আমরা ক্রমশ গড়ে তুলি আমাদের অতীত-ব্যাখ্যান। 'অন্তিম বিচারের দিন'-ই উদ্‌ঘাটিত হবে ইতিহাসের অর্থ — এই ধর্মীয় প্রতিকথার পেছনে যে ধর্মনিরপেক্ষ সত্য রয়েছে, এ হলো তা-ই। গতকাল, আজ তথা চিরকাল যা একই রয়েছে সেই স্থির অর্থে কোনো ধ্রুবক আমাদের বিচারের মাপকাঠি নয় : এ জাতীয় কোনো ধ্রুবক ইতিহাসের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু অতীত বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যার সম্বন্ধে এ-ই হলো এক

১৭ এইচ বাটারফিল্ড, 'ইতিহাসের হুইগ ভাষ্য', ১৯৩১, পৃ ৫৮। এর সঙ্গে তুলনীয় এ ফন মার্টিন, 'নবজাগরণের সমাজতত্ত্ব' (দ সোসিওলজি অফ দ রেনেসাঁস) ইং অনু, ১৯৪৫, পৃ এক-এ : 'জাড্য ও চলমানতা, স্থিতি ও গতি হলো মৌলিক বর্গ, যা দিয়ে ইতিহাসের সমাজতাত্ত্বিক পরিমার্গের সূত্রপাত। ... ইতিহাস জাড্যকে জানে কেবল আপেক্ষিক অর্থে : চূড়ান্ত প্রশ্নটি হলো জাড্য বা পরিবর্তনের মধ্যে প্রাধান্য কার।' পরিবর্তন ইতিহাসের ধ্রুব ও নির্বিকল্প উপাদান, জাড্য — বিষয়ীগত ও আপেক্ষিক।

ধ্রুবক। প্রতিটি ব্যাখ্যাই অপরটির মতো সঙ্গত, বা প্রতিটি ব্যাখ্যাই তার নিজস্ব দেশ ও কালের মধ্যে সত্য — এই আপেক্ষিকবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে এটি নাকচ করে, আর জুগিয়ে দেয় সেই কষ্টিপাথর যাতে চূড়ান্ত বিচার করা হবে আমাদের অতীত ব্যাখ্যানের। ইতিহাসে একমাত্র এই অভিমুখ-বোধের ফলেই আমরা অতীতের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ — ঐতিহাসিকের যা কাজ — করতে পারি, ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে বর্তমানে মানুষের শক্তিকে মুক্ত ও সংগঠিত — রাষ্ট্রবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারকের যা কাজ — করতে পারি। কিন্তু খোদ প্রক্রিয়াটি প্রগতিশীল ও চলিষ্ণু থেকে যায়। আমরা যতই এগিয়ে চলি, আমাদের অভিমুখ-বোধ ও অতীত-ব্যাখ্যান নিরন্তর পরিমার্জিত ও বিবর্তিত হয়ে চলে।

হেগেল তাঁর পরমকে বিশ্ব-আত্মার অতীন্দ্রিয় রূপের সাজ পরিয়েছিলেন, আর ইতিহাসের ধারাকে ভবিষ্যতের মধ্যে অভিক্ষেপ না-করে, বর্তমানের মধ্যেই এর অবসান ঘটিয়ে এক চরম ভুল করেছিলেন। অতীতের মধ্যে বিবর্তনের এক অবিরত প্রক্রিয়াকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, আর অসঙ্গতভাবে অস্বীকার করেছিলেন ভবিষ্যতে তার অস্তিত্বকে। হেগেল-এর পর থেকে যাঁরাই ইতিহাসের প্রকৃতি নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, তাঁরাই ভেবেছেন, এ হলো অতীত ও ভবিষ্যতের এক সমন্বয় যেমন তোকভিল। তিনি নিজেকে তাঁর সময়কার ধর্মতাত্ত্বিক রচনরীতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেন নি এবং তাঁর পরমটিকে দিয়েছিলেন এক অতি-সঙ্কীর্ণ আধেয়। তা হলেও তিনি বিষয়টির সারকথা বুঝেছিলেন। সাম্যের বিকাশকে একটি সর্বজনীন চিরন্তন ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করার পর তিনি বলেছেন :

'যদি আমাদের সময়ের মানুষকে তাদের ইতিহাসের অতীত ও ভবিষ্যতে সাম্যের ক্রমিক ও বর্ধমান বিকাশ একই সঙ্গে দেখানো যেত, তাহলে এই একটিমাত্র আবিষ্কারই এই বিকাশকে দান করত তাদের প্রভু ও স্বামীর ইচ্ছার পূত চরিত্র।'[১৮]

এখনও অবধি অসমাপ্ত ঐ প্রতিপাদ্যটির ওপর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লেখা যেতে পারে। ভবিষ্যতের অন্তরে তাকানোর ব্যাপারে, হেগেল-এর মনে যেসব বাধা ছিল, তার কয়েকটি ছিল মার্কস-এরও। মার্কস মূলত ব্যাপৃত ছিলেন তাঁর শিক্ষাকে অতীত ইতিহাসের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্যের প্রকৃতি ছিল এমনই যে তিনি তাঁর শ্রেণীহীন

১৮ দ্য তোকভিল, 'আমেরিকায় গণতন্ত্র' (ডেমোক্রেসি ইন আমেরিকা)-এর মুখবন্ধ।

সমাজের পরমসত্তাকে ভবিষ্যতে প্রক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্পষ্টতই, একই উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু কিছুটা অপ্রতিভভাবে, প্রগতির ধারণাটিকে ব্যুরি বর্ণনা করেছেন এই বলে, 'এটি এমন এক তত্ত্ব যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অতীতের সমন্বয় ও অনাগতের ভবিষ্য-কথন'।[১৯] ইচ্ছাকৃতভাবে একটি কূট শব্দবন্ধ ব্যবহার করে এবং পরে যথারীতি প্রচুর উদাহরণসহ তার ব্যাখ্যা করে, নেমিয়ার বলেছেন, ঐতিহাসিকরা, 'কল্পনা করেন অতীতকে ও স্মরণ করেন ভবিষ্যৎকে'।[২০] অতীত-ব্যাখ্যানের চাবিকাঠি দিতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎই ; আর শুধু এই অর্থেই ইতিহাসের চূড়ান্ত বিষয়নিষ্ঠার কথা বলা যায়। অতীত আলোকপাত করে ভবিষ্যতের ওপর ও ভবিষ্যৎ অতীতের ওপর, আব এ-ই হলো একই সঙ্গে ইতিহাসের ন্যায্যতা ও ব্যাখ্যা।

তাহলে যখন আমরা কোনো ঐতিহাসিককে বিষয়নিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রশংসা করি, বা বলি যে কোনো এক ঐতিহাসিক অন্য একজনের চেয়ে বেশি বিষয়নিষ্ঠ, তখন আসলে কী বলতে চাই ? স্পষ্টতই, আমরা শুধু এ-ই বলি না যে তাঁর তথ্যগুলো সঠিক, বরং বলি, তিনি সঠিক তথ্য বেছে নিয়েছেন, বা, অন্যভাবে বললে, তিনি তাৎপর্যের সঠিক মাপকাঠি কাজে লাগিয়েছেন। যখন আমরা কোনো একজন ঐতিহাসিককে বিষয়নিষ্ঠ বলি তখন, আমার মনে হয়, আমবা দুটো জিনিসের কথা ভাবি। প্রথমত, আমরা বোঝাতে চাই যে, সমাজে-ইতিহাসে তাঁর নিজস্ব অবস্থানের সীমিত দৃষ্টি ছাড়িয়ে ওঠার ক্ষমতা তাঁর আছে। এই ক্ষমতা, আগের একটি বক্তৃতাতেই আমি যেমন আভাস দিয়েছি, অংশত নির্ভর করে ঐ পবিস্থিতির সঙ্গে তিনি কতদূর জড়িত সেটা বুঝতে পারার, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়নিষ্ঠা কতটা অসম্ভব সেটা ঠাহব করার ক্ষমতার ওপর। দ্বিতীয়ত, আমরা বোঝাতে চাই যে, নিজের দৃষ্টিকে এমনভাবে ভবিষ্যতে অভিক্ষেপ করার ক্ষমতা তাঁর আছে, যাতে সেই সমস্ত ঐতিহাসিক, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরিভাবেই তাঁদের অব্যবহিত পরিস্থিতি দিয়ে বাঁধা, তাঁদের চেয়ে, অতীতকে দেখার ব্যাপারে, আরও গভীর, আরও স্থায়ী একটি অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তে। আজকের কোনো ঐতিহাসিকই 'চূড়ান্ত ইতিহাস'-এর ভবিতব্য বিষয়ে অ্যাক্টন-এর প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি করবেন না। কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক এমন ইতিহাস লেখেন যা অন্যদের চেয়ে আরও দীর্ঘস্থায়ী, এবং যার চূড়ান্ত ও বিষয়নিষ্ঠ

১৯ জে বি ব্যুরি, 'প্রগতির ধারণা', ১৯২০, পৃ ৫।

২০ এল বি নেমিয়ার, 'সংঘাত' (কনফ্লিক্টস্), ১৯৪২, পৃ ৭০।

চরিত্র আরও বেশি; আর এঁরাই সেই ঐতিহাসিক যাঁদের অতীত তথা ভবিষ্যৎ বিষয়ে সুদূর-দৃষ্টি আছে এমন বলা যায়। ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করার দিকে এগোলে তবেই অতীত-বিষয়ক ঐতিহাসিক পারবেন বিষয়নিষ্ঠার দিকে এগোতে।

আগের একটি বক্তৃতায় ইতিহাস সম্বন্ধে আমি বলেছিলুম, এ হলো অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সংলাপ। তার বদলে আমার বরং বলা উচিত ছিল, এ হলো অতীতের ঘটনাবলি ও ক্রমপ্রকাশ্য ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের মধ্যে সংলাপ। নব নব লক্ষ্যের ক্রমপ্রকাশের সঙ্গে বিবর্তিত হয় ঐতিহাসিকের অতীত-ব্যাখ্যান, তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য নির্বাচন। সবচেয়ে সহজ উদাহরণটিই দেওয়া যাক। যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার সংগঠিত করাকেই মূল লক্ষ্য বলে মনে হতো, ততদিন ঐতিহাসিকরাও অতীতকে ব্যাখ্যা করতেন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক নিরিখে। যখন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের জায়গায় এল আর্থনীতিক ও সামাজিক লক্ষ্য, তখন ঐতিহাসিকরাও শুরু করলেন অতীতের আর্থনীতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যান। এইভাবে চললে, সংশয়ীরা সম্ভবত অভিযোগ করবেন, নতুন ব্যাখ্যানটিও আগেরটির চেয়ে কোনো অংশে বেশি সত্য নয়; প্রতিটি ব্যাখ্যানই তার কালপর্বের ক্ষেত্রে সত্য। তাহলেও, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপৃত থাকার চেয়ে, আর্থনীতিক ও সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপৃত হওয়াটা যেহেতু মানববিকাশের ব্যাপকতর ও অগ্রবর্তী পর্যায়ের সূচক, তাই ইতিহাসের আর্থনীতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যানকে বলা যেতে পারে ইতিহাসের একান্ত রাজনৈতিক ব্যাখ্যানের চেয়ে অগ্রবর্তী পর্যায়ের সূচক। পুরোনো ব্যাখ্যানটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু একই সঙ্গে নতুনটি তাকে অন্তর্ভূত ও অধিক্রান্ত করে। ইতিহাস-রচনা একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান, এই অর্থে যে, এটি কোনো এক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রসরণশীল ও ক্রমগভীরগামী অন্তর্দৃষ্টি জোগান দিতে চায়; যে-ঘটনাপ্রবাহ আবার স্বয়ং প্রগতিশীল। আমাদের চাই 'অতীত সম্পর্কে এক গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি' — এ কথা দিয়ে আমি এটিই বোঝাতে চাইব। প্রগতি সম্পর্কে এই দ্বৈত বিশ্বাস নিয়েই গত দু শতক ধরে গড়ে উঠেছে আধুনিক ইতিহাস-রচনার ধারা; আর সেটি ছাড়া এই তত্ত্ব বাঁচতেও পারে না, কারণ এই বিশ্বাসই জোগায় এর তাৎপর্যের মাপকাঠি, প্রকৃত ও আকস্মিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কষ্টিপাথর। গ্যয়টে তাঁর জীবনের শেষদিকের একটি আলাপে, একটু রূঢ়ভাবেই এক কোপে সব সমস্যার সমাধান করেছিলেন :

'যখন বিলয়ের যুগ সব প্রবণতাই তখন বিষয়ীনিষ্ঠ, কিন্তু অন্যদিকে, এক নতুন যুগের জন্যে যখন সবকিছুই তৈরি হয়ে উঠেছে তখন সব প্রবণতাই বিষয়নিষ্ঠ।'[২১]

ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বা সমাজের ভবিষ্যতে কেউই বিশ্বাস করতে বাধ্য নন। এমন হতেই পারে যে আমাদের সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, বা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে ; আর ইতিহাস আবার ধর্মতত্ত্ব হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ মানুষের অভীষ্ট অর্জনের চর্চা না হয়ে, হয়ে উঠতে পারে দৈব উদ্দেশ্যের চর্চা — কিংবা ইতিহাস সাহিত্যও হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ কোনোরকম উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য ছাড়াই শুনিয়ে যেতে পারে কথা ও কাহিনী। কিন্তু গত ২০০ বছর ধরে আমরা যা জেনে এসেছি, সেই অর্থে তা নিশ্চয়ই ইতিহাস হবে না।

যে-তত্ত্বে ধরা হয়, ঐতিহাসিক কোনো বিচারেব চূড়ান্ত নিয়ামক আছে ভবিষ্যতে, তার বিরুদ্ধে পরিচিত ও প্রচলিত আপত্তির ব্যাপারটি নিয়ে আমি এখনও কোনো আলোচনা করি নি। বলা হয়, ঐ ধরনেব তত্ত্বের নিহিতার্থ হলো এই যে, সাফল্যই বিচারেব চূড়ান্ত নিয়ামক, এবং যা আছে তা যদি না-ও হয়, তাহলেও যা হবে, তা-ই ঠিক। গত ২০০ বছর ধরে অধিকাংশ ঐতিহাসিক শুধু এ-ই ধরে নেন নি যে, ইতিহাস একটা অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে, সচেতন বা অচেতনভাবে তাঁরা এও বিশ্বাস করেছেন যে ঐ দিকটিই হলো মোটের ওপর সঠিক দিক। তাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে মানবজাতি এগোচ্ছে আরও খারাপ থেকে আরও ভালো, আরও নিচু থেকে আরও উঁচুর দিকে। ঐতিহাসিক শুধু ঐ অভিমুখটিকে স্বীকারই করেন নি, অনুমোদনও করেছেন। অতীতকে অনুধাবন করার জন্য তাৎপর্যের যে নির্ণায়ক তিনি প্রয়োগ করেছেন, তা শুধু ইতিহাস যে-ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল সেই অর্থেই নয়, বরং সেই ধারাটির সঙ্গে তিনি নিজে নৈতিকভাবে কতটা জড়িয়ে আছেন সেই অর্থেও। যা 'আছে' ও যা 'হওয়া উচিত' এর মধ্যে, তথ্য ও মূল্যের মধ্যে তথাভিহিত বিভাজনের অবসান হলো। এ ছিল এক আশাবাদী মত, ভবিষ্যতের ওপর অপরিসীম আস্থার যুগেই এর জন্ম, হুইগ ও উদারনীতিবাদী, হেগেলীয় ও মার্কসবাদী, ধর্মতত্ত্ববিদ ও যুক্তিবাদী — সবাই দৃঢ়ভাবে এবং মোটামুটি স্পষ্টভাবেই, এই ধারণার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। বেশি অতিরঞ্জন না করেই বলা যায়, ২০০ বছর ধরে এটাই ছিল 'কাকে বলে ইতিহাস ?' এই প্রশ্নের গৃহীত ও অন্তর্নিহিত উত্তর। এখনকার

২১ জে হুইৎসিঙ্গা, 'মানুষ ও ধারণা' (মেন অ্যান্ড আইডিয়াজ), ১৯৫৯, পৃ ৫০-এ উদ্ধৃত।

আশঙ্কা ও নৈরাশ্যের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গে আসতে শুরু করেছে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। এর ফলে মাঠ ফাঁকা হয়ে গেছে ধর্মতত্ত্ববিদ আর সংশয়ীদের কাছে; প্রথম দল ইতিহাসের অর্থ খোঁজেন ইতিহাসের বাইরে, আর দ্বিতীয় দল ইতিহাসেব কোনো অর্থই খুঁজে পান না। আমরা কিন্তু সব দিক দিয়েই ও খুব জোরালোভাবেই জানি যে, 'আছে' ও 'উচিত'-এর মধ্যে বিভাজন হলো চূড়ান্ত, এর কোনো নিষ্পত্তি করা যায় না, আর 'তথ্য' থেকে কখনও 'মূল্য' পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, এটা ভুল পথ। দেখা যাক, কয়েকজন ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-বিষয়ক লেখক (মোটামুটি এলোপাথাড়ি নির্বাচন করা হলো) প্রশ্নটি নিয়ে কী ভেবেছেন।

গিবন-এর বর্ণনায় ইসলামের বিজয়কে যতটা জায়গা দেওয়া হয়েছে, তার সমর্থনে তিনি কারণ দেখিয়েছেন যে, 'মহম্মদের শিষ্যদের হাতেই এখনও প্রাচ্য জগতের সামাজিক ও ধর্মীয় রাজদণ্ড রয়েছে'। কিন্তু, তিনি আরও বলেছেন যে, 'সপ্তম ও দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে, সাইথিয়ার সমভূমি থেকে যে এক দঙ্গল বর্বব নেমে এসেছিল, তাদের জন্যও একই পরিশ্রম করলে সেটা হবে অপাত্রে অর্পণ', কারণ 'বাইজ়ান্টাইন সিংহাসনের মহিমা এই বিশৃঙ্খল আক্রমণকে প্রতিহত করেই টিকে ছিল'।[২২] কথাটা অযৌক্তিক মনে হয় না। মোটের ওপর, ইতিহাস হলো মানুষ যা করেছে তারই নথিবদ্ধ রূপ, মানুষ যা করতে পারে নি তার নয়। এই অবধি এটি অবশ্যই সফল হওয়ার কাহিনী। অধ্যাপক টনি মন্তব্য করেছেন, 'বিজয়ী শক্তিগুলিকে চোখের সামনে টেনে এনে, এবং যাদের তারা গিলে খেয়েছে তাদের পেছনে ছুঁড়ে ফেলে' ঐতিহাসিকরা বর্তমান কোনো ঘটনাবিন্যাসকে 'অনিবার্যতার রূপ' দিতে চেষ্টা করেন।[২৩] কিন্তু এক অর্থে এটাই কি ঐতিহাসিকের কাজের সারবস্তু নয়? ঐতিহাসিক অবশ্যই বিরোধীপক্ষকে খাটো করে দেখবেন না। যে-জয় অর্জিত হয়েছে অতি অল্পের জন্যে, তাকে তিনি নিশ্চয়ই অনায়াস সাফল্য বলবেন না। যাঁরা বিজিত নন, চূড়ান্ত ফলের ক্ষেত্রে কখনও কখনও তাঁদেরও থাকে বিজয়ীদের মতোই বড় অবদান। এইসব সুপরিচিত আপ্তবাক্য সব ঐতিহাসিকেরই চেনা। কিন্তু, মোটের ওপর, ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন যাঁরা, বিজয়ী বা বিজিত যাই হোন না কেন, কিছু একটা অর্জন করেছেন। আমি ক্রিকেট-ইতিহাসের

২২ গিবন,'রোম সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন', অধ্যায় ৫৫।

২৩ আর এইচ টনি, 'ষোড়শ শতাব্দীর কৃষি সমস্যা' (দ এগ্রারিয়ান প্রবলেম ইন দ সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি), ১৯১২, পৃ ১৭৭।

বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু যাঁরা শূন্য করে দল থেকে বাদ পড়েছেন তাঁদের জায়গায়, মনে হয়, শতরান-করা খেলোয়াড়দের নামই তার পাতায় পাতায় জ্বলজ্বল করছে। হেগেল-এর বিখ্যাত উক্তির — ইতিহাসে 'কেবল সেইসব মানবগোষ্ঠীর ওপরই আমাদের নজর পড়ে যাঁরা রাষ্ট্র গঠন করেন' [২৪] — ন্যায্যতই সমালোচনা করা হয়েছে এই বলে যে, সমাজ-সংগঠনের এক বিশেষ ধরনের ওপর এতে ঐকান্তিক মূল্য আরোপ করা হয়েছে এবং সাফ করে দেওয়া হয়েছে এক উৎকট রাষ্ট্র-ভজনার রাস্তা। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে হেগেল যা বলতে চাইছেন তা তো ঠিকই। এতে প্রাগিতিহাস ও ইতিহাসের পরিচিত পার্থক্যেরই ছায়া পড়েছে। যেসব মানবগোষ্ঠী তাদের সমাজকে সংগঠিত করার ব্যাপারে কিছুটা পরিমাণে সফল হয়, একমাত্র তারাই আর আদিম বন্যগোষ্ঠী থাকে না, তারা পা দেয় ইতিহাসে। কার্লাইল তাঁর 'ফরাসি বিপ্লব' গ্রন্থে পঞ্চদশ লুই-কে বলেছেন, 'মূর্তিমান বিশ্ব-বিপর্যাস'। স্পষ্টতই, এই শব্দবন্ধ ছিল তাঁর পছন্দসই, কারণ পরে, আরও লম্বা একটি অংশে তিনি এই নক্‌শাই বুনেছেন :

'প্রতিষ্ঠান, সমাজ বিন্যাস, ব্যক্তি-মনের এ কী নতুন সার্বজনীন মাথা-ঘোরানো গতি, একদা সেগুলো একযোগে কাজ করত, এখন তারা আবর্তিত হচ্ছে আর চূর্ণ হচ্ছে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ? অনিবার্য ; এ হলো অবশেষে জীর্ণ বিশ্ব-বিপর্যাসের ভাঙন।' [২৫]

আবারও বিচারের মাপকাঠিটি ইতিহাসঘটিত। কোনো এক যুগে যা খাপ খেত, পরবর্তীকালে তা-ই হয়ে উঠল বিপর্যাস, আর সে জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। এমনকি স্যর আইজ়ায়া বার্লিনও যখন দার্শনিক বিমূর্ততার শিখর থেকে নেমে এসে মূর্ত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা ভাবেন, তখন তিনিও, মনে হয়, দেখেন এই দৃষ্টিতেই। 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' বিষয়ে তাঁর রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর এক বেতার-বক্তৃতায় তিনি বিসমার্ক-এর প্রশংসা করেছিলেন এই বলে যে, কিছু নৈতিক খামতি থাকলেও বিসমার্ক ছিলেন 'প্রতিভাবান' এবং 'গত শতকের এক রাজনীতিবিদের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির সর্বোচ্চ ক্ষমতার মহত্তম দৃষ্টান্ত'। আর অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ, রোবস্‌পিয়র, লেনিন ও

২৪ 'ইতিহাসের দর্শন বিষয়ে বক্তৃতামালা' (লেকচারস্‌ অন দ ফিলজ়ফি অফ হিস্ট্রি), ইং অনু ১৮৮৪, পৃ ৪০।

২৫ টি কার্লাইল, 'ফরাসি বিপ্লব', ১, ১ম ভাগ, অধ্যায় ৪ ; ৩য় ভাগ, অধ্যায় ৭।

হিটলার-এর মতো লোক, যাঁরা 'তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে' পৌঁছতে পারেন নি, তাঁদের সঙ্গে প্রতিতুলনা করে তিনি বিসমার্ক-এর অনুকূলেই মত দিয়েছেন। এই বিচারকে আমার উদ্ভট মনে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার যাতে কৌতূহল তা হলো: বিচারের মাপকাঠিটি কী? বিসমার্ক, সার আইজ্যায়া বলেছেন, বুঝতেন তিনি কী নিয়ে কাজ করছেন, অন্যরা ভেসে গিয়েছিলেন বিমূর্ত তত্ত্বের তাড়নায়, সেগুলো কাজে লাগে নি। এর নীতিশিক্ষা হলো: 'ব্যর্থতা আসে যা সবচেয়ে ভালো কাজ করে তাকে প্রতিরোধ করলে. তার বদলে সার্বজনীন বৈধতার দাবিদার কোনো সুসংবদ্ধ পদ্ধতি বা নীতির হয়ে কাজ করলে'।[২৬] অন্য কথায়, ইতিহাসে বিচারের মাপকাঠি হলো 'যা সবচেয়ে ভালো কাজ করে', 'সার্বজনীন বৈধতার দাবিদার কোনো নীতি' নয়।

এ কথা না বললেও চলে যে, শুধু অতীতকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রেই আমরা 'যা সবচেয়ে ভালো কাজ করে' — এই মাপকাঠির শরণ নিই না। যদি কেউ আপনাকে বলেন যে, তিনি মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে, গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে একটি রাষ্ট্রে সংযুক্ত হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, আপনি হয়তো মানতে পারেন যে এটা খুবই সমীচীন মত। যদি তিনি আরও বলেন যে, সরকারের ধরন হিসেবে রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতন্ত্রের চেয়ে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রই কাম্য, তাহলেও আপনি একমত হতে পারেন যে কথাটা বেশ সমীচীন। কিন্তু মনে করুন তারপর তিনি বললেন যে, তিনি ভাবছেন ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনে দুই দেশের পুনর্মিলনের জন্য প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন; মনে হয় আপনি তাঁকে বলবেন, এতে শুধুই তাঁর সময় নষ্ট হবে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে চাইলে আপনাকে বলতে হবে যে, এ ধরনের বিষয় নিয়ে বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রযোজ্য কোনো নীতির ভিত্তিতে এই বিতর্ক হবে না, হবে তার ভিত্তিতে যা কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে পারে। এমনকি আপনি সেই চরম পাপও করে ফেলতে পারেন: ইতিহাসের আগে 'শ্রী' বসিয়ে বললেন, ইতিহাস তাঁর বিপক্ষে। নৈতিক বা তাত্ত্বিকভাবে যা বাঞ্ছনীয় শুধু তার কথা বিবেচনা করাই রাজনীতিবিদের কাজ নয়; তাঁকে ভাবতে হয়: পৃথিবীতে আরও অনেক শক্তি আছে, আর কী করে সেগুলোকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে ও কাজে লাগিয়ে সেই লক্ষ্য হয়তো বা কিছুটা অর্জন করা যায়। আমাদের ইতিহাস-ব্যাখ্যানের

২৬ বি বি সি-র তৃতীয় অনুষ্ঠানে, ১৯ জুন ১৯৫৭-এ 'রাজনৈতিক বিচার' বিষয়ে বেতারভাষণ।

আলোয় আমরা যেসব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিই তার মূল থাকে এই আপসের মধ্যে। কিন্তু আমাদের ইতিহাস-ব্যাখ্যানের মূলও থাকে ঐ একই আপসে। কী হলে ভালো হতো তার একটা কল্পিত বিমূর্ত মান খাড়া করে নিয়ে, তার মাপে অতীতকে খ্যরিজ করার মতো মৌলিক অসত্য আর কিছুই নেই। 'সাফল্য' শব্দটির সঙ্গে যেহেতু খানিকটা ক্ষোভের ভাব এসে গেছে, তার বদলে তাই, 'যা সবচেয়ে ভালো কাজ করে' এই নিরপেক্ষ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা যাক। যেহেতু এই বক্তৃতায় সার আইজ্যায়া বার্লিন-এর সঙ্গে বিতর্কে আমি বেশ কয়েকবার জড়িয়ে পড়েছি, তাই অন্তত এইটুকু একমত হয়ে ব্যাপারটা চুকোতে পেরে খুশিই হলুম।

কিন্তু 'যা সবচেয়ে ভালো কাজ করে' — বিচারেব এই মানদণ্ড যদি মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও এর প্রয়োগ সহজসাধ্য বা স্বতঃস্পষ্ট হয়ে যায় না। এটা এমন কোনো মানদণ্ড নয় যা তাৎক্ষণিক রায় দিতে উৎসাহ দেয়, বা এই মত স্বীকার করে নেয় যে 'যা আছে তা-ই ঠিক'। সম্ভাবনাময় ব্যর্থতার কথা ইতিহাসে অজানা নয়। যাকে বলা যায় 'বিলম্বিত সাফল্য', ইতিহাস তাকেও স্বীকৃত দেয়। এমন দেখা যায়, আগামীদিনের সাফল্যে, আজকের আপাত ব্যর্থতার অতি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে — ভবিষ্যদ্‌দর্শীরা জন্মেছেন তাঁদেব সময়ের আগেই। কোনো কল্পিত অনড় ও সর্বজনীন নীতিব মানদণ্ডের চেয়ে এই মানদণ্ডটিব সত্যিই একটা সুবিধে আছে : এতে আমাদের বায স্থগিত বাখার বা যা এখনও ঘটে নি তার আলোয় রদবদল কবাব প্রয়োজন হতে পাবে। প্রুধোঁ অবাধে বিমূর্ত নৈতিক বিধানের নিরিখে কথা বলতেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর রাষ্ট্রঘাত (ক্যু দেতা) সফল হওয়ার পব তিনি তাঁকে মার্জনা কবেছিলেন। বিমূর্ত নৈতিক বিধানের ধারণাটি খাবিজ করেছিলেন মার্কস, তিনি ঐ মার্জনার জন্য প্রুধোঁকে নিন্দা করেন। আবও দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ফিরে দেখে সম্ভবত আমরা একমত হব যে, প্রুধোঁই ভুল করেছিলেন, মার্কসই ঠিক। ঐতিহাসিক বিচারেব এই সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখার একটি চমৎকার সূচনা-বিন্দু : বিসমার্ক-এর সাফল্য। 'যা সবচেয়ে ভালো কাজ করে' সার আইজ্যায়ার এই মানদণ্ড যদিও আমি মেনে নিচ্ছি, তাহলেও যে সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পমেয়াদি সীমার মধ্যে এটি প্রয়োগ করে তিনি বাহ্যত তুষ্ট, সে নিয়ে আমি এখনও ধন্দে রয়েছি। বিসমার্ক যা তৈরি করেছিলেন তা কি সত্যিই ভালোভাবে কাজ করেছিল ? আমারতো মনে হয়, এটি এক বিরাট বিপর্যয়ের দিকেই নিয়ে গিয়েছিল। তার মানে এই নয় যে, জার্মান রাইখ-এর স্রষ্টা বিসমার্ক, বা যে বিরাট সংখ্যক লোক রাইখ চেয়েছিলেন বা এটি গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের আমি ধিক্কার দিতে চাইছি। কিন্তু ঐতিহাসিক

হিসেবে আমার এখনও বহু জিজ্ঞাসা আছে। গড়নে কোনো গোপন খুঁত থাকার জন্যেই কি পরিণামে ঘটল বিপর্যয়? নাকি যে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এর জন্ম দিয়েছিল, তার মধ্যেই ছিল এমন কিছু যা আত্মবিঘোষী ও আগ্রাসী হওয়াকেই করে তুলেছিল এর বিধিলিপি? নাকি রাইখ-এর যখন জন্ম হচ্ছে, তখন ইওরোপ তথা পৃথিবীতে ইতোমধ্যেই এত ভিড় হয়ে গেছে ও তৎকালীন মুখ্য শক্তিবর্গের মধ্যে সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা হয়ে উঠেছে এতই প্রবল যে আর-একটি সম্প্রসারণবাদী বৃহৎ শক্তির আবির্ভাবই হয়ে উঠল এক প্রধান সংঘর্ষ, তথা গোটা ব্যবস্থাকে ধসিয়ে দেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ? শেষ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে, বিসমার্ক বা জার্মান জনসাধারণকে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা, বা একমাত্র তাঁদেরই দায়ী করাটা ভুল হবে: বোঝার ওপর শেষ শাকের আঁটিকে সত্যিই দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু বিসমার্ক-এর সাফল্য এবং তা কীভাবে কাজ করেছিল সে বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক এখনও বিষয়নিষ্ঠ অভিমত দেন নি। এ সবের কোনো নির্দিষ্ট জবাব দেওয়ার মতো অবস্থায় তিনি আছেন কিনা সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। আমি যা বলতে চাই তা এই যে, ১৮৮০-র দশকের কোনো ঐতিহাসিকের চেয়ে ১৯২০-র দশকের একজন ঐতিহাসিক বিষয়নিষ্ঠ বিচারের আরও কাছাকাছি আছেন, আজকের কোনো ঐতিহাসিক আছেন ১৯২০-র দশকের কোনো ঐতিহাসিকের চেয়ে কাছে এবং ২০০০ সালের কোনো ঐতিহাসিক হয়তো থাকবেন আরও বেশি কাছে। এটিই হলো আমার তত্ত্বের দৃষ্টান্ত। আমার তত্ত্ব ছিল: এখন এখানে বহাল এমন অনড়-অটল কোনো বিচারের মানদণ্ডের ওপর ইতিহাসের বিষয়নিষ্ঠা দাঁড়িয়ে নেই ও থাকতেও পারে না। এটি নির্ভর করে এমন এক মানদণ্ডের ওপর যা ভবিষ্যতের মধ্যে প্রোথিত এবং ইতিহাসের ধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যা বিবর্তিত হয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা সুসংবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে তবেই ইতিহাস অর্থ ও বিষয়নিষ্ঠা লাভ করে।

এবার তথ্য ও মূল্যের মধ্যে এই অপ্রমাণিত বিভাজনের দিকে আর-একবার তাকানো যাক। তথ্য থেকে মূল্য পাওয়া যায় না। এ বক্তব্যের কিছুটা ঠিক কিছুটা ভুল। কোনো এক কালপর্বে বা কোনো দেশে প্রচলিত মূল্য-ব্যবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখলে তবেই বুঝতে পারবেন তার কতটা পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির ছাঁচে গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা, সাম্য বা ন্যায়বিচার ইত্যাদির মতো মূল্যসূচক শব্দের ঐতিহাসিক আধেয় কী রকম পাল্টে যায় সে-বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম আগের একটি বক্তৃতায়। কিংবা বহুলাংশে নৈতিক মূল্যবোধের প্রচারে রত এমন সংস্থার উদাহরণ হিসেবে

খ্রীষ্টীয় ধর্মমণ্ডলীকেই ধরা যাক। প্রতিতুলনা করা যাক আদি খ্রীস্টধর্মের মূল্যবোধের সঙ্গে মধ্যযুগের পোপতন্ত্রের মূল্যবোধ, কিংবা মধ্যযুগের পোপতন্ত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে উনিশ শতকের প্রোটেস্টান্ট ধর্মমণ্ডলীর মূল্যবোধ। কিংবা আজকের দিনে, ধরুন, খ্রীস্টান ধর্মমণ্ডলী যে-মূল্যবোধ প্রচার করে, তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রীস্টান ধর্মমণ্ডলীসমূহের প্রচারিত মূল্যবোধের প্রতিতুলনা করা যাক। মূল্যের এই পার্থক্য উৎসারিত হয় ঐতিহাসিক তথ্যের পার্থক্য থেকে। কিংবা ভাবুন সেইসব ঐতিহাসিক তথ্যের কথা, যার ফলে গত দেড়শ বছর ধরে দাসত্ব বা বর্ণবৈষম্য বা শিশুশ্রম-শোষণ — যেগুলি একসময় নীতিনিরপেক্ষ বা প্রশংসনীয় ছিল — গৃহীত হয়েছে অনৈতিক বলে। তথ্য থেকে মূল্য পাওয়া যায় না — এই প্রতিজ্ঞাবাক্য, খুব কম করে বললেও, একপেশে ও বিপথদর্শী। কিংবা কথাটা উল্টো করে বলা যাক। মূল্য থেকে তথ্য পাওয়া যায় না। কথাটা আংশিকভাবে সত্যি হলেও বিপথদর্শী এবং এরও কিছু রদবদল করা দরকার। তথ্য অনুসন্ধান করার সময়ে আমরা যেসব প্রশ্ন তুলি, আর তাই যেসব উত্তর আমরা পাই, সেগুলোকে প্রবুদ্ধ করে আমাদের মূল্যবোধের ধারা। আমাদের পরিবেশ সম্পর্কিত ছবিটি তৈরি হয় আমাদের মূল্যবোধের ছাঁচে, অর্থাৎ যে সমস্ত পর্যায়ের সাহায্যে আমরা তথ্যের দিকে এগোই তার ছাঁচে ; এবং এই ছবিটি হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য যাকে হিসেবে ধরতে হবে। মূল্যবোধ তথ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেটি তার অপরিহার্য অংশ। মানুষ হিসেবে আমাদের যা কিছু করণকৌশল আছে, আমাদের মূল্যবোধ তারই অপরিহার্য অংশ। আমাদের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের তথা পরিবেশকে আমাদের নিজেদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, ইতিহাসকে যা প্রগতির নথিবদ্ধ রূপ করে তুলেছে, পরিবেশের ওপর প্রভুত্ব অর্জনের সেই ক্ষমতা আমরা লাভ করি আমাদের এই মূল্যবোধের মাধ্যমেই। কিন্তু মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যুদ্ধকে নাটকীয় রূপ দিতে গিয়ে গড়ে তুলবেন না এক ভ্রান্ত বিপক্ষতা এবং তথ্য ও মূল্যের মধ্যে এক ভ্রান্ত বিচ্ছেদ। ইতিহাসে প্রগতি অর্জিত হয় তথ্য ও মূল্যের পরস্পরনির্ভরতা ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। বিষয়নিষ্ঠ ঐতিহাসিক তিনিই, যিনি ঢোকেন এই অন্যোন্য প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গভীরে।

তথ্য ও মূল্য নিয়ে এই সমস্যার একটি সমাধান-সূত্র পাওয়া যায় 'ট্রুথ' (সত্য) শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারের মধ্যে — শব্দটি দাঁড়িয়ে আছে তথ্য ও মূল্য এই দু-জগতেই পা রেখে এবং গড়ে উঠেছে দুই জগতেরই উপাদান নিয়ে। এটা ইংরিজি ভাষার কোনো খেয়ালিপনা নয়। লাতিন ভাষাগোষ্ঠীতে

'ট্রুথ'-এর যত প্রতিশব্দ, জার্মান 'ভাহ্‌রহাইট', রুশ 'প্রাভ্‌দা' [২৭] সব শব্দেরই এই দ্বৈত চরিত্র আছে। প্রত্যেক ভাষাতেই, মনে হয়, এই শব্দটির দরকার হয় এমন এক সত্যের জন্য যা নিছক তথ্যের বিবৃতি নয়, আবার নিছক মূল্যবিচারও নয়, কিন্তু যার মধ্যে আছে দুটি উপাদানই। গত সপ্তাহে আমি লন্ডন গিয়েছিলাম — এটা একটা তথ্য হতে পারে। কিন্তু সাধারণত এটাকে কেউ সত্য বলবেন না: এর মধ্যে কোনো মূল্যসূচক সারবস্তু নেই। অপরপক্ষে, সমস্ত মানুষই সমানভাবে সৃষ্ট — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতৃ-পিতারা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এই স্বতঃপ্রকাশ সত্যের উল্লেখ করেছেন। এটি সম্বন্ধে যে-কারওই মনে হতে পারে যে, এই বিবৃতিতে মূল্য-সূচক সারবস্তু তথ্যসূচক সারবস্তুর চেয়ে বেশি এবং সেই ভিত্তিতে এর সত্য বলে গণ্য হওয়ার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারেন। উত্তর মেরুতে মূল্যবোধহীন তথ্য আর দক্ষিণ মেরুতে মূল্য-বিচার, যা এখনও নিজেকে তথ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে — এই দুই মেরুর মাঝখানে কোনো এক জায়গায় রয়েছে ঐতিহাসিক সত্যের জগৎ। আমি আমার প্রথম বক্তৃতায় যেমন বলেছি, ঐতিহাসিক সুস্থিত হয়ে আছেন তথ্য ও ব্যাখ্যার, তথ্য ও মূল্যবোধের মাঝামাঝি এক জায়গায়। তিনি এদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। হতে পারে যে, কোনো অপরিবর্তনশীল জগতে তথ্য ও মূল্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো অপরিবর্তনশীল জগতে ইতিহাসের কোনো অর্থ নেই। ইতিহাসের সারমর্মই হলো পরিবর্তন, গতি, বা — পুরনো কেতার শব্দটি নিয়ে যদি আপত্তি না তোলেন — প্রগতি।

সুতরাং শেষ করার আগে আমি ফিরে যাচ্ছি প্রগতি সম্বন্ধে অ্যাক্টন-এর সেই বর্ণনায়, 'একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প যার ওপরে ইতিহাস লেখা হবে'। ইতিহাস-বহির্ভূত ও অতি-যৌক্তিক কোনো শক্তির ওপর অতীতের অর্থকে নির্ভরশীল করে, আপনি ইচ্ছে করলে ইতিহাসকে পরিণত করতে পারেন ধর্মতত্ত্বে। ইচ্ছে করলে আপনি তাকে সাহিত্যেও পরিণত করতে পারেন — তা হবে অতীত সম্বন্ধে অর্থ বা তাৎপর্য-হীন কিছু কথা ও কাহিনীর সংগ্রহ। প্রকৃত অর্থে যাকে ইতিহাস বলা হয়, তা লিখতে পারেন একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা ইতিহাসের মধ্যেই একটা অভিমুখের ভাব খুঁজে

২৭ 'প্রাভ্‌দা'-র বিষয়টি বিশেষভাবে চিত্তকর্ষক, কারণ সত্য-র আরেকটি প্রাচীন রুশ প্রতিবাদ আছে, 'ইস্তিনা'। কিন্তু পার্থক্যটা ঘটনার দিকে থেকে সত্য তথা মূল্যের দিক থেকে সত্যের মধ্যে নয়। 'প্রাভ্‌দা' হলো দু অর্থেই মানবিক সত্য, আর 'ইস্তিনা' দু অর্থেই দৈব সত্য — ঈশ্বর বিষয়ক সত্য ও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট সত্য।

পেয়েছেন ও তাকে মেনে নিয়েছেন। 'আমরা কোনো-এক জায়গা থেকে এসেছি' — এই বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে 'আমরা কোনো-এক জায়গায় চলেছি' — এই বিশ্বাস। ভবিষ্যতে তার এগিয়ে চলার ক্ষমতা আছে — এই বিশ্বাস যে-সমাজ হারিয়েছে, তা অচিরেই তার অতীতের প্রগতি নিয়েও আর ভাবনা-চিন্তা করবে না। প্রথম বক্তৃতার শুরুতেই আমি বলেছি, সমাজ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এবার, ভবিষ্যতের সমাজ ও ভবিষ্যতের ইতিহাসের ওপর আমার আস্থার কথা ঘোষণা করে, যে-জায়গা থেকে আমি শুরু করেছিলুম, এবার সেখানেই ফিরে আসি।

প্রসার্যমাণ দিগন্ত

আমার এই বক্তৃতামালায় আমি একটি ধারণার কথা বলেছি। তা হলো : ইতিহাস একটি সতত গতিশীল প্রক্রিয়া, এবং ঐতিহাসিকও তার সঙ্গে এগিয়ে চলেন। এ কথা বলায়, মনে হয়, আমাদের সময়ের ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের বিষয়ে উপসংহারস্বরূপ কিছু মন্তব্য করার ব্যাপারে আমার একটা দায় থাকে। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন — ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটছে না — বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বিশ্ব-বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী আর সবার (বুকের) ওপর তা পাষাণভার হয়ে চেপে বসেছে। কথাগুলো প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যা-ই হোক, একদিন যে আমাদের মৃত্যু হবে — এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর চেয়ে এটা অনেক কম নিশ্চিত। আর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর নিশ্চয়তা সত্ত্বেও, আমরা যেহেতু আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করি, তাই আমাদের সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমিও আলোচনা করব — এটা ধরে নিয়ে যে, এই দেশ — কিংবা এই দেশ না হলেও এই পৃথিবীর কোনো এক বড় অংশ — সেই ভয়-দেখানো দুর্বিপাকের পরেও টিকে থাকবে, আর ইতিহাসে বিরতি ঘটবে না।

পনেরো ও ষোলো শতকে মধ্যযুগের পৃথিবী ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল, আর স্থাপিত হয়েছিল আধুনিক পৃথিবীর ভিত্তি। বিশ শতকের মাঝামাঝি পৃথিবী সম্ভবত এমন এক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে, যা আগের এই পরিবর্তনের চেয়ে আরও গভীর ও বিস্তৃত। নিঃসন্দেহে, চূড়ান্ত বিচারে এই পরিবর্তন হলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, ক্রমশই তার আরও ব্যাপক প্রয়োগ, এবং তা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভূত উন্নয়নেরই পরিণতি। এই পরিবর্তনের সর্বাধিক লক্ষণীয় দিক হলো এক সমাজ-বিপ্লব, যা পনেরো ও ষোলো শতকের ঐ বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। সেই বিপ্লবের ফলে অর্থ বিনিয়োগ ও বাণিজ্য-নির্ভর, এবং পরবর্তীকালে শিল্পনির্ভর এক নতুন শ্রেণীর ক্ষমতার উত্থান শুরু হয়েছিল। আমাদের শিল্পের নতুন গড়ন তথা সমাজের নতুন গড়ন অনেক বড় বড় সমস্যা হাজির করেছে। এখানে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে না, কিন্তু এই পরিবর্তনের দুটো দিক আছে, যা আমার বিষয়ের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক — এর একটাকে আমি বলতে পারি

গভীরতার পরিবর্তন, আর একটা হলো ভৌগোলিক বিস্তারের পরিবর্তন। এই দুটি বিষয়ই আমি কিছুটা ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

ইতিহাস শুরু হয় তখনই, যখন মানুষ সময়ের প্রবহমানতা সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার — যেমন ঋতুচক্র, মানুষের জীবন-চক্র ইত্যাদির — নিরিখে নয়, বরং ধারাবাহিক কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার নিরিখে, যেসব ঘটনার সঙ্গে সে সচেতনভাবে জড়িত এবং যেগুলোকে সে সচেতনভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ইতিহাস. বুর্কহার্ট বলেছেন, 'চেতনার জাগরণের কারণে প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ'।[1] ইতিহাস হলো যুক্তি প্রয়োগ করে পরিবেশকে বোঝা এবং সেইমতো কাজ করার জন্যে মানুষের এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষের এই সংগ্রামের বিস্তার ঘটেছে এক বৈপ্লবিক পথে। মানুষ এখন আর শুধু পরিবেশকে বুঝতে বা প্রভাবিত করতেই চায় না, নিজের ক্ষেত্রেও করতে চায় সেই জিনিসই; এবং এর দরুনই যুক্ত হয়েছে, বলা যেতে পারে, যুক্তির এক নতুন মাত্রা, তথা ইতিহাসের এক নতুন মাত্রা। সমস্ত যুগের মধ্যে আধুনিক যুগই হলো সবচেয়ে ইতিহাসমনস্ক। আধুনিক মানুষ অভূতপূর্ব পরিমাণে আত্মসচেতন, আর তাই ইতিহাস-সচেতনও। ফেলে-আসা গোধূলির দিকে সে আগ্রহভরে ফিরে তাকায়; এই আশায় যে, সেই ক্ষীণ আলোর রেখা দূর করবে তার সামনের অস্পষ্টতা আবার উল্টোদিকে, সামনের পথ সম্বন্ধে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পেছনের পথ বিষয়ে তার অন্তর্দৃষ্টিকে করে তীক্ষ্ণ। ইতিহাসের অন্তহীন শৃঙ্খলে গাঁথা আছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

আধুনিক পৃথিবীর পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে নিজের সম্বন্ধে মানুষের চেতনার বিকাশ। বলা যায় দেকার্ত থেকেই এর সূচনা। মানুষ শুধু চিন্তাই করে না, নিজের চিন্তা সম্বন্ধেও চিন্তা করে, প্রত্যক্ষ করে নিজের প্রত্যক্ষণকে। সুতরাং মানুষ যুগপৎ চিন্তা ও প্রত্যক্ষণের বিষয় ও বিষয়ী। মানুষের এই অবস্থান প্রমাণ করেন দেকার্ত-ই। কিন্তু আঠেরো শতকের শেষভাগ অবধি এই বিকাশ পুরোপুরি প্রকট হয়ে ওঠে নি। ঐ সময়ে রুশো উন্মোচন করেন মানুষের আত্মবোধ তথা আত্মচেতনার অনেক নতুন গহন তল, এবং মানুষকে তিনি দেন প্রকৃতির জগৎ ও পরম্পরাগত সভ্যতা সম্বন্ধে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। দ্য তোকভিল বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণা ছিল 'এই বিশ্বাস যে, যা চাওয়া হচ্ছে তা হলো: পুরনো সমাজব্যবস্থাকে শাসন করছে যে জটিল ঐতিহ্যবাহী প্রথা, তার বদলে আসবে মানুষের

১ জে বুর্কহার্ট, 'ইতিহাস ভাবনা' (রিফ্লেকশনস্ অন হিস্ট্রি), ১৯৫৯, পৃ ৩১।

বুদ্ধির প্রয়োগ ও প্রাকৃতিক বিধানজাত সরল প্রাথমিক নিয়মাবলি'।[২] 'তার আগে কখনোই', অ্যাক্টন তাঁর একটি খসড়া মন্তব্যে লিখেছেন, 'মানুষ কী খুঁজছে তা জেনে স্বাধীনতা খোঁজে নি।'[৩] কারণ, হেগেল-এর মতোই, অ্যাক্টন-এর কাছেও স্বাধীনতা আর যুক্তি কখনোই পরস্পর থেকে খুব দূরে ছিল না। আর ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিল মার্কিন বিপ্লব।

'চার কুড়ি সাত বছর আগে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই মহাদেশে নিয়ে এসেছিলেন এক নতুন জাতি, যার জন্ম হয়েছিল স্বাধীনভাবে এবং যা উৎসর্গিত ছিল এই ধারণার প্রতি যে সব মানুষের সৃষ্টিই হয়েছে সমানভাবে।'

লিঙ্কন-এর এই কথাগুলো থেকে মনে হয় যে, ঘটনাটি ছিল অনন্য — ইতিহাসের প্রথম এক উপলক্ষ্য, যখন মানুষ স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে নিজেদের জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছে, এবং সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় অন্য মানুষদের গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সেই ছাঁচে। সতেরো ও আঠেরো শতকে মানুষ ইতোমধ্যেই তার পরিপার্শ্বের জগৎ ও তার নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছে। সেগুলো আর পরীক্ষার অতীত কোনো রহস্যময় দৈব বিধান নয়, বরং যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ম; তবুও, এমন নিয়ম মানুষ যার অধীন, সেগুলো তার নিজের তৈরি নিয়ম নয়। পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠবে তার পারিবেশ তথা নিজের ওপর তার ক্ষমতা সম্পর্কে, এবং সেই নিয়ম সম্পর্কে, যার অধীনে সে জীবন কাটাবে।

আঠেরো শতক থেকে আধুনিক পৃথিবীতে উত্তরণ ঘটেছে দীর্ঘকাল ধরে, ধীরে ধীরে। এর প্রতিনিধি-স্থানীয় দার্শনিক হলেন হেগেল ও মার্কস। এঁদের দুজনের অবস্থানই উভচারী। দৈবের নিয়মই পরিবর্তিত হয়েছে যুক্তির নিয়মে — হেগেল এই ধারণায় স্থিত। হেগেল-এর বিশ্ব-আত্মা একহাতে আঁকড়ে ধরে আছে দৈবকে, অন্য হাতে যুক্তিকে। তিনি অ্যাডাম স্মিথ-এরই প্রতিধ্বনি করেন। লোকে 'তাদের নিজেদের স্বার্থই চরিতার্থ করে; কিন্তু এতে আরও বেশি কিছু সাধিত হয়, যা তাদের চেতনায় অনুপস্থিত হলেও, কাজের মধ্যে নিহিত আছে'। বিশ্ব-আত্মার যৌক্তিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখছেন যে, মানুষ 'একে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমেই এটিকে তাদের বাসনা চরিতার্থ করার উপলক্ষ্য করে তোলে, যার তাৎপর্য ঐ উদ্দেশ্য থেকে পৃথক'। সোজা কথায়, স্বার্থের সঙ্গতিকে জার্মান দর্শনের ভাষায় অনুবাদ

২　এ দ্য তোকভিল, 'প্রাচীন যুগ' (দ্য ল্যাঁসে রেজিম), খণ্ড ৩, অধ্যায় ১।

৩　কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার: অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ৪৮৭০।

করলে এ-ই দাঁড়ায়।[৪] স্মিথ-এর 'লুকোনো হাত'-এর হেগেলীয় সমার্থশব্দ হলো বিখ্যাত 'যুক্তির ধূর্ততা', যা মানুষকে এমন কাজে নিয়োগ করে যার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে নিজেই সচেতন নয়। এ সত্ত্বেও হেগেল হচ্ছেন ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক। তিনিই প্রথম দার্শনিক, যিনি ঐতিহাসিক পালাবদল তথা মানুষের আত্মসচেতনতার বিকাশের মধ্যে দেখেছিলেন বাস্তবতার সারবস্তু। ইতিহাসে বিকাশ কথাটার অর্থ স্বাধীনতার ধারণাটির দিকে বিকশিত হওয়া। কিন্তু ১৮১৫-র পর ফরাসি বিপ্লবের উদ্দীপনা বিলীন হয়ে গেল রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ডামাডোলে। হেগেল ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ভীতু, এবং জীবনের শেষদিকে তাঁর সময়কার প্রতিষ্ঠান (এস্টাবলিশমেন্ট)-এর এতই গভীরে ঢুকে পড়েছিলেন যে তাঁর আধিদৈবিক উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনো মূর্ত অর্থ সঞ্চার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'বিপ্লবের বীজগণিত', হেগেল-এর নীতিগুলি সম্বন্ধে হের্ৎসেন-এর এই বর্ণনা একান্তই যথার্থ। হেগেল চিহ্নগুলি দিয়েছিলেন, কিন্তু দেন নি এর কোনো ব্যবহারিক আধেয়। বীজগণিতের সমীকরণগুলোকে পাটিগণিতে লেখার দায়িত্বটা পড়ে থাকল মার্কস-এর জন্যে।

মার্কস ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ ও হেগেল দুজনেরই শিষ্য। তিনি শুরু করেছিলেন এই ধারণা থেকে যে, জগৎ প্রকৃতির যৌক্তিক নিয়মাবলি দিয়েই বিন্যস্ত। হেগেল-এর মতোই, কিন্তু এইবার আরও বাস্তবসম্মত ও মূর্ত চেহারায় তিনি ধারণাটির উত্তরণ ঘটান অন্য এক জগতে। এ-জগৎ মেনে চলে সেই নিয়মকানুন, যা মানুষের বৈপ্লবিক উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এক যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়ে এসেছে। মার্কস-এর অন্তিম সমন্বয়ে ইতিহাস বলতে তিনটি জিনিস বোঝায়। মিলিতভাবে তারা গড়ে তোলে এক সুসংহত যুক্তিসিদ্ধ অখণ্ডতা। সেগুলি হলো: বিষয়নিষ্ঠ, তথা প্রাথমিকভাবে আর্থনীতিক, নিয়ম অনুযায়ী ঘটনার গতিপ্রবাহ ; একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুরূপ চিন্তার বিকাশ ; এবং তার অনুরূপ ক্রিয়া, যার রূপ হলো শ্রেণীসংগ্রাম, যা বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে সমন্বিত ও একত্র করে। মার্কস যা দেন তা হলো বিষয়নিষ্ঠ নিয়ম ও সেগুলোকে প্রয়োগে পরিণত করার সচেতন প্রয়াসের মধ্যে এক সমন্বয়, যাকে আমরা কখনও কখনও বলি (যদিও বিপথদর্শীভাবে) নির্ধারণবাদ অথবা স্বেচ্ছাবৃত্তিবাদ। মার্কস সেইসব নিয়মের কথাই অবিরাম লিখে গেছেন যার অধীনে থাকলেও মানুষ এতদিন সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। যাকে তিনি বলতেন পুঁজিবাদী

৪ উদ্ধৃতিগুলি হেগেল-এর 'ইতিহাসের দর্শন' (ফিলজফি অফ হিস্ট্রি) থেকে নেওয়া।

অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সমাজের নাগপাশে বদ্ধ মানুষের 'ভ্রান্ত চেতনা', তার দিকে মার্কস একাধিকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: 'উৎপাদন ও সঞ্চালনের প্রতিনিধিদের মনে উৎপাদনের নিয়ম সম্বন্ধে যে-ধারণা তৈরি হবে, তার সঙ্গে বাস্তব নিয়মের থাকবে বিস্তর ফারাক।'[৫] কিন্তু সচেতন বিপ্লবকর্মের জন্য আহ্বানের জাজ্বল্যমান উদাহরণ মার্কস-এর লেখায় পাওয়া যায়। 'দার্শনিকরা নানাভাবে বিশ্বকে শুধু ব্যাখ্যাই করেছেন', ফয়েরবাখ-এর ওপর তাঁর বিখ্যাত থিসিস-এ বলা হয়েছে; 'কিন্তু আসল কথা হলো তাকে বদলানো।' 'প্রোলেতারিয়েত', ঘোষণা করা হয়েছে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ, 'তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে, ধীরে ধীরে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমস্ত মূলধন কেড়ে নেবে, এবং সমস্ত উৎপাদনের উপকরণকে কেন্দ্রীভূত করবে রাষ্ট্রের হাতে।' আর 'লুই বোনাপার্ত-এর আঠেরোই ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস বলেছেন, 'বুদ্ধিগত আত্মসচেতনতা একটি শতাব্দী-প্রাচীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত পরম্পরাগত ধ্যানধারণা লুপ্ত করে দিল।' পুঁজিবাদী সমাজের ভ্রান্ত চেতনাকে লুপ্ত করবে এবং শ্রেণীহীন সমাজের প্রকৃত চৈতন্যের প্রবর্তন করবে প্রোলেতারিয়েত। কিন্তু মার্কস যখন লিখতে শুরু করেন, তখন যেসব বিকাশকে মনে হয়েছিল অত্যাসন্ন, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলে তা গুরুতর ও নাটকীয়ভাবে পিছু হটল। উনিশ শতকের শেষ অংশটুকু অতিবাহিত হলো এমন এক বাতাবরণে যেখানে সচ্ছলতা আর নিরাপত্তাই প্রধান। শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে ইতিহাসের সাম্প্রতিক পর্বে আমাদের উত্তরণ সমাপ্ত হয় নি। এই পর্বে যেসব বিষয়নিষ্ঠ নিয়ম সমাজে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি অনুধাবন করাই যুক্তির প্রাথমিক ভূমিকা রইল না। বরং তার কাজ হলো সচেতন ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ, ও যেসব ব্যক্তিকে নিয়ে সেই সমাজ তৈরি তাদের নতুন রূপ দেওয়া। মার্কস-এর লেখায় 'শ্রেণী'র কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ না থাকলেও, মোটের ওপর এটি একটি বিষয়নিষ্ঠ ধারণা, আর্থনীতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লেনিন-এর বেলায় 'শ্রেণী'র বদলে জোর গিয়ে পড়ল 'দল'-এর ওপর। শ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশকে নিয়ে তৈরি হবে দল, আর শ্রেণীর মধ্যে তা প্রবুদ্ধ করবে শ্রেণী-চেতনার উপাদান। মার্কস-এর কাছে 'ভাবাদর্শ' শব্দটি নেতিবাচক — পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ভ্রান্ত চেতনা। লেনিন-এর লেখায় 'ভাবাদর্শ' হয়ে ওঠে নিরপেক্ষ বা ইতিবাচক — শ্রেণী-সচেতন নেতাদের এক শিরোমণি-অংশ (এলিট)

৫ 'পুঁজি' (ক্যাপিটাল), খণ্ড ৩, ইং অনু ১৯০৯, পৃ ৩৬৯।

যে-বিশ্বাস রোপণ করবেন সম্ভাব্য শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক-জনতার মধ্যে। শ্রেণী-চেতনার রূপায়ণ আর কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া রইল না, হয়ে উঠল এক কর্তব্যকর্ম।

ফ্রয়েড হলেন আমাদের সময়ের আর এক মহান চিন্তাবিদ, যিনি যুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আজ অবধি ফ্রয়েড কিছুটা প্রহেলিকাই রয়ে গেলেন। শিক্ষা ও পরিবেশগতভাবে তিনি ছিলেন উনিশ শতকের এক উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং তিনিও বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছিলেন সেই সুপ্রচলিত কিন্তু বিপথদর্শী ধারণা যে. ব্যক্তি তথা সমাজের মধ্যে আছে এক মৌলিক বিপক্ষতা। সামাজিক সত্তা হিসেবে না-দেখে তিনি বরং মানুষকে বুঝতে চাইছিলেন জৈব সত্তা হিসেবে। তাই তিনি এ কথা ভাবেন নি যে সামাজিক বাতাবরণ এমন এক নিরন্তর প্রক্রিয়া মানুষই যাকে ক্রমাগত সৃষ্টি ও রূপান্তরিত করছে। এটিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রদত্ত বলে গণ্য করার প্রবণতাই তাঁর ছিল। যেগুলি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সমস্যা সেগুলিকে তিনি ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলে, মার্কসবাদীরা সর্বদাই তাঁকে আক্রমণ করেছেন. এবং ধিক্কার দিয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীল বলে। স্বয়ং ফ্রয়েড এর ক্ষেত্রে এই অভিযোগ অংশত সত্য, কিন্তু একে আরও বেশি যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নব্য-ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন যে অভিযোজনের অভাব ব্যক্তির মধ্যেই অন্তর্নিহিত, সমাজ-কাঠামোর মধ্যে নয়. এবং মনোবিদ্যার সার ভূমিকা হলো সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অভিযোজন করানো। ফ্রয়েড-এর বিরুদ্ধে আর-একটি চলতি অভিযোগও পুরোপুরি ভিত্তিহীন যে, তিনি মানুষের কাজকর্মে অযুক্তির ভূমিকাকে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। মানুষের আচরণে অযুক্তির ভূমিকা ও অযুক্তি ভজনা — এ দুটিকে আলাদাভাবে চিনতে পাবার ক্ষেত্রে মোটাদাগের বিভ্রান্তিই হলো এই অভিযোগের ভিত্তি। একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে আজকের ইংরিজি-ভাষী দুনিয়ায় অযুক্তি-ভজনা বহাল আছে, এবং মূলত তার রূপ হলো যুক্তির কর্তৃত্ব তথা সম্ভাব্য ক্ষমতাকে খাটো করা। এ হলো নৈরাশ্যবাদ ও অতি-রক্ষণশীলতার সাম্প্রতিক প্রবাহেরই একটা অংশ। এ বিষয়ে আমি পরে বলব। কিন্তু এর সূচনা ফ্রয়েড থেকে নয়। তিনি ছিলেন শর্তান্তরহীন ও কিছুটা প্রাথমিক পর্যায়ের যুক্তিবাদী। আসলে, সচেতনতা, তথা যৌক্তিক অনুসন্ধানের কাছে মানুষের আচরণের অচেতন শিকড়গুলি খুলে ধরে, ফ্রয়েড আমাদের জ্ঞান ও বোধের পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন। এ হলো যুক্তির দুনিয়ার বিস্তার; মানুষের নিজেকে, আর সেই কারণেই তার পরিবেশকে অনুধাবন ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বাড়ে; এবং এটি এক বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল কৃতিত্বই

উপস্থিত করে। এ দিক থেকে ফ্রয়েড মার্কস-এর কাজই পরিপূরণ করেন, বিরোধিতা করেন না। যদিও ফ্রয়েড নিজে এক অনড় ও অপরিবর্তনীয় মানব-স্বভাবের ধারণা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেন নি, তবুও তিনি সমসাময়িক পৃথিবীরই লোক, এই অর্থে যে, মানুষের আচরণের মূলকে কীভাবে আরও গভীরে গিয়ে অনুধাবন করা যায়, আর এইভাবে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে তার রদবদল করা যায় — তার উপকরণগুলি তিনিই জোগান দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকের কাছে ফ্রয়েড-এর বিশেষ তাৎপর্য দু ধরনের। প্রথমত, মানুষ যে-অভিপ্রেরণা থেকে কাজ করছে বলে দাবি করে বা নিজেই বিশ্বাস করে, তার কাজকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বস্তুত তা-ই যথেষ্ট — ফ্রয়েড এই প্রাচীন বিভ্রমের অন্ত্যেষ্টি করে দিয়েছেন। এটি কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ এক নঞর্থক কৃতিত্ব। অবশ্য, ঐতিহাসিক মহামানবদের আচরণের মনোবিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে আলোকপাত করার ব্যাপারে কোনো কোনো উৎসাহীর সদর্থক দাবিকেও খানিকটা ছেঁটে-কেটেই ধরা উচিত। মনোবিশ্লেষণ-পদ্ধতি নির্ভর করে যে-রোগীকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তাকে জেরা করার ওপর : মৃতকে তো আর জেরা করতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েড ঐতিহাসিককে উৎসাহ দিয়েছেন মার্কস-এর কাজকেই আরও পোক্ত করে নিজেকে পরীক্ষা করা এবং ইতিহাসে নিজের অবস্থান পরীক্ষা করার ব্যাপারে; ঐতিহাসিকের অভিপ্রেরণা — হয়তো-বা গহন অভিপ্রেরণা — যা তাঁকে চালিত করেছে তাঁর বিষয় ও কালপর্ব বেছে নেওয়ায় এবং তথ্য নির্বাচন ও ব্যাখ্যায়, যে জাতীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তাঁর দৃষ্টিকোণ স্থির করেছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর যে-ধারণা গড়ে দিয়েছে তাঁর অতীত-সম্বন্ধীয় ধারণা — এ সবই পরীক্ষা করার ব্যাপারে। নিজেকে সমাজ ও ইতিহাস-বহির্ভূত এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করবেন — এমন ওজর, মার্কস ও ফ্রয়েড-এর লেখার পর থেকে, কোনো ঐতিহাসিকেরই আর থাকে না। এ হলো আত্মসচেতনতার যুগ : ঐতিহাসিক কী করছেন সেটা তিনি জানতে পারেন ও তাঁর জানা উচিত।

আমি যাকে বলেছি সমসাময়িক পৃথিবী, তাতে রূপান্তর — নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র এবং যুক্তির ভূমিকা ও ক্ষমতার বিস্তার — এখনও শেষ হয় নি : বিশ শতকের পৃথিবী যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এটি তারই এক অংশ। এই রূপান্তরের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ আমি খতিয়ে দেখতে চাই।

শুরু করা যাক অর্থনীতি দিয়েই। ১৯১৪ অবধি বিশ্বাস করা হতো যে অর্থনীতির নিয়মগুলি বিষয়নিষ্ঠ। মানুষ ও জাতির আর্থনীতিক আচরণকে

সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সেগুলি লঙ্ঘন করলে নিজেদেরই ক্ষতি হয়। কার্যত, এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনো জোর আপত্তি তোলা হয় নি। বাণিজ্যচক্র, দামের হেরফের, বেকারি — সমস্ত কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করত ঐ সব নিয়ম। অনেক পরে ১৯৩০-এ, যে-বছর বিরাট মন্দা হলো তখনও এটিই ছিল প্রভাবশালী মত। এরপর ঘটনা ঘটে চলল দ্রুত। ১৯৩০-এর দশকে লোকে বলতে শুরু করল 'আর্থনীতিক মানুষের দিন ফুরোনো'-র কথা। 'আর্থনীতিক মানুষ' মানে যে-লোক তার আর্থনীতিক স্বার্থকে অবিরত চালনা করছে আর্থনীতিক নিয়ম অনুযায়ী। এর পর থেকে উনিশ শতকের গুটিকতক রিপ ভান উইঙ্কল ছাড়া কেউই আর সেই অর্থে আর্থনীতিক নিয়মে বিশ্বাস করতেন না। আজকের অর্থনীতি হয়ে গেছে এক সারি তাত্ত্বিক গাণিতিক সমীকরণ, নয়তো কী করে এক দল লোক আর-এক দলকে তাড়িয়ে বেড়ায় তার ব্যবহারিক সমীক্ষা। এই পরিবর্তন মূলত ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ থেকে বড়-মাপের পুঁজিবাদে রূপান্তরের পরিণতি। যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগী ও বণিকদের প্রাধান্য ছিল, ততদিন মনে হয় নি যে, কেউ অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা তাৎপর্যপূর্ণভাবে তার ওপর প্রভাব খাটাতে পারে, আর ততদিনই রক্ষা পেয়েছিল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নিয়ম ও তার ক্রিয়া সম্পর্কিত বিভ্রম। এমনকি ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড-এর সর্বাধিক ক্ষমতার যুগেও তাকে কোনো চতুর পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক বলে ভাবা হতো না, ভাবা হতো আর্থনীতিক প্রবণতার এক বিষয়নিষ্ঠ ও প্রায়-স্বয়ংক্রিয় নিয়ামক হিসেবে। অবাধ অর্থনীতি থেকে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে (তা সে নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই হোক বা নিয়ন্ত্রিত সমাজবাদী ব্যবস্থা হোক, বড়-আকারের পুঁজিপতি তথা নামমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগীরাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করুক বা রাষ্ট্রই করুক) এই বিভ্রমও হারিয়ে গেল। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কতক লোক কতক উদ্দেশ্যে কতক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এবং এই সিদ্ধান্তগুলোই ঠিক করে দিচ্ছে আমাদের অর্থনীতির গতিপথ। সবাই আজ জানেন যে, চাহিদা ও জোগানের কোনো বিষয়নিষ্ঠ নিয়ম অনুযায়ী তেল বা সাবানের দাম বাড়ে-কমে না। সকলেই জানেন, অন্তত জানেন বলে মনে করেন যে, মন্দা ও বেকারি মানুষেরই তৈরি : সরকারও এ কথা স্বীকার করেন, এবং, এমনকি এ দাবিও করেন যে তাঁরা এর প্রতিকার করতে পারেন। উত্তরণ ঘটেছে অবাধ-নীতি থেকে পরিকল্পিত নীতিতে, অচেতন থেকে আত্মচেতনে, বিষয়নিষ্ঠ আর্থনীতিক নিয়মে বিশ্বাস থেকে এই বিশ্বাসে যে, মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে নিজেই নিজের আর্থনীতিক উদ্দেশ্যের নিয়ন্তা হতে পারে। আর্থিক নীতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে সামাজিক নীতি। বস্তুতপক্ষে, সামাজিক নীতিরই অঙ্গীভূত হয়ে

গেছে আর্থিক নীতি। ১৯১০-এ প্রকাশিত প্রথম 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস'-এর শেষ খণ্ড থেকে আমি অত্যন্ত যথার্থদর্শী একটি উদ্‌ধৃতি দেব। লেখক, আর যা-ই হোন, মার্কসবাদী ছিলেন না, আর সম্ভবত লেনিন-এর নামই শোনেন নি।

'সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করা সম্ভব — এই বিশ্বাসই হলো আধুনিক ইওরোপীয় মনের প্রভাবশালী ধারা; স্বাধীনতাই সর্বরোগহর — এই বিশ্বাসকে সরিয়ে এখন এটিই এসেছে। বর্তমানে এই ধারণার প্রচলন, ফরাসি বিপ্লবের সময়কার মানব-অধিকারে বিশ্বাসের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়।'[৬]

এই অংশটি লেখার পঞ্চাশ বছর পরে, রুশ বিপ্লবের চল্লিশ বছরেরও বেশি পরে ও বৃহৎ মন্দার ত্রিশ বছরেরও পরে আজ এই বিশ্বাস লোকচলতি হয়ে গেছে। আগে ভাবা হতো, মানুষ বিষয়নিষ্ঠ আর্থনীতিক নিয়মাবলির অধীন; সেগুলো যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও, মানুষের নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে। এখন মনে করা হয়, মানুষ তার সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে নিজেই নিজের আর্থনীতিক নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই ব্যাপারটাকে, মানুষের কাজকর্মে যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচক বলেই আমার মনে হয়, মনে হয় নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে বোঝা ও তার ওপর মানুষের প্রভুত্ব অর্জনের ক্ষমতা বেড়েছে। দরকার হলে এটিকে আমি পুরনো কেতার নাম — প্রগতি — বলতে রাজি আছি।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রিয়ারত অনুরূপ সব প্রক্রিয়া নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জায়গা নেই। এমনকি, বিজ্ঞানও এখন, আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, প্রকৃতির বিষয়নিষ্ঠ নিয়মাবলি নিয়ে অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ততটা ব্যাপৃত নয়। বিজ্ঞান বরং চায় এমন সব কার্যকর প্রকল্প তৈরি করতে, যা দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে বশে আনতে ও তার পরিবেশকে পাল্টাতে পারবে। আরও তাৎপর্যের ব্যাপার এই যে, সচেতন যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ শুধু নিজের পরিবেশকেই পাল্টাতে শুরু করে নি, পাল্টাতে শুরু করেছে নিজেকেও। আঠেরো শতকের শেষে জনসংখ্যা বিষয়ে বিষয়নিষ্ঠ নিয়মাবলি প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন ম্যালথ্যাস তাঁর যুগান্তকারী রচনায়। সে-সম্বন্ধে কেউ সচেতন না হলেও — অ্যাডাম স্মিথ-এর বাজার-সংক্রান্ত নিয়মের মতোই — সেগুলো কাজ করে যায়। আজকাল আর কেউ ঐ রকম

৬ 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস', খণ্ড ১২, ১৯১০, পৃ ১৫; এটি লিখেছেন এস লিথ্‌স, 'ইতিহাস' (হিস্ট্রি) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও সিভিল সার্ভিস কমিশনার।

বিষয়নিষ্ঠ নিয়মে বিশ্বাস করেন না; বরং জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ হয়ে উঠেছে এক যুক্তিগ্রাহ্য ও সচেতন সমাজ-নীতির বিষয়। আমাদের সমকালেই আমরা দেখেছি, মানুষের চেষ্টাতেই মানুষের আয়ু বেড়েছে এবং পরিবর্তিত হয়েছে আমাদের জনসংখ্যায় বিভিন্ন প্রজন্মের ভারসাম্য। মানুষের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সচেতনভাবে ওষুধের ব্যবহার আর মানুষের লক্ষণ পাল্টানোর জন্য অস্ত্রোপচারের কথাও আমরা শুনেছি। মানুষ ও সমাজ দুই-ই পাল্টাচ্ছে এবং আমাদের চোখের সামনেই সেটা হয়েছে মানুষের সচেতন প্রয়াসের ফলে। কিন্তু এইসব পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বোধহয় সেগুলিই, যেগুলি এসেছে লোককে ভজানো ও জপানোর ক্ষেত্রে উন্নতি ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে। একটি বিশেষ ছাঁচে সমাজকে গড়ে তোলা, এবং উঠতি প্রজন্মের মধ্যে সেই বিশেষ সমাজের উপযোগী মনোভাব, আনুগত্য ও মতামত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রাখায় আরও বেশি সচেতনভাবে ব্যাপৃত হচ্ছেন সর্বস্তরের শিক্ষাবিদ; যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত কোনো সমাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো শিক্ষানীতি। সমাজভুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে যা প্রয়োগ করা হয়, সেই যুক্তির প্রাথমিক কাজ আর নিছক অনুসন্ধানই নয়, রূপান্তর সাধন। আর, যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে, নিজের সামাজিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনায় উন্নতির ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতার এই উন্নীত চেতনাকেই আমার মনে হয় বিশ-শতকের বিপ্লবের একটা বড় দিক।

আগের একটি বক্তৃতায় আমি বলেছি 'ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণ' বলে একটি প্রক্রিয়ার কথা — অর্থাৎ ব্যক্তিগত দক্ষতা ও বৃত্তি তথা সুযোগ-সুবিধার বিস্তার। এগুলি অগ্রসরমান সভ্যতার সহযাত্রী। যুক্তির বিস্তার সেই 'ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণ' প্রক্রিয়ারই একটি অংশমাত্র। যাঁরা চিন্তা করতে পারেন, ব্যবহার করতে পারেন তাঁদের যুক্তি, তাঁদের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিই সম্ভবত শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে সুদূর-প্রসারী সামাজিক পরিণাম। গ্রেট ব্রিটেনে ক্রমিকবাদের প্রতি আমাদের আসক্তি এতই প্রবল যে গতির ব্যাপারটা কখনও কখনও আমাদের চোখেই পড়ে না। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার শিরোপাটি মাথায় দিয়ে আমরা এই শতাব্দীর সেরা অংশটা কাটিয়ে দিয়েছি, এবং এখনও পর্যন্ত সর্বজনীন উচ্চশিক্ষার দিকে খুব বেশি বা খুব তাড়াতাড়ি এগোই নি। যখন আমরা পৃথিবীর চালকের আসনে ছিলুম, তখন এতে খুব একটা কিছু এসে যায় নি। কিন্তু এটি একটি গুরুতর ব্যাপার হয়ে ওঠে তখনই, যখন অন্যরা আমাদের চেয়ে আরও দ্রুত গতিতে আমাদের পেছনে ফেলে যায়, এবং সর্বক্ষেত্রেই সেই গতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে প্রযুক্তিগত

পরিবর্তন। কারণ, সমাজ-বিপ্লব ও প্রযুক্তি-বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব হলো একই প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ। শিক্ষাজগৎ থেকে ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াটির কোনো উদাহরণ চাইলে আমি বলব, গত পঞ্চাশ বা ষাট বছরে ইতিহাস বা বিজ্ঞান বা যে-কোনো বিশেষ বিজ্ঞানের কী বিপুল বিস্তার ঘটেছে সে-কথা চিন্তা করুন; আর ভাবুন ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের কত অজস্র রাস্তা এর ফলে খুলে গেছে। কিন্তু অন্য একটি স্তরে এই প্রক্রিয়ার আরও এক চোখ-ধাঁধানো উদাহরণও আমার কাছে আছে। বছর তিরিশেক আগে জনৈক উচ্চপদস্থ জার্মান সামরিক অফিসার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে লাল বিমানবাহিনী গঠন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সোভিয়েত অফিসারের কাছে কিছু উদ্ভাসী মন্তব্য শুনেছিলেন :

'আমাদের, রাশিয়ানদের এখনও আদ্যিকালের লোকজন নিয়েই কাজ চালাতে হয়। যে-ধরনের বৈমানিক আমাদের হাতে আছে, বিমানযন্ত্রকে সেই অনুযায়ী মানিয়ে নিতে আমরা বাধ্য। নতুন ধরনের মানুষের বিকাশ ঘটাতে আমরা যতটা সফল হব, উৎপাদনের প্রযুক্তিগত বিকাশও ততই নিখুঁত হয়ে উঠবে। এই দুই উপনিমিত্ত পরস্পর-সাপেক্ষ। আদ্যিকালের মানুষ দিয়ে জটিল যন্ত্র চালানো যায় না।' [৭]

আজ, মাত্র এক প্রজন্মের ব্যবধানে আমরা জানি, রুশ যন্ত্রপাতি আর মোটেই আদ্যিকালের নয়, আর যে লক্ষ লক্ষ নরনারী এইসব যন্ত্রের পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন এবং চালান, তাঁরাও আর আদ্যিকালের নন। ঐতিহাসিক হিসেবে পরবর্তী ঘটনাটি সম্বন্ধেই আমার কৌতূহল বেশি। উৎপাদনের আধুনিকীকরণ মানে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু — মানুষের আধুনিকীকরণ। সারা পৃথিবী জুড়ে আদ্যিকালের মানুষ আজ শিখছে জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে, আর সে-কাজ করতে গিয়ে শিখছে চিন্তা করতে, তাদের যুক্তি ব্যবহার করতে। এই বিপ্লবকে যথার্থই বলতে পারেন সমাজ-বিপ্লব, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি যাকে বলব যুক্তির বিস্তার, তা সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু গত প্রজন্মের প্রযুক্তির দুরন্ত অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে একেও এগিয়ে চলতে হচ্ছে দুরন্ত গতিতে। আমার মনে হয় বিশ-শতকের বিপ্লবের এটাই একটা বড় দিক।

সমকালীন দুনিয়ায় যুক্তির যে-ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে তার বিপদ ও দ্ব্যর্থক দিকগুলি যদি আমি এখানে লক্ষ্য না করি, তাহলে আমাদের

৭ 'সময়ের ইতিহাস বিষয়ক ত্রৈমাসিকপত্র' (ফিয়েরটেলইয়ার্সহেফ্‌টে ফ্যুর ৎসাইটগেসিশ্‌টে), মিউনিখ, ১, ১৯৫৩, পৃ ৩৮।

কোনো কোনো নৈরাশ্যবাদী ও সংশয়ী নিশ্চয়ই আমায় একহাত নেবেন। আগের একটি বক্তৃতাতেই আমি দেখিয়েছি, যে-অর্থে এখানে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণের কথা বলা হলো, তার মানে এই নয় যে, সমরূপ তথা একরূপ হওয়ার জন্য সামাজিক চাপ এতটুকুও কমেছে। বস্তুতপক্ষে, আমাদের জটিল আধুনিক সমাজের এটি হলো অন্যতম কূটাভাস। ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধা বিস্তারের বিকাশ ঘটানোর এক প্রয়োজনীয় তথা শক্তিশালী উপকরণ হলো শিক্ষা। অর্থাৎ, এটি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণের শক্তিশালী মাধ্যমও বটে। কিন্তু এটিই আবার সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির হাতে সামাজিক একরূপতা বিস্তারেরও এক শক্তিশালী উপকরণ। বেতার তথা দূরদর্শন বা সংবাদপত্র আরও দায়িত্বশীল হোক — এমন আবেদন আমবা প্রায়ই শুনি। এগুলি এমন কিছু নঞর্থক সংঘটনের বিরুদ্ধে যায় যার নিন্দা করা সহজ। কিন্তু এই আবেদন শীঘ্রই পাল্টে যায়, এবং কাম্য রুচি ও কাম্য অভিমত দেগে দেওয়ার কাজে, গণ-অনুভাবনের এই সব শক্তিশালী মাধ্যমকে কাজে লাগানোর দাবি উঠতে থাকে। সমাজের গৃহীত রুচি ও অভিমতগুলিই হয় কাম্যতার মান। যাঁরা এ-কাজ করেন, তাঁদের হাতে এইসব প্রচার হলো সমাজকে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে গড়ে তোলার এক সচেতন ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে সমাজের প্রতিটি সদস্যকে গড়ে তোলা হয়। এই বিপদের আরও জাজ্বল্যমান উদাহরণ হলো বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপক তথা রাজনৈতিক প্রচারক। প্রায়শই একই লোক দুই ভূমিকাতেই অভিনয় করেন; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খোলাখুলি, গ্রেট ব্রিটেনে খানিকটা লুকিয়ে-চুরিয়ে দল তথা প্রার্থীরা তাঁদের তরিয়ে দেওয়ার জন্যে পেশাদার বিজ্ঞাপক নিয়োগ করেন। দুটি কায়দা বাহ্যত ভিন্ন হলেও, লক্ষণীয় রকমে একই। পেশাদার বিজ্ঞাপক আর বড় বড় রাজনৈতিক দলের মাথারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, যুক্তির ভাঁড়ার উজাড় করে তাঁরা এই কাজে লাগান। অবশ্য, অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা যেমন পরীক্ষা করে দেখেছি, এই যুক্তিকে শুধু সন্ধানের কাজেই নিয়োগ করা হয় না, করা হয় গঠনমূলক কায়দায়, অচলভাবে নয়, সচলভাবে। পেশাদার বিজ্ঞাপক তথা প্রচার-কর্মকর্তারা শুধু প্রদত্ত তথ্য নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন না। ভোক্তা বা নির্বাচক এখন কিসে বিশ্বাস করেন, সে-বিষয়ে তাঁরা আগ্রহী। ঘটনাবলিতেও তাঁরা উৎসাহী শুধু পরিণতির ওপর তার প্রভাব থাকলে তবেই। পরিণতি মানে, ভোক্তা বা নির্বাচককে সুকৌশলে যা বিশ্বাস করানো বা চাওয়ানো যায়। তাছাড়াও, গণ-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁদের মতকে গ্রাহ্য করে তোলার সবচেয়ে দ্রুত উপায় হলো ভোক্তা বা নির্বাচকের মনের গড়নের অযৌক্তিক

উপাদানের কাছে আবেদন জানানো। সুতরাং যে-ছবির মুখোমুখি আমাদের হতে হয় তা এই : পেশাদার শিল্পপতি বা দলীয় নেতাদের এক শিরোমণি গোষ্ঠী, আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এক যৌক্তিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জনসাধারণের অযৌক্তিকতা অনুধাবন ক'রে এবং তাই নিয়ে ব্যবসা ক'রে নিজেদের কার্যোদ্ধার করেন। আবেদন প্রাথমিকভাবে যুক্তির কাছে করা হয় না এটি এগিয়ে চলে মূলত সেই রাস্তা ধরে, অস্কার ওয়াইল্ড যাকে বলেছিলেন 'বুদ্ধির তলায় আঘাত করা'। ছবিটা আমি একটু বিশদভাবেই আঁকলুম, যাতে-না বিপদের মাত্রা কমিয়ে দেখার অভিযোগ ওঠে।[৮] কিন্তু মোটের ওপর এটি সঠিক, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনায়াসেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক সমাজেই জনমত সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শাসক গোষ্ঠীরা মোটামুটি পীড়নমূলক ব্যবস্থারই সাহায্য নেয়। এই পদ্ধতিকে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে খারাপ মনে করা হচ্ছে, কারণ এতে যুক্তির অপব্যবহার করা হয়।

এই গুরুতর তথা সুপ্রতিষ্ঠিত অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার দুটি মাত্র যুক্তি আছে। প্রথমটি খুবই পরিচিত। ইতিহাসের ধারায় প্রতিটি উদ্ভাবন, প্রতিটি নবায়ন, প্রতিটি নতুন প্রকৌশল আবিষ্কারের নঞর্থক তথা সদর্থক দিক আছে। কাউকে না কাউকে এর দাম চোকাতেই হয়। ছাপাখানা উদ্ভাবনের ঠিক কত পর থেকে সমালোচকরা দেখাতে শুরু করছেন যে এটি ভুল মত প্রসারের সহায়ক — সে-কথা আমার জানা নেই। মটর গাড়ি আসার ফলে পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যা নিয়ে আজকাল সবাই হা-হুতাশ করেন। এবং পারমাণবিক শক্তি নির্গমনের পন্থা ও উপায় আবিষ্কার করায় সেটিকে বিপর্যয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় এবং গেছে বলে এমনকি কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকও নিজেদের আবিষ্কার নিয়ে দুঃখ করেন। কিন্তু নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের অগ্রগতি ঠেকাতে ঐ ধরনের আপত্তি অতীতে কোনো কাজে আসে নি এবং সম্ভবত বর্তমানেও আসবে না। গণ-প্রচারের প্রকৌশল তথা সম্ভাব্য ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা যা জেনেছি, তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে গ্রেট ব্রিটেনে যেমন ছিল, লক-এর মতানুযায়ী সেই ছোটো মাপের ব্যক্তিগত গণতন্ত্র বা উদারনৈতিক তত্ত্বের গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া আর আদৌ সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় ঘোড়া-গাড়ি ও এক্কা-গাড়ির যুগে বা আদি অবাধনীতি-পুঁজিবাদের যুগে ফিরে

৮ পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের 'নতুন সমাজ' (দ নিউ সোসাইটি), ১৯৫১, অধ্যায় ৪, প্রায়শ।

যাওয়া। বরং সঠিক উত্তর হলো, এইসব কু-এর সঙ্গে তার নিজস্ব সংশোধনীও রয়েছে। অযুক্তিবাদ ভজনায়, বা আধুনিক সমাজে যুক্তির প্রসারিত ভূমিকাকে বর্জন করলেই এর প্রতিবিধান হবে না; বরং যুক্তি যে-ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্বন্ধে তলা থেকে ও ওপর থেকে এক ক্রমবর্ধমান সচেতনতার মধ্যেই রয়েছে এর দাওয়াই। এই সময়ে, যখন আমাদের প্রাযুক্তিক তথা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সমাজের সর্বস্তরে আরও বেশি করে যুক্তি ব্যবহার করতে আমাদের বাধ্য করছে, তখন এটি আর কোনো কল্পরাজ্যের স্বপ্ন নয়। ইতিহাসের অন্য যে-কোনো বিরাট অগ্রগতির মতো এই অগ্রগতিরও খরচ আছে, ক্ষয়-ক্ষতি আছে, সেগুলো চোকাতে হবে; আর আছে বিপদ, তার মোকাবেলা করতে হবে। তবুও, সংশয়ী অনাস্থাবাদী ও বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্‌বক্তারা (বিশেষত, সেইসব দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, যাঁদের আগেকার সুবিধাভোগী অবস্থার হানি ঘটেছে) যা-ই বলুন না কেন, আমি এটিকে ইতিহাসে প্রগতির উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে গণ্য করতে লজ্জা পাব না। এটিই সম্ভবত আমাদের সময়ের সবচেয়ে চোখ-ধাঁধানো ও বৈপ্লবিক ঘটনা।

ক্রমাগত যে-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তার একটি দ্বিতীয় দিক হলো পৃথিবীর পরিবর্তিত আকার। পনেরো ও ষোলো শতকের মহান কালপর্বে মধ্যযুগীয় পৃথিবী শেষ পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং স্থাপিত হয় আধুনিক পৃথিবীর ভিত্তি। নতুন নতুন মহাদেশের আবিষ্কার এবং ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে অতলান্তিকের তীরে পৃথিবীর ভরকেন্দ্র পরিবর্তন দিয়ে চিহ্নিত হয়েছিল এই পর্ব। এমনকি তুলনায় ছোটো ফরাসি বিপ্লবের ওলট-পালটেরও ভৌগোলিক বিস্তার হলো: পুরোনো দুনিয়ার ভারসাম্য ঠিক করার ডাক পড়ল নতুন দুনিয়ার। কিন্তু ষোলো শতক থেকে যা কিছু ঘটেছে, তার চেয়ে বিশ-শতকী বিপ্লবের দরুন যে সব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলো আরও অনেক প্রকাণ্ড। প্রায় শ-চারেক বছর পরে বিশ্বের ভরকেন্দ্রটি অবশ্যই পশ্চিম ইওরোপ থেকে সরে গেছে। পশ্চিম ইওরোপ ও তার বাইরের ইংরিজি-ভাষী দুনিয়া হয়ে উঠেছে উত্তর-আমেরিকা মহাদেশের একটি উপাঙ্গ, কিংবা বলতে পারেন, এমন এক রাষ্ট্র-সমবায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে যার শক্তি-কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ। কিন্তু এটাই একমাত্র, বা সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনও নয়। কোনোভাবেই এ কথা স্পষ্ট হয় না যে পশ্চিম-ইওরোপীয় উপাংশ সমেত ইংরিজি-ভাষী দুনিয়াতেই পৃথিবীর বর্তমান ভরকেন্দ্র রয়েছে, বা দীর্ঘদিন ধরে থাকবে। মনে হয়, পূর্ব ইওরোপ ও এশিয়ার বিরাট ভূখণ্ড, যা আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত,

তা-ই হলো বিশ্ব ঘটনাবলির নিয়ন্তা। 'অপরিবর্তমান প্রাচ্য' কথাটা আজকাল একেবারেই বস্তাপচা হয়ে গেছে।

বর্তমান শতকে এশিয়ায় কী কী ঘটেছে তা এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক। ১৯০২-এ ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রী দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত।সেই প্রথম একটি এশীয় দেশ ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গের মন্ত্রপূত চক্রে এসে ঢুকল। রাশিয়াকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ও পরাস্ত করে জাপান তার পদোন্নতির সঙ্কেত দিল আর এইভাবেই সে জ্বালিয়ে দিল সেই প্রথম স্ফুলিঙ্গটি যার থেকে জ্বলে উঠল বিশ শতকের বিরাট বিপ্লব। ১৭৮৯ ও ১৮৪৮-এর ফরাসি বিপ্লবের অনুকরণ করেছিল ইওরোপ। ১৯০৫-এর প্রথম রুশ বিপ্লবের কোনো প্রতিধ্বনি ইওরোপে জাগে নি, কিন্তু তার অনুকরণ করার লোক পাওয়া গেল এশিয়ায় : পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্য, তুরস্ক ও চীন-এ বিপ্লব হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঠিক বিশ্বযুদ্ধ ছিল না। বরং ইওরোপ বলে একটা কিছু আছে এটা ধরে নিলে, একে ইওরোপীয় গৃহযুদ্ধ বলাই সঙ্গত, যার ফলাফল ছিল বিশ্বব্যাপী। তার মধ্যে পড়ে বহু এশীয় দেশে শিল্পের বিকাশ, চীনে বিদেশী-বিরোধী মনোভাব ও ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্রেক, আর আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব জুগিয়েছিল আরও বেশি ও নির্ধারক প্রেরণা। লক্ষণীয় এই যে, এর নেতারা সবসময়েই ইওরোপে তাঁদের অনুকারী খুঁজেছেন, বিফল হয়েছেন, এবং শেষমেশ তা পেয়েছেন এশিয়ায়। ইওরোপ হয়ে উঠল 'অপরিবর্তমান', আর এশিয়াই চলল এগিয়ে। এই সুপরিচিত কাহিনীটিকে একেবারে আধুনিক কাল অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। এশিয়া ও আফ্রিকার বিপ্লবের প্রসার ও তাৎপর্য নির্ধারণ করার মতো অবস্থায় ঐতিহাসিক এখনও পৌঁছন নি। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্প-প্রক্রিয়ার প্রসার তথা এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আধুনিক শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার সূচনা পাল্টে দিচ্ছে ঐসব মহাদেশের মুখচ্ছবি। আর, যদিও আমি ভবিষ্যতের দিকে উঁকি মারতে পারছি না, তবুও বিচারের এমন কোনো মাপকাঠি আমার জানা নেই যা দিয়ে বিচার করলে, বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, এটিকে এক প্রগতিশীল বিকাশ ছাড়া অন্য কোনোভাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার ফলে পৃথিবীর চেহারার যে-পরিবর্তন হয়েছে, তাতে এই দেশের, এবং সম্ভবত গোটা ইংরিজি-ভাষী দেশগুলিরই, গুরুত্বের আপেক্ষিক অবনতি ঘটেছে। কিন্তু আপেক্ষিক অবনতি মানেই চূড়ান্ত অবনতি নয়। আর, আমাকে যা বিব্রত ও শঙ্কিত করে, তা কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রগতির এই অগ্রগতি নয়, তা হলো এই দেশে (গ্রেট ব্রিটেন) — এবং সম্ভবত অন্যত্রও — প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির মনোভাব।

ঘটনার এইসব বিকাশের দিকে তাঁরা তাকিয়ে থাকেন অন্ধ ও অবুঝ চোখে, সেগুলির প্রতি এমন এক মনোভাব নেন যা অনাস্থাশীল অবজ্ঞা ও অমায়িক দাক্ষিণ্যের মধ্যে দোলাচল করে, এবং তাঁরা ডুবে যান অতীত সম্বন্ধে এক বিবশকারী স্মৃতিকাতরতায়।

আমাদের বিশ-শতকী বিপ্লবে আমি যাকে বলেছি যুক্তির বিস্তার, ঐতিহাসিকের কাছে তার কিছু বিশেষ ফলাফল আছে। কারণ, যুক্তির বিস্তার মানে, সারগতভাবে, ইতিহাসে এমন সব গোষ্ঠী ও শ্রেণীর, মানবগোষ্ঠী ও মহাদেশের আবির্ভাব, যারা এতকাল ছিল ইতিহাসের বাইরে। আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি বলেছিলুম যে, মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের প্রবণতাই ছিল মধ্যযুগীয় সমাজকে ধর্মের চশমা পরে দেখা, কারণ তাদের তথ্যসূত্রগুলো ছিল একান্তভাবেই ধর্মীয় ধাঁচের। এই ব্যাখ্যাটিকেই আমি আর একটু দূর অবধি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমার মনে হয়, নিঃসন্দেহে একটু অতিরঞ্জিত হলেও, সঠিকভাবেই এ কথা বলা হয়েছে যে, 'মধ্যযুগের একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিষ্ঠান' ছিল খ্রীস্টীয় ধর্মমণ্ডলী।[৯] একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিষ্ঠান বলেই, এটি একমাত্র ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানও বটে ; একমাত্র এটিই ছিল বিকাশের সেই যৌক্তিক ধারার অধীন, ঐতিহাসিক যাকে বুঝতে পারবেন। ধর্মমণ্ডলী রূপ দিয়েছিল ও সংগঠিত করেছিল ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ব্যাপক জনসাধারণ ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানব-গোষ্ঠীগুলির মতোই, প্রকৃতির অঙ্গীভূত, ইতিহাসের নয়। আধুনিক ইতিহাস-শুরু হয় তখনই, যখন সমাজ- ও রাজনীতি-সচেতনতার মধ্যে আরও বেশি লোক উঠে আসেন, নিজ নিজ গোষ্ঠীগুলির অতীত-ভবিষ্যৎ সমেত ঐতিহাসিক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হন, এবং ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়েন পুরোপুরি। এমনকি কয়েকটি আগুয়ান দেশের জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলা যায় এমন অংশের কাছে ঐ সমাজ-, রাজনীতি- ও ইতিহাস-চেতনা ছড়াতে শুরু করেছে খুব বেশি হলেও মাত্র গত ২০০ বছর ধরে। আজই শুধু সম্ভব হয়েছে এমন এক পৃথিবীর কথা কল্পনা করা, যেখানকার লোকে যথার্থই ইতিহাসের মধ্যে ঢুকেছেন যাঁরা আর ঔপনিবেশিক প্রশাসক বা নৃতত্ত্ববিদের বিবেচ্য নন, ঐতিহাসিকেরও বিবেচ্য।

৯ এ ফন মার্টিন, 'নবজাগরণের সমাজতত্ত্ব' (দ সোসিওলজি অফ দ রেনেসাঁস), ইং অনু ১৯৪৫, পৃ ১৮।

আমাদের ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণায় এটা একটা বিপ্লব। আঠেরো শতকেও ইতিহাস ছিল শিরোমণিদের ইতিহাস। উনিশ শতকের ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের যে-দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এগোতে শুরু করলেন, তাতে ইতিহাসকে দেখা হতো একটা গোটা জাতীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস হিসেবে। কিন্তু তাঁরা এগোচ্ছিলেন আলগোছে, থেমে থেমে। জে আর গ্রীন, নেহাতই বিশেষত্বহীন এক ঐতিহাসিক, প্রথম 'ইংরেজ জনগণের ইতিহাস' (হিস্‌ট্রি অফ দ ইংলিশ পিপ্‌ল্‌) লিখে যশস্বী হন। বিশ শতকের প্রত্যেক ঐতিহাসিকই এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কৃতি ও তাঁদের দাবির বহরে ফারাক থাকে। আমি কিন্তু এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না, কারণ আমি যা নিয়ে আরও বেশি চিন্তিত তা হলো: এই দেশ (গ্রেট ব্রিটেন) তথা পশ্চিম ইওরোপের বাইরে ইতিহাসের প্রসার্যমাণ দিগন্তের কথা খেয়াল রাখার ব্যাপারে ঐতিহাসিক হিসেবে আমাদেব ব্যর্থতা। অ্যাক্টন তাঁর ১৮৯৬-এর প্রতিবেদনে বলেছেন, বিশ্ব-ইতিহাস হলো তা-ই 'যা সমস্ত দেশের মিলিত ইতিহাসের চেয়ে আলাদা'। তিনি আরও বলেছেন:

'এটি (বিশ্ব-ইতিহাস) যে ক্রমপরম্পরায় এগিয়ে চলে, জাতিগুলি তারই অধীন। জাতিগুলির কাহিনীও বলা হবে, কিন্তু সেটা তাদের নিজেদের জন্যে নয়, বরং উচ্চতর এক ধারার প্রসঙ্গাধীন হিসেবে, মানবজাতির সাধারণ ভাগ্যোন্নয়নে যত বার ও যত মাত্রায় জাতিগুলির অবদান আছে— সেই অনুসারে।' [১০]

অ্যাক্টন না বললেও, তিনি যেভাবে বিশ্ব-ইতিহাসের কথা ভেবেছিলেন, সেটা প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই বিবেচ্য। সেই অর্থে, সর্বজনীন ইতিহাসের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে সহজসাধ্য করার জন্যে আমরা এখন কী করছি?

বর্তমান বক্তৃতামালায়, এই (কেমব্রিজ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস-চর্চা বিষয়ে কথা বলার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। কিন্তু আমি যে-কথা বলার চেষ্টা করছি তার এমন চমৎকার উদাহরণ এখানে আছে যে, কাঁটার ভয়ে একে এড়িয়ে গেলে সেটা খুবই কাপুরুষোচিত হবে। গত চল্লিশ বছরে আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসকে বেশ খানিকটা জায়গা দিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। কিন্তু এর সঙ্গে কিছু ঝুঁকিও এসেছে। তা হলো: ইতোমধ্যেই যে-ঝুঁকি আমাদের পাঠ্যসূচির ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে, ইংল্যান্ড-এর

১০ 'কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস: উৎপত্তি, লেখন ও গ্রন্থরূপ', ১৯০৭, পৃ ১৪।

ইতিহাসের সেই সঙ্কীর্ণতাকে আরও সুদৃঢ় করার ঝুঁকি; কারণ, এর ফলে বাড়ছে ইংরিজি-ভাষী জগতের আরও সূক্ষ্ম কিন্তু সমান বিপজ্জনক সঙ্কীর্ণতা। ইংরিজি-ভাষী দুনিয়ার গত ৪০০ বছরের ইতিহাস যে বিশ্ব-ইতিহাসের একটা বিরাট কালপর্ব — সে নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু একেই বিশ্ব-ইতিহাসের মধ্যমণি বলে ধরে নিয়ে, বাকি সবকিছুকে উপান্তের ব্যাপার বলে গণ্য করলে পরিপ্রেক্ষিতকে দুঃখজনকভাবে বিকৃত করা হয়। এই ধরনের লোকচল্‌তি বিকৃতি নিরাস করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। আমার মনে হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাস বিভাগ এই কর্তব্য খুব একটা ভালোভাবে পালন করতে পারে নি। কোনো বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি ছাড়া অন্য কোনো আধুনিক ভাষায় যথেষ্ট দখল না-থাকলেও একজন ছাত্রকে যে ইতিহাসের সাম্মানিক স্তরের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়, সেটা নিশ্চয়ই ভুল। অক্স্‌ফোর্ড-এ প্রাচীন ও সম্মানিত দর্শন শাখায় তার প্রয়োগকর্তারা যখন সিদ্ধান্ত করলেন যে রোজকার সাদামাটা ইংরিজি দিয়েই তাঁরা বেশ চমৎকার কাজ চালাতে পারবেন, তখন বিভাগটির যা দশা হলো তা থেকে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। ইওরোপ মহাদেশের যে-কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক স্তরের ওপরে কোনো বই পড়ার সুযোগ না-দেওয়াটা নিশ্চয়ই ভুল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আছে এমন পরীক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ খুবই সীমিত। কারণ, যে একটিমাত্র পরীক্ষাপত্রে তা দেখানোর সুযোগ তাঁর আছে, উনিশ-শতকী বাগাড়ম্বর অনুযায়ী সেটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ইওরোপের বিস্তার'। দুর্ভাগ্যবশত, এই পত্রের বিষয়বস্তু ও নাম খাপে খাপে মিলে যায়: ইওরোপীয় আক্রমণের সময়কার ঘটনা ছাড়া, কোনো দেশের ইতিহাস সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর কাছে আর কিছুই জানতে চাওয়া হয় না। এমনকি চীন ও পারস্যের মতো দেশ, যাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বলিত ইতিহাস আছে, তাদের ক্ষেত্রেও এই জিনিস ঘটে। আমি শুনেছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিয়া, পারস্য ও চীনের ইতিহাস পড়ানো হয় — কিন্তু ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকরা তা পড়ান না। পাঁচ বছর আগে চীনা বিভাগের জনৈক অধ্যাপক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, 'চীনকে মানব-ইতিহাসের মূল স্রোতের বাইরে বলে গণ্য করা যায় না'।[১১] কিন্তু

১১ ই জি পুলিব্ল্যাঙ্ক, 'চৈনিক ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাস' (চাইনিজ হিস্ট্রি অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি), ১৯৫৫, পৃ ৩৬।

কেমব্রিজ ঐতিহাসিকদের কানে সে-কথা ঢোকে নি। সম্ভবত যে বইটিকে ভবিষ্যতে, বিগত (পঞ্চাশের) দশকের মহত্তম ঐতিহাসিক কীর্তি হিসেবে গণ্য করা হবে, সেটি লেখা হয়েছে পুরোপুরিই ইতিহাস বিভাগের বাইরে থেকে, এবং তাঁদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না নিয়েই। আমি ড নীডহ্যাম-এর 'চীন-এ বিজ্ঞান ও সভ্যতা' (সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না)-র কথা বলছি। এটি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার বিষয়। নিজেদের এইসব ঘরের কথা আমি কখনোই পরকে বলতুম না, যদি-না আমার মনে হতো যে, ব্যাপারটা অধিকাংশ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়, তথা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাধারণভাবে ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদেরই বৈশিষ্ট্য। '(ইংলিশ) চ্যানেলে ঝড় — মহাদেশ বিচ্ছিন্ন' — ভিক্টোরীয় যুগের দ্বীপমণ্ডূকতা সম্বন্ধে এই পুরনো বাসি ঠাট্টাটি কিন্তু আজকের দিনেও অস্বস্তিকর রকমে প্রাসঙ্গিক। বাইরের পৃথিবীতে আজকে আবার ঝড় উঠেছে, আর আমরা, ইংরিজি-ভাষী দেশগুলো জড়ো হয়ে, সাদামাটা রোজকার ইংরিজি ভাষায় নিজেরাই নিজেদের বলছি যে, অন্যান্য দেশ ও মহাদেশ তাদের অস্বাভাবিক আচরণের ফলে আমাদের সভ্যতার প্রসাদ ও আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন। কখনও কখনও দেখে মনে হয়, আমরা আমাদের বোঝবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছার দরুন পৃথিবীতে যা ঘটে চলেছে তার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি।

উনিশ শতকের শেষভাগের সঙ্গে বিশ শতকের মধ্যভাগকে আলাদা করে রেখেছে দৃষ্টিভঙ্গির এক সুতীব্র বিভেদ। এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমি আমার প্রথম বক্তৃতা শুরু করেছিলুম। শেষ পর্যায়ে এসে আমি সেই বৈপরীত্যই আরও পরিস্ফুট করার চেষ্টা করব। আর এই প্রসঙ্গে আমি যদি 'উদারপন্থী' ও 'রক্ষণশীল' শব্দদুটি ব্যবহার করি, তাহলে বুঝতে হবে যে, আমি নিশ্চয়ই ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের মার্কা অর্থে শব্দদুটি ব্যবহার করছি না। অ্যাক্টন যখন প্রগতির কথা বলেছেন, তখন তিনি শব্দটির প্রচলিত ব্রিটিশ অর্থ 'ক্রমিকবাদ'-এর কথা ভাবেন নি। ১৮৮৭-তে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে আছে চোখে-পড়ার মতো একটি বাক্যাংশ: 'বিপ্লব, আমরা যাকে বলি উদারনীতিবাদ'। তার দশ বছর পরে আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আধুনিক প্রগতির পদ্ধতিই ছিল বিপ্লব'। আর-একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'সাধারণ সব ধ্যান-ধারণার আবির্ভাব'-এর কথা, 'যাকে আমরা বলি বিপ্লব'। তাঁর একটি অপ্রকাশিত খসড়া মন্তব্যে এর ব্যাখ্যা মেলে: 'হুইগরা শাসন করতেন সমঝোতা করে:

লিবারেলরা ধ্যান-ধ্যারণার রাজত্ব শুরু করেন।'[১২] অ্যাক্টন বিশ্বাস করতেন, 'ধ্যান-ধ্যারণার রাজত্ব' মানে উদারনীতিবাদ, আর উদারনীতিবাদ মানে বিপ্লব। অ্যাক্টন-এর জীবদ্দশায় সমাজ-পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে উদারনীতিবাদের ক্ষমতা তখনও শেষ হয়-নি। আমাদের কালে উদারনীতিবাদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সমাজের সর্বত্রই তা হয়ে উঠেছে এক রক্ষণশীল উপাদান। আজ আর অ্যাক্টন-এর যুগে ফিরে যাওয়ার জ্ঞান দেওয়া অর্থহীন। কিন্তু ঐতিহাসিকের প্রথম কর্তব্য হলো অ্যাক্টন-এর অবস্থান নির্ধারণ, দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক চিন্তাবিদদের তুলনায় তাঁর অবস্থানের প্রতিতুলনা, এবং তৃতীয়ত, তার অবস্থানের কোন্ কোন্ দিক আজও গ্রাহ্য তার অনুসন্ধান। অ্যাক্টন প্রজন্মের লোকেরা নিঃসন্দেহে ভুগতেন এক পরাক্রান্ত আত্মবিশ্বাস তথা আশাবাদে। এবং যে-কাঠোমোর ওপর তাঁরা আস্থা রেখেছিলেন, তার নড়বড়ে স্বভাবটি তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে বোঝেন নি। কিন্তু, এতে অন্তত দুটো জিনিস ছিল, আজকের দিনে যা আমাদের ভীষণ দরকার: ইতিহাসের প্রগতিশীল উপাদান হিসেবে এক ধরনের পরিবর্তনের বোধ এবং এর জটিলতা বোঝার জন্যে দিশারি হিসেবে যুক্তির ওপর আস্থা।

এবার ১৯৫০-এর দশকের কিছু কণ্ঠস্বর শোনা যাক। আগের একটি বক্তৃতায় আমি সার লিউইস নেমিয়ার-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। সেখানে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, 'সুনির্দিষ্ট সমস্যা'র জন্যে খোঁজা হয় 'ব্যবহারিক সমাধান'। 'দুপক্ষই ভুলে যায় কর্মসূচি ও আদর্শ'-র কথা। তিনি একে বর্ণনা করেছেন 'জাতীয় বয়ঃপ্রাপ্তি'র লক্ষণ বলে [১৩] ব্যক্তি ও

১২ এই অংশগুলির জন্য দ্রষ্টব্য: অ্যাক্টন, 'নির্বাচিত পত্রাবলি' (সিলেকশনস ফ্রম করেসপনডেন্স), ১৯১৭, পৃ ২৮ ; 'আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতামালা', ১৯০৬, পৃ ৪, ৩২ ; অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি ৪৯৪৯ (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত)। উপরে উদ্ধৃত ১৮৮৭ সালের চিঠিতে অ্যাক্টন 'পুরোনো' থেকে 'নতুন' হুইগ-এ (অর্থাৎ, লিবারেল-এ) রূপান্তরকে 'বিবেকের আবিষ্কার' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন: স্পষ্টতই এখানে 'বিবেক' শব্দটি 'চেতনা'র বিকাশের অনুষঙ্গ যুক্ত এবং 'ধ্যান-ধারণার রাজত্ব'-র সঙ্গে মেলে। (এই বই-এর পৃ ১৩৪ দ্রষ্টব্য)। স্টাব্‌স্ ও আধুনিক ইতিহাসকে দুটি কালপর্বে ভাগ করেছেন। বিভাজন-রেখাটি হলো ফরাসি বিপ্লব: প্রথমটি ক্ষমতা, শক্তি ও রাজবংশাবলির ইতিহাস, আর দ্বিতীয়টি সেই ইতিহাস, যেখানে অধিকার তথা বাহ্যরূপ — এ দু-এরই জায়গায় এসেছে ধ্যান-ধারণা। ডব্লিউ স্টাব্‌স্, 'মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসচর্চা বিষয়ে সতেরোটি বক্তৃতা' (সেভেনটিন লেকচার্‌স্ অন দ স্টাডি অফ মেডিইভাল অ্যান্ড মডার্ন হিস্ট্রি), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯০০, পৃ ২৩৯।

১৩ এই বই-এর পৃ ৩৪ দ্রষ্টব্য।

জাতির আয়ুষ্কালের মধ্যে এই ধরনের তুলনা টানার আমি খুব পক্ষপাতী নই, এবং এই ধরনের তুলনা যদি টানাই হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করার লোভ হতেই পারে যে 'বয়ঃপ্রাপ্তি'-র স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কী হয়? কিন্তু ব্যবহারিক আর সুনির্দিষ্ট — যা নিন্দিত, এবং 'কর্মসূচি তথা আদর্শ' — যা প্রশংসিত — এদের মধ্যে যে-প্রতিতুলনা করা হয়, আমার আগ্রহ তাতেই। অবশ্য আদর্শভিত্তিক তত্ত্ব খাড়া করার ওপরে ব্যবহারিক কাজকর্মকে রাখাই হলো রক্ষণশীলতার চরিত্র-লক্ষণ। নেমিয়ার-এর চিন্তা হলো আঠেরো শতকের কণ্ঠস্বরের প্রতিভূ, যখন ইংল্যান্ড-এর সিংহাসনে বসেছেন তৃতীয় জর্জ। এখানে অ্যাক্টন-এর বিপ্লব তথা ধ্যান-ধ্যারণার রাজত্বের আসন্ন অভিঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তিনি। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদের রূপে আদ্যন্ত রক্ষণশীলতার এই সুপরিচিত বহিঃপ্রকাশ আজকের দিনেও খুবই জনপ্রিয়। সবচেয়ে লোকায়ত চেহারায় একে পাওয়া যেতে পারে অধ্যাপক ট্রেভর-রোপর-এর এই মন্তব্যে : 'যখন র‍্যাডিকালরা চিৎকার করেন যে জয় তাঁদের অনিবার্য, তখন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন রক্ষণশীলরা তাঁদের নাকে ঘুষি মেরে দেন'।[১৪] কেতাদুরস্ত এই অভিজ্ঞতাবাদের আরও এক পরিশীলিত রূপ আমরা পাই অধ্যাপক ওকশট-এর কথায়। তিনি আমাদের শোনান যে, আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে আমরা 'এক অসীম অতল সমুদ্রে পাড়ি দিই', যেখানে 'না-আছে কোনো সূচনা-বিন্দু, না কোনো পূর্বনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল', আর সেখানে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে 'স্থিরভাবে ভেসে থাকা'।[১৫] সাম্প্রতিক কালের যেসব লেখক রাজনৈতিক 'কল্পরাজ্যবাদ' বা 'অবতারবাদে'র নিন্দা করেছেন তাঁদের নামের তালিকা ঘাঁটার কোনো চেষ্টাই আমি করব না। সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বেশি রকম র‍্যাডিকাল ভাবধারাকে নিন্দাবাদের জন্য এগুলোই হলো চালু শব্দ। কিংবা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক তথা রাজনৈতিক তত্ত্ববিদদের সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে আলোচনার চেষ্টাও আমি করব না। রক্ষণশীলতার প্রতি সরাসরি আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তরের বাধা এ-দেশীয় সহকর্মীদের চেয়ে অনেক কম। মার্কিন রক্ষণশীল ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ও সবচেয়ে নরমপন্থী হার্ভার্ড-এর অধ্যাপক স্যামুয়েল মরিসন-এর মন্তব্য থেকে আমি শুধু একটিমাত্র উদ্‌ধৃতি দিচ্ছি। ১৯৫০-এর ডিসেম্বরে মার্কিন ইতিহাস

১৪ 'এনকাউন্টার', খণ্ড ৭, সংখ্যা ৬, জুন ১৯৫৭, পৃ ১৭।

১৫ এম ওকশট, 'রাজনৈতিক শিক্ষা' (পলিটিক্যাল এডুকেশন), ১৯৫১, পৃ ২২।

সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি মনে করেন যে, যাকে তিনি ইতিহাসে 'জেফারসন-জ্যাকসন-এফ ডি রুজভেল্ট ধারা' বলেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সময় এসে গেছে, আর 'সুস্থ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইতিহাস রচনার পক্ষে তিনি আর্জি জানান।[১৬]

কিন্তু, নিদেনপক্ষে গ্রেট ব্রিটেনে অধ্যাপক পপার-ই সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে স্পষ্ট ও আপসহীন ভঙ্গিতে আরও একবার এই সতর্ক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশ করেছেন। নেমিয়ার-এর 'কর্মসূচি তথা আদর্শ' বর্জনের প্রতিধ্বনি করে তিনি আক্রমণ করেছেন সেইসব নীতিকে, যেগুলির নাকি লক্ষ্য হলো 'একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী "গোটা সমাজ"-এর পূনর্বিন্যাস করা'। যাকে তিনি 'খুচখাচ সামাজিক কারিগরি' বলেছেন, তাকে তিনি প্রশংসাই করেছেন ; এবং তাঁর বিরুদ্ধে 'খুচখাচ মেরামতি' ও 'বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে চলা'[১৭]-র অভিযোগ এলেও তিনি পিছু হঠেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি অবশ্যই অধ্যাপক পপার-কে শ্রদ্ধা নিবেদন করব। তিনি সর্বদাই দৃঢ়ভাবে যুক্তির সপক্ষে থেকেছেন এবং অতীত বা ভবিষ্যতের অযৌক্তিকতার অভিযাত্রাগুলিতে কোনোভাবেই সামিল হন নি। কিন্তু তাঁর 'খুচখাচ সামাজিক কারিগরি'র নিদানের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব যে যুক্তির জন্য যে-ভূমিকা তিনি ধার্য করেছেন, তা কত সীমিত। যদিও তাঁর 'খুচখাচ কারিগরি'র সংজ্ঞার্থ খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবুও তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে 'লক্ষ্য'র সমালোচনা সেখানে করা হয় নি। এবং এর বৈধ কাজকর্মের যেসব সতর্ক দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন, যেমন 'সাংবিধানিক সংশোধন' ও 'আয়ের অধিকতর সমতার দিকে যাওয়ার প্রবণতা' ইত্যাদি, তার থেকে সহজেই দেখা যায় যে এটি আমাদের বর্তমান সমাজের পূর্বধারণার মধ্যেই কাজ করবে বলে ভাবা হয়েছে।[১৮] বস্তুতপক্ষে, অধ্যাপক পপার-এর প্রকল্পে যুক্তির ভূমিকা হলো সেই ব্রিটিশ আমলার মতো, যিনি ক্ষমতাসীন সরকারের নীতি প্রয়োগ করায় দক্ষ, এবং এমনকি সেগুলি যাতে আরও ভালোভাবে কাজ করে সে-বাবদে কিছু ব্যবহারিক উন্নতিবিধানেরও পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু কখনোই মৌল পূর্বানুমান বা চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলো

১৬ 'মার্কিন ইতিহাস সমীক্ষা' (আমেরিকান হিস্টোরিকাল রিভিয়্যু), নং ৫৬, সংখ্যা ২, জানুয়ারি ১৯৫১, পৃ ২৭২-৩।

১৭ কে পপার, 'ইতিহাসবাদের দৈন্য', ১৯৫৭, পৃ ৬৭, ৭৪।

১৮ ঐ, পৃ ৬৪, ৬৮।

নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবেন না। কাজটা দরকারি : এককালে আমিও আমলা ছিলুম। কিন্তু যুক্তিকে এইভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার পূর্বধারণাগুলোর অধীন করলে, আমার মনে হয়, অবশেষে তা পুরোপুরিই গ্রহণের অযোগ্য হয়ে যাবে। বিপ্লব = উদারনীতিবাদ = ধ্যানধারণার রাজত্ব — এই সমীকরণটি উপস্থাপনের সময় অ্যাক্টন কিন্তু এভাবে যুক্তির কথা ভাবেন নি। বিজ্ঞান, ইতিহাস বা সমাজ, যা-ই হোক না কেন, বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের প্রগতি কিন্তু এসেছে মূলত মানুষের কিছু বলিষ্ঠ প্রস্তুতির মাধ্যমে। যেভাবে সবকিছু চলছে তারই খুচখাচ উন্নতির সন্ধানে মানুষ নিজেকে আটকে রাখতে চায় নি, বরং প্রচলিত ধারায় যেভাবে কাজ হয়, এবং ঘোষিত বা অঘোষিত যেসব ধারণার ওপর তা দাঁড়িয়ে আছে, তার বিরুদ্ধে সে জানাতে চেয়েছে মৌলিক চ্যালেন্‌জ্। আমি তাকিয়ে আছি সেই সময়ের দিকে, যখন ইংরিজি-ভাষী দুনিয়ার ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক তথা রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা আবার সে-কাজ করার সাহস ফিরে পাবেন।

অবশ্য ইংরিজি-ভাষী জগতে বুদ্ধিজীবী তথা রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে যুক্তিতে আস্থাহানির ব্যাপারটাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি অশান্ত করে তোলে তা নয়, বরং সদাচলমান বিশ্বের পরিব্যাপ্ত ধারণার বিলুপ্তিই আমাকে করে তোলে আরও অশান্ত। প্রথমে ব্যাপারটা কূটাভাসের মতো মনে হয়, কারণ আমাদের চারপাশের পরিবর্তন সম্বন্ধে এত ভাসা-ভাসা কথা আগে কদাচিৎ শোনা যেত। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, পরিবর্তনকে এখন আর সাফল্য-অর্জন, সুযোগ বা প্রগতি হিসেবে ভাবা যায় না; এবং এটি এখন ভয়ের বিষয়। র‍্যাডিকাল তথা দূর-প্রসারী ধ্যান-ধ্যারণাকে অবিশ্বাস করতে হবে বলে সতর্ক করা, যা-কিছুতে বিপ্লবের গন্ধ আছে তাকে পরিহার করতে বলা, এবং এগোতেই যদি হয়, তবে যথাসাধ্য ধীর ও সতর্কভাবে এগোতে বলা : এ-ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের আর কোনো নিদানই দেওয়ার নেই। এই মুহূর্তে, যখন বিগত ৪০০ বছরের যে-কোনো সময়ের চেয়ে, পৃথিবীর চেহারা আরও দ্রুত ও অনেক আমূল পাল্টে যাচ্ছে, তখন এই ব্যাপারটিকে আমার মনে হয় এক আশ্চর্য অন্ধতা। তাই, এমন আশঙ্কার অবকাশ আছে যে, বিশ্বব্যাপী গতি তো আদৌ স্তব্ধ হবে না, বরং তার উল্টো ঘটবে : এই দেশ (গ্রেট ব্রিটেন) এবং সম্ভবত অন্যান্য ইংরিজি-ভাষী দেশ হয়তো এই সাধারণ অগ্রগতির চেয়ে পেছিয়ে পড়বে এবং অসহায়ভাবে, বিনা অভিযোগে অধঃপতিত হবে কোনো পূর্বস্মৃতির বদ্ধ জলায়। নিজের কথা বলতে পারি, আমি এখনও আশাবাদী-ই আছি। তাই, কর্মসূচি ও আদর্শ ছাড়তে হবে বলে সার লিউইস নেমিয়ার যখন আমাকে সাবধান করেন, অধ্যাপক ওকশট যখন আমায়

বলেন, আমরা নির্দিষ্ট কোথাও-ই যাচ্ছি না, আর কেউ যাতে নৌকো নাড়া না দেয় সেটা দেখাই হচ্ছে একমাত্র ব্যাপার. অধ্যাপক পপার যখন পুরোনো প্রিয় টি-মডেল-এর মোটরগাড়িটিকেই খুচখাচ কারিগরি করে নিয়ে রাস্তায় চালু রাখতে চান, অধ্যাপক ট্রেভর-রোপর যখন গলাবাজ র‍্যাডিকালদের নাকে ঘুষি মারতে চান, এবং অধ্যাপক মরিসন যখন সুস্থ রক্ষণশীল মানসিকতায় ইতিহাস লেখার পক্ষে যুক্তি দেখান, তখন আমি ফিরে তাকাব এক সংক্ষুব্ধ পৃথিবীর দিকে. এক প্রসবযন্ত্রণাকাতর পৃথিবীব দিকে, এবং উত্তর দেব এক মহান বৈজ্ঞানিকের বহুজীর্ণ কথায় : 'আর তবুও — এটা (পৃথিবী) ঘুরছে।'

ই এইচ কার-এর কাগজপত্র থেকে : 'কাকে বলে ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্দেশে টুকরো লেখা

আর ডব্লিউ ডেভিস

নভেম্বর ১৯৮২-তে মৃত্যুর আগের শেষ কয়েক বছর ধরে ই এইচ কার 'কাকে বলে ইতিহাস ?'-এর প্রভূত পরিমাণে নতুন একটি সংস্করণ তৈরির কাজ করছিলেন। ১৯৬১-র প্রথম সংস্করণের পর কেটে গেছে কুড়ি বছর। এই সময়ের লক্ষণই ছিল প্রগতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়। কিন্তু তাতে দমে না-গিয়ে কার তাঁর ভূমিকায় ঘোষণা করেন, তাঁর নতুন রচনার উদ্দেশ্য 'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি আশাবাদী না-ও হয়, তবুও অন্তত আরও সুস্থ ও আরও সমভাব দৃষ্টিভঙ্গির দাবি হাজির' করা।

লেখা হয়েছিল শুধু ভূমিকাটুকুই। কিন্তু কার-এর কাগজপত্রের মধ্যে একটি বিরাট বাক্সে ১৯৬১ সংস্করণের সঙ্গে সম্পর্কিত নানান সমালোচনা ও চিঠিপত্রে ঠাসা একটি খাম সমেত আধ ডজন বাদামি ফুলস্ক্যাপ ফোল্ডার পাওয়া যায়। সেগুলোর মাথায় লেখা ছিল: 'ইতিহাস — সাধারণ; কার্যকারণসূত্র — নির্ধারণবাদ — প্রগতি ; সাহিত্য ও শিল্প ; বিপ্লব ও হিংসার তত্ত্ব ; রুশ বিপ্লব ; মার্কসবাদ ও ইতিহাস ; মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ'। দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ করার আগে তিনি নিঃসন্দেহে আরও বেশি কাজ করতে চেয়েছিলেন। এইসব ফোল্ডার-এ অনেক বই ও প্রবন্ধের নাম আছে, সেগুলো থেকে তিনি তখনও পর্যন্ত নোট করেন নি। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে এমন উপাদানও আছে যা ইতিমধ্যেই খানিক সংসাধিত হয়েছিল : দাগ-মারা অফ-প্রিন্ট ও পত্রিকা থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া প্রবন্ধ এবং নানান মাপের ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় হাতে-লেখা অসংখ্য ছোটো ছোটো প্রক্ষিপ্ত বাক্যাংশ। আইজ্যাক ডয়েশার, আইজায়া বার্লিন, কোয়েন্টিন স্কিনার ও অন্যান্যদের সঙ্গে ইতিহাসের দর্শন ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিনিময়-করা অনেক চিঠিও ফোল্ডারগুলোয় রয়েছে, নিঃসন্দেহে নতুন সংস্করণে কাজে লাগানোর জন্য। মাঝেমাঝে পাওয়া টাইপ-করা বা হাতে-লেখা মন্তব্য, অবশ্যই বিভিন্ন বাক্য বা অনুচ্ছেদের প্রথম খসড়া। প্রস্তাবিত নতুন

সংস্করণের কোনো পরিকল্পনা পাওয়া যায় না, কিন্তু বিক্ষিপ্ত কিছু কথা দেখা যায় :

ইতিহাসের বিশৃঙ্খলা
সংখ্যাতত্ত্বের আক্রমণ
মনোবিদ্যা
গঠনমূলবাদ
সাহিত্যের বিশৃঙ্খলা
ভাষাতত্ত্ব
কল্পরাজ্য ইত্যাদি

[আর একটি টুকরো কাগজে লেখা আছে :
'শেষ অধ্যায়
কল্পরাজ্য
ইতিহাসের অর্থ']

স্পষ্টতই কার-এর ইচ্ছে ছিল প্রথম সংস্করণে যেসব বিষয় অবহেলিত বা অপর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সম্বন্ধে নতুন নতুন অংশ বা অধ্যায় লেখা এবং সেই সঙ্গে সমালোচকদের উত্তর দিয়ে ও অতিরিক্ত উপাদানের মাধ্যমে নিজস্ব যুক্তিপদ্ধতি ব্যাখ্যা করে ও মাঝে মাঝে সংশোধন করে 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এর বর্তমান অধ্যায়গুলিকে বিস্তৃত করা। কখনও কখনও মনে হয়, আমাদের বর্তমান অসন্তোষ ও যে-পৃথিবীর জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে একটি পুরোপুরি নতুন বই যেন তাঁর বহুব্যাপ্ত টুকরো মন্তব্য ও প্রক্ষিপ্ত লেখা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। তাঁর অবশ্যই ইচ্ছে ছিল একটি বা একাধিক শেষ অধ্যায় যোগ করা, বোধহয় 'প্রসার্যমাণ দিগন্ত'-র ওপর তাঁর ষষ্ঠ বক্তৃতাটির একটি পুনর্লিখিত পাঠ তৈরি করা, যেটি ইতিহাসের অর্থ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মত ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তাঁর দৃষ্টিকে হাজির করবে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ভাব-ভাবনা বিষয়ে তাঁর আগের যে-কোনো রচনার চেয়ে যা আরও বেশি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্য এবং ঐতিহাসিক ও সমাজ সংক্রান্ত তাঁর প্রথম দুটি বক্তৃতার যুক্তিকে সংশোধন করার বিশেষ কোনো কারণ কার অবশ্যই দেখতে পান নি। ঐতিহাসিক তথ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির

নানান মিথ্যা দাবির উদাহরণ হিসেবে তিনি বিখ্যাত নৌ-ঐতিহাসিক রস্কিল-এর নাম উল্লেখ করেন। রস্কিল প্রশংসা করেছিলেন আধুনিক ধারার ঐতিহাসিকদের যাঁরা 'তাঁদের কাজকে সযত্ন অভ্রান্তি ও নিরপেক্ষতা নিয়ে নিজেদের যুগের তথ্য সংগ্রহ ও নথিবদ্ধ করার বেশি কিছু বলে মনে করেন না'। এইসব ঐতিহাসিক যদি সত্যিই তাঁদের দাবি অনুযায়ী আচরণ করেন, তাহলে, কার-এর কাছে, তাঁরা আর্জেন্টিনীয় ঔপন্যাসিক বোর্হেস-এর একটি ছোটো গল্পের ('স্মৃতিধর ফুনেস' নামে অনূদিত) নায়কের মতো। এই নায়কটি যা দেখেছে, শুনেছে বা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার কোনোকিছুই কখনও ভোলে নি, কিন্তু স্বীকার করেছে যে পরিণাম হিসেবে 'আমার স্মৃতি জঞ্জালের স্তূপ'। ফুনেস-এর 'চিন্তার ক্ষমতা খুব বেশি ছিল না', কারণ 'চিন্তা করা মানে পার্থক্য ভুলে যাওয়া, সাধারণীকরণ ও বিমূর্তন করা।[১] ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগবাদকে কার ব্যাখ্যা করেন ও খারিজ করে দেন এই হিসেবে যে 'এটি একটি বিশ্বাস যে সবরকম সমস্যাকে কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্যমুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাধান করা যাবে, অর্থাৎ, একটি বিষয়নিষ্ঠ সঠিক সমাধান ও তাতে পৌঁছনোর উপায় আছে — বিজ্ঞানের তথাকল্পিত পূর্বধারণাকে সমাজবিজ্ঞানে নিয়ে আসা'। কার লক্ষ্য করেন, প্রয়োগবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে যিনি রক্ষাকবচের মতো, সেই রাঙ্কে-কে লুকাচ ইতিহাস-বিরোধী রূপে গণ্য করতেন এই অর্থে যে, তিনি বিভিন্ন ঘটনা, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে এক থেকে অন্য অগ্রগতির প্রক্রিয়া হিসেবে হাজির না-করে শুধু সেগুলোর সংগ্রহই হাজির করতেন; 'ইতিহাস', লুকাচ লিখেছেন, 'পরিণত হয় বিচিত্র সুন্দর উপাখ্যানের সংগ্রহে'।[২]

প্রয়োগবাদের ওপর এই আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় কার-এর নোট থেকে। গিবন বিশ্বাস করতেন, সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখতে পারেন একমাত্র কোনো 'ঐতিহাসিক-দার্শনিক'। যেসব তথ্য নানান সম্পর্কের একটি বিন্যাসের ওপর প্রাধান্য করে সেগুলিকে তিনি পৃথক করেন।[৩] তাকিতুস-এর কাছে গিবন তাঁর ঋণ ঘোষণা করেন এই হিসেবে যে

১ জে এল বোর্হেস, 'একটি ব্যক্তিগত রচনাসঙ্কলন (আ পার্সোনাল অ্যান্থোলজি), ১৯৫০, পৃ ৩২-৩।

২ জি লুকাচ, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (দ হিস্টরিক্যাল নভেল),

৩ এডওয়ার্ড গিবন, 'সাহিত্য-অনুশীলন বিষয়ক নিবন্ধ' (এসে স্যুর ল'তুদ দ্য লা লিতেরাতুর), ১৭৬১।

'তিনিই ছিলেন ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি তথ্য অনুধাবনে প্রয়োগ করেছিলেন দর্শনের বিজ্ঞান'।[৪] 'ইল সের্তো' (যা তথ্যগতভাবে নির্ভুল)-কে 'ইল ভেরো'-র থেকে আলাদা করেন ভিকো। 'ইল সের্তো', অর্থাৎ 'কোসিয়েন্‌ৎসা' (বিবেক)-এর বিষয়টি ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আর 'ইল ভেরো', অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়টি সর্বজনীন বা সাধারণ।[৫] 'সাম্প্রতিককালে ইংরিজিতে এত বেশি পরিমাণ রাজনৈতিক ও ইতিহাস বিষয়ক রচনায় অগভীরতা'র কারণটি কার আরোপ করেন ইতিহাসগত পদ্ধতির পার্থক্যের ওপর, যে-পার্থক্য 'ইংরিজি-ভাষী জগতের চিন্তাবিদদের কাছ থেকে মার্কস-কে এত মারাত্মকভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে' :

'ইংরিজি-ভাষী জগতের ঐতিহ্য গভীরভাবে প্রয়োগবাদী। তথ্য স্বয়ংবাদী। একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করা হয় 'তার গুণাগুণের ভিত্তিতে'। কোনো অঘোষিত, ও সম্ভবত অচেতন প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে বিভিন্ন ভাববস্তু, আখ্যান ও কালপর্বকে ইতিহাস-চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় ... এইসবই মার্কস-এর কাছে অগ্রাহ্য হতো। মার্কস প্রয়োগবাদী ছিলেন না। সমগ্রের উল্লেখ ছাড়া অংশের, তাৎপর্যের উল্লেখবিহীন তথ্যের, কারণ বা ফলাফলের উল্লেখ বাদ দিয়ে ঘটনার, বা সামগ্রিক পরিস্থিতিব উল্লেখ ছাড়া বিশেষ সঙ্কটের চর্চা মার্কস-এর কাছে পণ্ডশ্রম মনে হতো।

এই পার্থক্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক শিকড় আছে। ইংরিজি-ভাষী জগৎটা এত একগুঁয়েভাবে প্রয়োগবাদী রয়ে যাওয়াটা অকারণ নয়। দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক বিন্যাস, যার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে চায় না, সেখানে প্রয়োগবাদ কাজ-চালানোর মতো মেরামতিতে সাহায্য করে। ... উনিশ-শতকী ব্রিটেন ছিল এই ধরনের পৃথিবীর নিখুঁত নমুনা। কিন্তু যে-সময়ে প্রত্যেক ভিত্তিভূমিকে চ্যালেন্‌জ্ জানানো হয় এবং কোনো নির্দেশসূচির অভাবে আমরা এক সঙ্কট থেকে অন্য সঙ্কটে হাবুডুবু খাই, তখন প্রয়োগবাদ যথেষ্ট নয়।'[৬]

৪ গিবন, 'রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন' (ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দ রোমান এম্পায়ার), বুরি (সম্পা), ১৯০৯, অধ্যায় ৯, পৃ ২৩০।

৫ জি ভিকো, 'নতুন বিজ্ঞানের নীতি' (প্রিন্সিপি দ সিয়েনৎসা নুয়োভো), ১৭৪৪, খণ্ড ১, ৯ ও ১০, 'জি ভিকো-র নতুন বিজ্ঞান' (নিউ সায়েন্স অফ জি ভিকো) নামে অনূদিত, ১৯৫০, অনুচ্ছেদ ১৩৭, ৩২১।

৬ 'নেপোলিয়ন থেকে স্টালিন' (ফ্রম নেপোলিয়ন টু স্টালিন), ১৯৫০, পৃ ২৫০-এ লুকাচ সম্বন্ধে কার-এর রচনার এই অংশটি টাইপ-করা অবস্থায় তাঁর টুকরো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

যা-ই হোক না কেন, তথাকথিত প্রয়োগবাদের ঘোমটা বাছাই-করার অচেতন নীতিকে ঢেকে রাখতে সাহায্য করে। কার লেখেন, 'মানবিক যুক্তিবুদ্ধি কী দিয়ে গঠিত হয় সে সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণাই ইতিহাস। প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই এই ধরনের একটি ধারণা আছে, তা তিনি জানুন বা না-জানুন।' ইতিহাসকারের তথ্য নির্বাচন ও ব্যাখ্যানে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের ব্যাপারে কার 'কাকে বলে ইতিহাস ?'-এ প্রচুর মনোযোগ দিয়েছিলেন। মানবিক বৈশিষ্ট্যের এটি একটি দিক যা তাঁকে ছাত্রাবস্থা থেকেই মোহিত করে রেখেছিল। নতুন সংস্করণের জন্য সংগৃহীত তাঁর বিভিন্ন টুকরো মন্তব্যে ঐতিহাসিক জ্ঞানের আপেক্ষিকতার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পার্সীয় যুদ্ধে এথেন্স যে-ভূমিকা নিয়েছিল হেরোদোতাস তাতে খুঁজে পান তার আধিপত্যের নৈতিক ঔচিত্য ; আর চিন্তাশীল গ্রীকরা যে অবশ্যই তাদের দিগন্ত প্রসারিত করবে — বিভিন্ন যুদ্ধে তার নিদর্শন দেখে হেরোদোতাস আরও বেশি মানুষ ও দেশ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান বিস্তৃত করার উৎসাহ পেয়েছিলেন।[৭] ইতিহাস সম্পর্কে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল যাযাবর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সহানুভূতি। ইতিহাসকে আরবরা গণ্য করেছিলেন একটি নিরবিচ্ছিন্ন বা চক্রবৎ প্রক্রিয়া হিসেবে, যেখানে মরুভূমির যাযাবররা শহর বা মরূদ্যানের অধিবাসীদের উৎখাত করে নিজেরা বসত গাড়ে, তারপর মরুভূমির নতুন আগন্তুকদের হাতে নিজেরাই উৎখাত হয়। আরব ঐতিহাসিকের কাছে সুস্থিত জীবন ছিল বিলাসের উৎস, যেটি অসভ্যদের তুলনায় সভ্য মানুষকে দুর্বল করে দেয়। উল্টো দিকে, আঠেরো শতকের ইংল্যান্ড-এ গিবন ইতিহাসকে দেখেছিলেন চক্রবৎ নয়, বরঞ্চ বিজয়দীপ্ত অগ্রগতি হিসেবে : তাঁর বিখ্যাত কথায়, প্রত্যেক যুগই 'মানবজাতির প্রকৃত সম্পদ, সুখ, জ্ঞান ও সম্ভবত গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এখনও বাড়িয়ে চলেছে।' আর গিবন ইতিহাসকে দেখেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত এক সুস্থিত সভ্যতায় আত্ম-প্রত্যয়ী এক শাসক শ্রেণীর সুবিধাজনক অবস্থান থেকে। তিনি মনে করেছিলেন, ইওরোপ বর্বরদের থেকে নিরাপদ, কারণ 'জয় করতে পারার আগে তারা অবশ্যই আর বর্বর থাকবে না'। কার মন্তব্য করেন, বিপ্লবী যুগ ইতিহাস-চর্চায় বিস্তার করে বিপ্লবী প্রভাব : 'ইতিহাসে আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিপ্লবের মতো (উপযোগী) আর কিছুই নেই'। ১৬৮৮-র 'গৌরবময় বিপ্লবে'র বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উঠে এসেছিলেন

৭ এম আই ফিনলি (সম্পা.), 'গ্রীক ঐতিহাসিকগণ' (দ গ্রীক হিস্টোরিয়ান্স্), ১৯৫৯, ভূমিকা, পৃ ৪, ৬।

আঠেরো শতকের ইংরেজ ঐতিহাসিকরা। 'ফরাসি দীপায়ন সম্পর্কে এক ইতিহাস-বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি, যার ভিত্তি ছিল অপরিবর্তনীয় মানব-প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা', তাকে খর্ব করে দেয় ফরাসি বিপ্লব। এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তনের সময়ে ইতিহাসজ্ঞানের আপেক্ষিকতা স্বীকৃত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। '১৭৮৯, ১৭৯৪, ১৮০৪, ১৮১৪ ও ১৮৩৪-এ বিপ্লব সম্পর্কে যে-ব্যক্তি একেবারে একই মতামত পোষণ করেছিলেন, তিনি হয় দৈব-উদ্‌বুদ্ধ ভবিষ্যদ্‌বক্তা, নাহলে একগুঁয়ে নির্বোধ'[৮] — মেকলে যখন তাঁর সমসাময়িকদের কাছে এটি ঘোষণা করেন, তখন তিনি শুধু স্বতঃস্পষ্ট কথাটাই বলছিলেন।

ইতিহাস-জ্ঞানের আপেক্ষিকতা মেনে নিলে কী অর্থে ধরা হবে যে বিষয়নিষ্ঠ ইতিহাস (বলে কিছু) আছে? 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এ কার-এর যুক্তি হলো, যদিও কোনো ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে ইতিহাসের সীমাতীত কোনো বিষয়নিষ্ঠা দাবি করতে পারেন না, তাহলেও 'বিষয়নিষ্ঠ' ঐতিহাসিক তাঁকেই বলা যেতে পারে যাঁর 'সমাজে ও ইতিহাসে নিজস্ব পরিস্থিতির সীমাবদ্ধ মননদৃষ্টির ওপরে ওঠবার ক্ষমতা আছে এবং যাঁর মননদৃষ্টিকে এমনভাবে ভবিষ্যতে প্রক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে যার ফলে তিনি অতীত সম্পর্কে আরও সুগভীর ও দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন'। 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এর বেশ কিছু সমালোচক 'বিষয়নিষ্ঠা'কে এইভাবে দেখার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানান। যিনি তাঁর নিজস্ব পূর্বধারণা সত্ত্বেও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করেন, তিনিই বিষয়নিষ্ঠ ঐতিহাসিক — পরম্পরাগত এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই তাঁরা সমর্থন জানান। কার এই ব্যাপারটিকে সিরিয়স সমালোচনা বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর 'সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস'-এ পরম্পরাগত অর্থে অসাধারণ মাত্রায় 'বিষয়নিষ্ঠা' প্রায়ই দেখা যায়। এখানে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা হয় সেগুলোকে অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রায়ই এমন সব ব্যাখ্যানের জন্য ব্যবহার করেছেন যা কার-এর ব্যাখ্যানের বিপরীতে যায়। কিন্তু এই ধরনের বিবেকবত্তাকে কার যোগ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় দায় বলে মনে করতেন; তার মানে এই নয় যে সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে ঐতিহাসিকের পরিমার্গ তাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত।

তাহলেও, কার কিছুটা সাবধানে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন যে ইতিহাস ও সেই সঙ্গে সমাজ-বিকাশের অনুধাবনে প্রগতি হয়, এবং

৮ জি মেকলে, 'রচনাসমগ্র' (ওয়র্কস), ১৮৯৮, খণ্ড ৮, ৪৩১ (সার জেমস ম্যাকিন্‌টশ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ থেকে)।

ইতিহাস-জ্ঞানের প্রগতি ক্রমবর্ধমান বিষয়নিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইতিহাসের পক্ষে গত দু শতকে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে তা তিনি 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এ স্বীকার করেন এবং ... গ্রামণিদের ইতিহাস থেকে গোটা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসে — এই যে দিগন্তের প্রসার তাকে অভিনন্দন জানান। পরের পর প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের হাতে বিসমার্ক-এর কৃতিত্বের মূল্যায়নকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি যুক্তি দেন (বা, স্বীকার করেন) যে, '১৮৮০-র দশকের ঐতিহাসিকদের চেয়ে ১৯২০-র দশকেব ঐতিহাসিকরা বিষয়নিষ্ঠ বিচারের আরও কাছে ছিলেন এবং আজকের ঐতিহাসিকরা ১৯২০-র দশকের ঐতিহাসিকের চেয়ে আরও কাছে।' ঐতিহাসিকের বিষয়নিষ্ঠার মানের ক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত উপাদানের আপাত-স্বীকৃতিকে কিন্তু তিনি পরে শর্তাধীন করেন, এবং জোর দিয়ে বলেন যে 'এখানে ও এখনই হাজির এমন কোনো স্থির ও অনড় বিচারের মানের ওপর ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠা দাঁড়িয়ে নেই ও থাকতে পারে না, বরং তা দাঁড়িয়ে আছে এমন একটি মানের ওপর যেটি ভবিষ্যতে নিহিত ও ইতিহাসের গতিপথের অগ্রগতির সঙ্গে যার উদ্ভব হয়।' 'কাকে বলে ইতিহাস?' শেষ করার পরে ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠার সমস্যাটি নিঃসন্দেহে তাঁকে পীড়িত করে চলছিল। তাঁর বিভিন্ন টুকরো লেখায় 'নির্বিকল্প ও কালাতীত বিষয়নিষ্ঠা'কে 'একটি অবাস্তব বিমূর্তন' বলে খারিজ করে তিনি লেখেন : 'ঐতিহাসিকের কাছে স্বীকৃত, বিষয়নিষ্ঠার কোনো নীতি বা নিয়মের আলোকে অতীত সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস ইতিহাসেব ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাখ্যানের উপাদান ঢুকে পড়ে। এটি বাদ দিলে অতীত হারিয়ে যায় অসংখ্য বিক্ষিপ্ত ও তুচ্ছ ঘটনার জগাখিচুড়িতে আর ইতিহাস লেখাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।'

'কাকে বলে ইতিহাস?'-এ কার ঐতিহাসিক বিষয়নিষ্ঠার প্রশ্নটিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করেন (যদিও এই প্রসঙ্গে 'বিষয়নিষ্ঠা' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নি)। ইতিহাস ও নানান প্রকৃতিবিজ্ঞানের মধ্যে পদ্ধতিগত সাদৃশ্য ও পার্থক্যের ব্যাপারটি তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি বলে প্রমাণ হয়েছিল। পর্যবেক্ষিত তথ্য থেকে আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বজনীন সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে — এই ভূমিকায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাও আর নিজেদের দেখেন না, বরঞ্চ প্রকল্প ও তথ্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন আবিষ্কারে নিযুক্ত আছেন — এইভাবেই নিজেদের দেখেন। আর, মাঝে মাঝে ধরে দেওয়া হলেও, প্রকৃতিবিজ্ঞানের মতোই ইতিহাসের বিবেচ্য বিষয় কিন্তু অনন্য ঘটনা নয়, বরং অনন্য ও সাধারণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া। সাধারণীকরণের কাছে

ঐতিহাসিকরা দায়বদ্ধ। আর, অবশ্যই 'ঐতিহাসিক আসলে অনন্যের প্রতি আগ্রহী নন, বরঞ্চ সাধারণের মধ্যে যা অনন্য তাতেই তাঁর আগ্রহ'।

বিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তর লেখাপত্র নতুন সংস্করণের জন্য জড়ো করেছিলেন কার। তাঁর টুকরো টুকরো লেখা থেকে তাঁর চিন্তার ধারাটি বেরিয়ে আসে এবং সেগুলোর থেকে একটি নির্বাচিত অংশ আমি উপস্থিত করছি। সেগুলোর ওপর আমি কার-এর অলিখিত যুক্তি সংক্রান্ত আমার নিজস্ব ভাষ্য চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি নি (প্রতিটি টুকরো লেখাকে আলাদা আলাদা সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করে গিয়েছি):

(১) বৈজ্ঞানিক সত্যের আকারগত বা যুক্তিসম্মত কষ্টিপাথর; পপার বিশ্বাস করতেন যে একটি কালহীন যৌক্তিক নীতি 'প্রকৃত' বিজ্ঞানকে আলাদা করে দেয়.

এক সার আপেক্ষিকতাবাদী পদ্ধতিই পছন্দ করেছেন টি কুন। কোনো একক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্থিতিশীল থেকে গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ, আকার থেকে কার্যকারিতা (বা উদ্দেশ্য)।

আপেক্ষিকতাবাদ ফেয়ারাবেন্ড-কে 'পদ্ধতির বিরুদ্ধে' (এগেনস্ট মেথড, ১৯৭৫) বই-তে পুরোপুরি যুক্তিবাদ বর্জনের দিকে নিয়ে যায়।[৯]

(২) 'মেনো'-তে প্লেটো প্রশ্ন তুলেছিলেন: আমরা কী খুঁজছি তা জানা না-থাকলে কী করে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব (অনু. ৮০ঘ)।

'আমাদের মনের মধ্যে লুকোনো কোনো ধারণার নির্দেশ অনুসরণ করে যতক্ষণ-না আমরা অনেক সময় ধরে মালমশলা হিসেবে কাজে লাগার মতো বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ এলোমেলোভাবে জোগাড় করেছি, ও এইসব মালমশলার প্রাকরণিক বিলিব্যবস্থায় অনেক সময় খরচ করেছি — একমাত্র তার পরেই আমরা ধারণাটিকে আরও স্পষ্ট আলোয় দেখতে সমর্থ হই ও বস্তুগতভাবে একটি সমগ্র হিসেবে তার রূপ দিতে পারি।'

কান্ট, 'বিশুদ্ধ যুক্তির পর্যালোচনা'
(ক্রিটিক অফ পিওর রিজ্‌ন, ১৭৮১), পৃ ৮৩৫।

৯ 'পদ্ধতির বিরুদ্ধে: জ্ঞানের একটি নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের রূপরেখা' (এগেনস্ট মেথড: আউটলাইন অফ অ্যান অ্যানার্কিস্টিক থিওরি অফ নলেজ,)-য় 'ইতিহাসের জোগান-দেওয়া সমৃদ্ধ উপাদান' থেকে পি ফেয়ারাবেন্ড সিদ্ধান্ত করেন যে, সবরকম পরিস্থিতি ও সময়ের জন্য যে একটিমাত্র নীতিকে সমর্থন করা যায় তা হলো: 'সবই চলে' (পৃ ২৭)।

যে প্রকল্প পরীক্ষাযোগ্য সিদ্ধান্ত তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তার কোনো তাৎপর্য নেই — পপার-এর এই তত্ত্বটিকে সমর্থন করা যায় না (প্রাকৃতিক নির্বাচন)।

এম পোলানি, 'এনকাউন্টার',
(সেখান থেকে নিচেরটিও নেওয়া হয়েছে...

১৯২৫-এ আইনস্টাইন হাইজেনবার্গ-এর কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে 'আপনি কোনো জিনিস পর্যবেক্ষণ করতে পারেন কিনা তা নির্ভর করে আপনি কোন্ তত্ত্ব ব্যবহার করেন তার ওপর। তত্ত্বই ঠিক করে দেয় কী পর্যবেক্ষণ করা যাবে।'

(৩) [ডব্লিউ এফ ভাইসকফ-এর একটি বক্তৃতায় কার এই অংশটুকুতে দাগ দিয়েছিলেন]

'ভূত্বকের পৃষ্ঠগাঠনিক প্রক্রিয়ায় তৈরি এই ধরনের (পর্বত)মালার গঠন আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু মঁ ব্লাঁ-কে আজকে যে বিশেষ আকৃতিতে দেখা যায় তা কেন হয়েছে সেটি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না, বা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না যে পরবর্তী বিস্ফোরণে সেন্ট হেলেন্স্ পাহাড়ের কোন্ দিকটা ধ্বসে পড়বে...

'ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এমন ঘটনা ঘটা মানে এই নয় যে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে।'

(৪) ডি স্ট্রুইক, 'গণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (কনসাইজ হিস্ট্রি অফ ম্যাথমেটিক্স, ১৯২৫-এ গণিতের সামাজিক শিকড়বদ্ধতা দেখান।

(৫) এক বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে কোনো এক যথেচ্ছ উপায়ে বিশ্ব শুরু হয়েছিল আর কালো গহ্বরে মিলিয়ে যাওয়াই তার নিয়তি — এই তত্ত্বটি আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক নৈরাশ্যেরই প্রতিফলন। যথেচ্ছা মানে অজ্ঞতাকে সিংহাসনে বসানো।

(৬) বংশগতির প্রাধান্যশালী গুরুত্বে বিশ্বাস ততদিন অবধি প্রগতিশীল ছিল যতদিন অবধি আপনি বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন অর্জিত বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া যায়।

যখন এটি খারিজ করা হয়, তখন বংশগতিতে বিশ্বাস হয়ে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল।

সি ই রোজেনবার্গ, 'অন্য কোনো দেবতা নয়: বিজ্ঞান ও মার্কিন সামাজিক চিন্তা প্রসঙ্গে' (নো আদার গড্স্: অন সায়েন্স অ্যান্ড আমেরিকান সোশাল থট, ১৯২৫) বইটিতে এর সপক্ষে যুক্তি দেখুন (বিশেষভাবে পৃ ১০)।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে কার যে-প্রস্তাব করেছিলেন সে-আপেক্ষিকতা যে তার চেয়ে আরও বেশি — তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এইসব টুকরো টুকরো লেখা থেকে তা সুস্পষ্ট। প্রকৃতিবিজ্ঞানীর তত্ত্বে ও প্রয়োগে দেশ-কাল বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রকল্প ও মূর্ত উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে ইতিহাসে সাধারণীকরণ ও তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। বৈধ বৈজ্ঞানিক প্রকল্পমাত্রেরই সঠিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ক্ষমতা নেই, যদিও অনেক সময়েই এই ক্ষমতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়; কিছু কিছু প্রকৃতিবিজ্ঞানে সেগুলোর সঙ্গে ঐতিহাসিকের সাধারণীকরণের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

'কাকে বলে ইতিহাস ?'-এ "ইতিহাসে কার্যকারণ" শীর্ষক বক্তৃতায় কার সাধারণীকরণের ধারণাটিকে আরও খুঁটিয়ে বিচার করেন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ইতিহাসকার এক কারণসমবায়ের মুখোমুখি হন এবং তিনি 'কারণগুলিকে কিছুটা ক্রমপরম্পরায় সাজিয়ে' দিতে চান 'যাতে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক স্থির হয়'। নতুন সংস্করণের জন্য তাঁর বিভিন্ন টুকরো মন্তব্যে কার মঁতেসকিয়ো ও তোকভিল এর থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করেন। এইসব অংশে ঐ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই গৃহীত হয়েছে। কারণের, মঁতেসকিয়ো লেখেন, 'যত বেশি সাধারণ ফল থাকে, সেগুলো তত কম যথেচ্ছাচারী হয়। ফলে ব্যক্তির একটি বিশেষ মানসিকতা কীভাবে আসে তা জানার চেয়ে কোনো জাতির একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কীভাবে আসে তা আমরা আরও ভালোভাবে জানি... ব্যক্তি মানুষের চরিত্র কী দিয়ে গঠিত হয় — তার থেকে যেসব সমাজ একধরনের জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছে তাদের সত্তা কী দিয়ে গঠিত হয় তা আমরা আরও ভালোভাবে জানি।'[১০] আর তকভিল-এর 'প্রাচীন ও সাধারণ কারণসমূহ' এবং 'বিশেষ ও সাম্প্রতিক কারণসমূহ'[১১] প্রসঙ্গে কার মন্তব্য করেন : 'এটি বিচারগ্রাহ্য ; সাধারণ মানে দীর্ঘমেয়াদি ; ঐতিহাসিক প্রধানত দীর্ঘমেয়াদিতে আগ্রহী'।

ব্যবহারিক ইতিহাসকার নানান ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি, সাধারণ বা তাৎপর্যপূর্ণ কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা

১০ 'মন ও চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহের ওপর একটি রচনা' (অ্যান এসে অন কজেস অ্যাফেক্টিং মাইন্ডস অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স), মঁতেস্‌কিয়ো-র 'আইনের মর্ম' (দ স্পিরিট অফ লজ্‌), ডি ডব্‌লিউ ক্যারুথার্স-সম্পা, ১৯৫৫, পৃ ৪১৭।

১১ এ দা তোকভিল,'পুরনো জমানা' (দ্য লাঁসেঁ রেজিম), এস গিলবার্ট অনূদিত, ১৯৫৫, খণ্ড ২, ৩, বিশেষত পৃ ১৬০।

করলে ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকা সংক্রান্ত সমস্যাটিও সেই সঙ্গেই এসে যায়। 'কাকে বলে ইতিহাস ?'-এ কার স্বীকার করেন যে আকস্মিকতা ইতিহাসের গতিপথ পালটে দিতে পারে। কিন্তু তিনি বলেন : সেগুলো যেন ঐতিহাসিকের তাৎপর্যপূর্ণ কারণের স্তরবিন্যাসের মধ্যে ঢুকে না-পড়ে। ১৯২০-র দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে লেনিন-এর অকালমৃত্যুর একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু যা ঘটেছিল এটি তার 'আসল' কারণ নয় এই অর্থে যে, এটি একটি যুক্তিগ্রাহ্য ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা নয়, যেটিকে অন্যান্য ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। এই ধারণাটিকে আরও বিস্তৃত করে কার তাঁর টুকরো মন্তব্যে লেখেন, 'বস্তুত সিরিয়স চর্চার বিষয় হতে যে-নিয়মানুগতা লাগে, ইতিহাস পর্যাপ্ত পরিমাণেই তার অধীন, যদিও সময়ে-সময়ে এইসব নিয়মানুগতা নানা বহিরাগত ঘটনার দরুন বিপর্যস্ত হয়।'

আকস্মিকতার সমস্যাটি ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা -- এই বিশেষ আকস্মিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। এই বিষয়টিতে কার বারেবারে ফিরে এসেছেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর নিজের চর্চায়, স্টালিন-এর ক্ষমতায় উত্থানের বছরগুলোতে এই সমস্যাটি অবশ্যই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'ইতিহাসে ব্যক্তি' — বিষয়ে তাঁর কাগজপত্রে সমস্যাটিকে এক ব্যাপক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে রাখা হয়েছে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ব্যক্তিপূজা একটি 'শিরোমণিতন্ত্রী মতবাদ', কারণ 'ব্যক্তিবাদের একমাত্র অর্থ হতে পারে কার্যনির্বাহী ব্যক্তিকে এক নৈর্ব্যক্তিক জনতার চালচিত্রে দাঁড় করানো'। স্বাধীন ব্যক্তির বিভিন্ন নিরঙ্কুশ অধিকারের ওপর চূড়ান্তভাবে জোর দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে এই দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রগণ্য ইংরেজ সমর্থক আলডুস হাক্সলি তাঁর 'যা খুশি করো' (ডু অ্যাজ় ইউ উইল)-তে -- বই-এর নামটি খুবই যথাযথ — দাবি করেন, 'আমরা জীবনে যে উদ্দেশ্য আরোপ করি সেটাই তার উদ্দেশ্য... জীবনের অর্থ বলতে আমবা যা পছন্দ করি তা-ই। প্রত্যেক মানুষের তার নিজের জীবনদর্শনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের ওপর অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে।'[১২] ১৯৩০-এর দশকে সার্ত্র-এর প্রভাবশালী লেখা 'সত্তা ও শূন্যতা' (বিইং অ্যান্ড নাথিংনেস) 'নিজের জন্য' সত্তা — ব্যক্তির বিশুদ্ধ সচেতনতা, অখণ্ডনীয় স্বাধীনতা ও দায়িত্ব — এবং 'নিজের মধ্যে' সত্তা — জাগতিক, বিষয়নিষ্ঠ, অ-চেতন

১২ এ হাক্সলি, 'যা খুশি করো' (ডু অ্যাজ় ইউ উইল), ১৯২৯, পৃ ১০১।

জগৎ — এই দু-এর মধ্যে প্রভেদ করে। এই পর্যায়ে তিনি ছিলেন মার্কসবাদ-বিরোধী, 'নৈরাজ্যবাদের লক্ষণযুক্ত (সার্ত্র-এর মধ্যে যা কখনোই অনুপস্থিত ছিল না)'। আর, ১৯৬০-এ যদিও 'দ্বান্দ্বিক যুক্তির পর্যালোচনা' (ক্রিটিক অফ ডায়ালেকটিক্যাল রিজ়ন)-র অভিপ্রায় ছিল মার্কসবাদকে 'আমাদের যুগের চূড়ান্ত দর্শন' হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া, তাহলেও, আসলে. কার-এর মতে, 'তাঁর (সার্ত্র)-মার্কা অস্তিত্ববাদ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ব্যক্তিবাদ ও বিষয়নিষ্ঠা ছিল মার্কসবাদের সঙ্গে অসমঞ্জস'। একইভাবে মার্কসবাদ-প্রভাবিত হলেও, আডোর্নো 'প্রকৌশলীতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের এক জগতের কাছে ও সেইসঙ্গে বদ্ধ দর্শন-প্রস্থানের (হেগেল-এর ভাববাদ ও মার্কস-এর বস্তুবাদ) কাছে সম্পূর্ণ আনুগত্যের হাত থেকে ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন'। আর ফ্রয়েড-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা সভ্যতার ফসল নয়, সভ্যতার প্রভাব বরং ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করে।[১৩]

সমাজ বেঁধে রেখেছে ব্যক্তিকে ও এইসব বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করা উচিত — এই দাবিটি সমানভাবে দীর্ঘপ্রতিষ্ঠিত অন্য একটি দাবির সঙ্গে অংশত সম্পৃক্ত ও অংশত বিরোধী। অন্য দাবিটি এই যে, কিছু ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সমাজের হাতে বাঁধা না-পড়েও ক্রিয়াশীল হতে সক্ষম, আর এটি প্রায়ই দেখা দেয় ইতিহাসে মহামানবদের ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপে জোর দেওয়ার ভঙ্গিতে। ক্রমওয়েল-এর জন্য এই রকম একটি ভূমিকা দৃঢ়ভাবে দাবি করেছিলেন অ্যান্ড্রু মার্ভেল :

> 'এই হলেন তিনি, যাঁকে বিক্ষিপ্ত সময়ের শক্তি সংক্ষিপ্ত করে
> আর এক বছরেই সম্পন্ন হয় বহু যুগের কাজ।'

এর বিপরীতে স্যামুয়েল জনসন ঘোষণা করেন :

> 'মানুষের হৃদয় যা কিছু সহ্য করে তার কতটুকুই বা রাজা বা আইনের
> দরুন হয় বা উপশম করতে পারে।'

কিন্তু, কার লিখেছেন, 'রাজা বা আইন অনিষ্ট ও তার উপশম করতে পারে -- এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে' জনসন-এর প্রতিক্রিয়া ছিল নেহাতই 'শত্রুর সঙ্গে পেছনের সারির সৈন্যদের মোকাবিলা'।

সমাজ থেকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি-ইচ্ছার এক চূড়ান্ত ভূমিকা যাঁরা দাবি করেন তাঁদের বিরুদ্ধে মার্কস-এর যুক্তি ছিল : যে-দৃষ্টিভঙ্গি 'বিচ্ছিন্ন

১৩ এস ফ্রয়েড, 'সভ্যতা ও তার নানা অসন্তোষ' (সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্টস), ১৯৫৫, পৃ ৩২; কার-এর অন্য একটি টুকরো লেখায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'ফ্রয়েড-এর অচেতন হলো ব্যক্তিমানুষ; এর সঙ্গে ইয়ুং-এর "সমষ্টিগত অচেতনতা"র কোনো সম্পর্ক নেই'।

মানুষকে তার সূচনা হিসেবে ধরে নেয়' সেটি 'অলীক' (আব্‌গেশমাক্‌ট)। মানুষ প্রথমে দেখা দেয় 'এক গণসত্তা, যূথবদ্ধ প্রাণী হিসেবে', যে 'ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় নিজেকে পরিণত করে ব্যক্তিতে'; 'বিনিময় ব্যাপারটাই এই ব্যক্তিতে পরিণতির এক প্রধান ঘটক'।[১৪] মিল্‌টন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মেকলে মন্তব্য করেছিলেন, 'মানুষ যত বেশি জানে ও যত বেশি চিন্তা করে ঠিক সেই অনুপাতে সে ব্যক্তিদের দিকে তত কম ও শ্রেণীর দিকে তত বেশি দেখে'।[১৫] আর ব্যক্তি-রাজনীতিকদের সক্রিয়তা যে তাঁদের বাইরের বিভিন্ন শক্তির হাতে নির্ধারিত হয় — এই ধারণাটির একটি ধ্রুপদী প্রকাশ দেখা যায় ১৮৫২-য় তোকভিল-এর এই বক্তব্যে:

'সমস্ত সভ্য মানুষদের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানসমূহ বহুবিধ সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করে বা অন্তত রূপ দেয়; আর এইসব সাধারণ ধারণা থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন সমস্যা যার মধ্যে রাজনীতিকদের লড়াই করতেই হবে। সেইসঙ্গে ঐসব ধারণা থেকে তৈরি হয় আইনকানুন, যেগুলি রাজনীতিকরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছেন বলে ভাবেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানসমূহ সৃষ্টি করে একধরনের মননগত পরিবেশ যাতে সমাজে শাসক ও শাসিত দুজনেই শ্বাস নেয় ও দুজনেই নিজেদেব অজ্ঞাতসারে সেখান থেকে তাদের ক্রিয়াকর্মের নীতি সংগ্রহ করে।'

ব্যক্তিরা ইতিহাসে নগণ্য ভূমিকা পালন করে — এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রান্তবাদী প্রকাশে টলস্টয় ছিলেন অবিচলিত: 'যুদ্ধ ও শান্তি'-র উত্তরকথনের একটি খসড়ায় তিনি সাদাসাপ্‌টা বলে দেন যে, 'ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জন্ম দেয় তাঁদের সময়। তাঁরা বেরিয়ে আসেন সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের যোগসূত্রে'।[১৬] ১৮৬৭-র মধ্যেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছিল:

'জেমস্তভো (রুশ পঞ্চায়েত), আদালত, যুদ্ধ বা যুদ্ধ না-হওয়া ইত্যাদি সবই সামাজিক সংগঠনের বহিঃপ্রকাশ — ঝাঁক-বাঁধা সংগঠন (যেমন মৌমাছিদের ক্ষেত্রে): যে কেউ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে এবং যারা আসলে নিজেরা কী করছে ও কেন করছে জানে না — তারাই সবচেয়ে

১৪ 'নক্‌শা' (গ্রুণ্ডরিস্‌সে), বার্লিন, ১৯৫৩, পৃ ৩৯৫-৬।

১৫ 'রচনাসমগ্র' (ওয়র্কস), ১৮৯৮, খণ্ড ৭, পৃ ৬।

১৬ এল টলস্টয়, 'সম্পূর্ণ রচনাসংগ্রহ' (পোলনোএ সোব্রানিএ সোকিনেনিই), খণ্ড ১৫, ১৯৫৫, পৃ ২৭৯।

ভালো ; এবং সাধারণ শ্রমের পরিণাম সর্বদা একই ধরনের কার্যকলাপ ; সেটি এমন ধরনের যা প্রাণিবিজ্ঞানের সূত্রাবলিতেও সুপরিচিত। সৈন্য, সম্রাট, ভূস্বামীদের প্রধান বা চাষীর জৈবিক কার্যকলাপই নিকৃষ্টতম ধরনের কার্যকলাপ যেখানে — বস্তুবাদীরাই ঠিক বলেছেন — কোনো বেনিয়ম নেই।'[১৭]

আর, তিরিশ বছর পরে, বুয়র যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ে তিনি লিখেছিলেন, 'চেম্বারলিন বা ভিল্‌হেল্‌ম্‌দের' ওপর রাগ করে কোনো কাজের কাজ হবে না ; 'সব ইতিহাসই সব রাজনীতিকদের ঠিক এই ধরনের কাজের সারি'। এর উৎপত্তির কারণ নতুন নতুন বাজারের মাধ্যমে অল্প কয়েকজনের অতিরিক্ত সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা যখন 'জনসাধারণ কঠোর শ্রমের ফলে ভেঙে পড়ছে'।[১৮]

মার্কস ও তোকভিল-এর পরিমার্গকে কার অনেকটাই স্বীকার করেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে 'ইতিহাসে ব্যক্তিদের "ভূমিকা" আছে, কোনো এক অর্থে এই ভূমিকা ব্যক্তির নিজের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ'। তাঁর মতে, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর 'নড়বড়ে ভাব' যতটা না তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কারণে (যতদূর পর্যন্ত এটি তাঁকে নেতৃত্বের উপযোগী করে দেয় শুধু ততদূরই তাৎপর্যপূর্ণ), তার চেয়ে বেশি লেবর পার্টি যে সমগ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে তাদের মৌলিক উভয়সঙ্কট। আরও সাধারণভাবে তিনি দাবি করেন যে 'গোষ্ঠীস্বার্থ ও মনোভাব, যেগুলি তাদের (ব্যক্তি-রাজনীতিকদের) চিন্তাকে রূপ দান করে' তা যতখানি তাঁর বিবেচ্য বিষয়, তাঁদের মূল্যায়ন ততটা নয়। 'যেভাবে ব্যক্তির মন কাজ করে', তিনি লেখেন, 'তা ঐতিহাসিকের পক্ষে অত গুরুত্বপূর্ণ নয়'। আরও ভালো হলো 'ইতিহাসকে সচেতন ব্যক্তিদের ব্যবহারের নিরিখে কম করে দেখে নানান অবচেতন গোষ্ঠী-পরিস্থিতি ও মনোভাবের নিরিখে বেশি করে দেখা'। এই মেজাজ নিয়ে তিনি তির্যকভাবে মন্তব্য করেন, হিটলার সম্বন্ধে একটি বই 'শুরু হয় সবকিছু হিটলার-এর ব্যক্তিত্বের ওপর চাপিয়ে আর শেষ হয় ভাইমার জমানার অস্থিরতা ও অক্ষমতার কথা দিয়ে'।[১৯]

১৭ সামারিন-কে লেখা চিঠি, ১০ জানুয়ারি ১৮৬৭। 'টলস্টয়-এর চিঠিপত্র' (টলস্টয়'জ লেটার্স), আর এফ ক্রিশ্চিয়ান (সম্পা), খণ্ড ১, ১৯৫৫, পৃ ২১১।

১৮ ভোলকোন্‌স্কি-কে লেখা চিঠি, ৪/১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯, ঐ, খণ্ড ২ পৃ ৫৮৫।

১৯ এটি বলা হয়েছে সেবাস্টিয়ান হফ্‌নার-এর 'হিটলার-এর তাৎপর্য' (দ মিনিং অফ হিটলার) প্রসঙ্গে।

কিন্তু টলস্টয়-এর প্রান্তবাদী অবস্থানও সমর্থন করেন নি কার। একজন ব্যবহারিক ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর যন্ত্রণা তাঁকে বারবারই 'ক্লিওপাট্রা-র নাক'-এ ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। ইতিহাসে আকস্মিকতার সমস্যা 'আমাকে এখনও উৎসুক করে ও ধন্ধে ফেলে', এই মন্তব্যে করে তিনি তাঁর টুকরো লেখায় আবার জোর দেন, যেমন 'কাকে বলে ইতিহাস ?'-এ জোর দিয়েছিলেন যে, লেনিন-এর মৃত্যুর বিভিন্ন কারণ ইতিহাস-বহির্ভূত হলেও ইতিহাসের গতিপথকে তা প্রভাবিত করেছিল। এর সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন যে, 'এমনকি আপনি যদি এ-ই মনে করেন যে পরিণামে সবকিছুই একই হতো, তাহলেও একটি ছোটো পর্ব থাকে যেটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রচুর সংখ্যক মানুষের পক্ষে তাতে প্রচুর হেরফের হয়ে যায়।' 'কাকে বলে ইতিহাস ?'-এ ঐতিহাসিক আকস্মিকতা সংক্রান্ত তাঁর আলোচনার তুলনায় এখানে গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁর (সোভিয়েত রাশিয়ার) 'ইতিহাস' শেষ হওয়া উপলক্ষ্যে পেরি অ্যান্ডারসন-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি লেনিন ও স্টালিন-এর ভূমিকা সম্পর্কে চমকপ্রদ মন্তব্য করেন। ওপরে উল্লিখিত ব্যাপারটি তারই সূচনা। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, 'লেনিন যদি তাঁর সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতার পরাকাষ্ঠা সহ বিশ ও তিরিশের দশক জুড়ে বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও ঠিক একইরকম সব সমস্যার মুখোমুখি হতেন', আর তিনিও শুরু করতেন বড়মাত্রায় যন্ত্রচালিত কৃষি, দ্রুত শিল্পায়ন, বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমের অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু তিনি 'বলপ্রয়োগের উপাদানটি কম ও সহনীয় করতে পারতেন' :

'লেনিন-এর অধীনে এই যাত্রা হয়তো মোটের ওপর মসৃণ থাকত না। কিন্তু যা ঘটেছিল সেরকম কিছু হতো না। লেনিন নথিপত্রের কারচুপি বরদাস্ত করতেন না, যা স্টালিন সবসময়েই করে চলতেন। লেনিন-এর অধীনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, কিলিগা-র ভাষায় 'বিরাট মিথ্যার দেশে' পরিণত হতো না। এ সবই আমার জল্পনা।' [২০]

সোভিয়েত ইতিহাসের একটি সঙ্কটজনক পর্যায়ে আকস্মিকতাকে কার এখানে পর্যাপ্ত ভূমিকা প্রদান করেছেন। সাবধানে সুচিন্তিত বিচারের বদলে এটি ছিল একটি মৌখিক বিবৃতি, কিন্তু তাঁর 'ইতিহাস'-এর আরও সংযত ভাষায়ও তিনি লেখেন যে 'রুশী আমলাতন্ত্রের আদিম ও নিষ্ঠুর ঐতিহ্যের

সঙ্গে স্টালিন-এর ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়ে ওপর-থেকে-আসা বিপ্লবে এনে দিয়েছিল এক বিশেষ ধরনের নির্মমতা।'[২১] 'ওপর-থেকে-আসা বিপ্লবে'র বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি কারণকে মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং এইসব কারণই হবে ঐতিহাসিকের মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু যে-পরিমাণ বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল তা ইতিহাসের আকস্মিক ঘটনা।

তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে বিভিন্ন টুকরো মন্তব্য ও চিঠিতে কার ইতিহাস-চর্চার বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করেন। মার্কসীয় প্রভাবকে তিনি চিহ্নিত করেন গত ষাট বছরের একটি প্রধান নতুন ধারা হিসেবে :

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইতিহাস সংক্রান্ত লেখালিখির ওপর ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার অভিঘাত খুবই শক্তিশালী হয়ে পড়েছে। বস্তুত একথাও বলা যায় যে এই পর্যায়ের ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত সিরিয়স রচনা রূপ পরিগ্রহ করেছে এই ধারণার প্রভাবে। সাধারণভাবে এই পরিবর্তনের লক্ষণ হলো ইতিহাস — বা ব্যাপক অর্থে 'রাজনৈতিক ইতিহাস' — যুদ্ধবিগ্রহ, কূটনৈতিক মারপ্যাঁচ, সাংবিধানিক যুক্তিতর্ক ও রাজনৈতিক চক্রান্তের জায়গায় এসেছে আর্থনীতিক উপাদান, সামাজিক অবস্থা, জনসমষ্টির সংখ্যাতত্ত্ব, ও বিভিন্ন শ্রেণীর উত্থান-পতন। এই বিকাশের আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজবিদ্যার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ; মাঝে মাঝে ইতিহাসকে সমাজবিদ্যার একটি শাখা হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা হয়েছে।'

ইতিহাসের ওপর সমাজবিদ্যার এই ধ্রুব প্রভাব 'কাকে বলে ইতিহাস ?'-এ কার আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'ইতিহাস যত বেশি সমাজতাত্ত্বিক হয়ে ওঠে ও সমাজতত্ত্ব যত বেশি ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে, ততই দু-এর পক্ষে আরও মঙ্গল'। নতুন সংস্করণের জন্য তাঁর টুকরো মন্তব্যে তিনি আরও জোরালোভাবে ঘোষণা করেন : 'সামাজিক ইতিহাসই হলো ভিত। শুধু ভিতের চর্চাই যথেষ্ট নয় ; সেটা একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। "আনাল"দের বোধহয় ঠিক এটাই হয়েছিল। কিন্তু একে তো বাদ দেওয়া যায় না।'

এইসব ইতিবাচক বিকাশকে স্বীকার করেও কার জোর দিয়ে বলেন যে সাধারণ বা প্রচলিত ধারার নিরিখে ইতিহাস ও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান — দুটি শাখাই সঙ্কটগ্রস্ত। 'ইতিহাস থেকে পালিয়ে কোনো বদ্ধক্ষেত্রের বিশেষীকরণে' ঢোকার যে অগভীর প্রয়োগবাদ — কার সেটি লক্ষ্য করেন (একে তিনি 'একধরনের আত্ম-নাশ' বলে ধিক্কার দিয়েছেন) ও সেই সঙ্গে

ঐতিহাসিকদের পদ্ধতিতত্ত্বে আশ্রয় নেওয়ার ঝোঁকটিও খেয়াল করেন। (তিনি মন্তব্য করেন, '"পরিমাণগত" ইতিহাসের ভজনা — যা সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যকে সবরকম ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উৎসে পরিণত করে — ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাকে বোধহয় অলীকতার পর্যায়ে নিয়ে যায়')। আর ইতিহাসের অন্তর্নিহিত এই সঙ্কট ইতিহাস থেকে সমাজবিজ্ঞানে পালানোর সঙ্গেই যুক্ত। এটিকেও কার গণ্য করেছেন রক্ষণশীল বা এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁক হিসেবে :

'ইতিহাসের বিষয় হলো পরিবর্তনের নানান মৌলিক প্রক্রিয়া। এইসব প্রক্রিয়া যদি আপনার অসহ্য লাগে তাহলে আপনি ইতিহাস ছেড়ে দিন ও আশ্রয় নিন সমাজবিজ্ঞানে। আজ নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির বাড়বাড়ন্ত। ইতিহাস অসুস্থ। কিন্তু আপনাদের সমাজও তো অসুস্থ।'

তিনি এও দেখান যে '"আশ্রয় নেওয়া"র ব্যাপারটি অবশ্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যেও চলে — অর্থনীতিবিদরা চলে যান অর্থপরিমাপবিদ্যায়, দার্শনিকরা তর্কশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বে, সাহিত্য-সমালোচকরা রীতি-প্রকরণের বিশ্লেষণে'। ট্যালকট পারসন্‌স্ হচ্ছেন এই জাতীয় সমাজবিদদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি 'বিমূর্ততাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন যে ইতিহাসেব সঙ্গে তাঁর সব যোগ হারিয়ে গিয়েছিল'।

গঠনমূলবাদ (বা, 'গঠনমূলগত ক্রিয়াশীলতা') সম্বন্ধে কার যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। আলাপ প্রসঙ্গে তিনি একবার মন্তব্য করেন যে, গঠনমূলবাদীদের অন্তত এই গুণ ছিল যে তাঁবা অতি-বিশেষীকরণের ফাঁদ এড়িয়ে অতীতকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে সব মিলিয়ে গঠনমূলবাদ ইতিহাসচর্চায় ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। গঠনমূলগত বা 'অনুভূমিক' পন্থা — যেটি সমাজকে তার নানান অংশ বা দিকের ক্রিয়াশীলতা বা গঠনমূলগত আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে — তার সঙ্গে তিনি তুলনা করেন ঐতিহাসিক বা 'উল্লম্ব' পন্থার — যেটি 'সমাজকে বিশ্লেষণ করে কোথা থেকে এসেছে ও কোথায় যাচ্ছে তার নিরিখে'। এ বিষয়ে তাঁর মত হলো : 'প্রত্যেক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ঐতিহাসিকই মানবেন যে দুটি পন্থাই প্রয়োজন' (এক চিলতে কাগজে লেখা আরও সাদাসাপটা একটি টুকরো মন্তব্য অনুযায়ী 'বর্ণনাধর্মী ও গঠনমূলগত ইতিহাসের মধ্যে প্রভেদটা বাজে ব্যাপার') :

'কিন্তু এতে প্রচুর তফাত হয়ে যায় যা [ঐতিহাসিকের] প্রধান গুরুত্ব-আরোপ ও বিবেচনাকে আকৃষ্ট করে। এটি অবশ্যই অংশত নির্ভর করে ঐতিহাসিকের মেজাজের ওপর। কিন্তু প্রধানত যে-পরিবেশে তিনি

কাজ করেন তার ওপর। আমরা যে-সমাজে বাস করি তা মূলত পরিবর্তনকে আরও খারাপের দিকে পরিবর্তন হিসেবে ভাবে, তাকে ভয় পায় ও 'অনুভূমিক' দৃষ্টিভঙ্গিকে পছন্দ করে, যার জন্যে শুধু ছোটোখাটো রদবদলের দরকার পড়ে।'

অন্যত্র কার মন্তব্য করেন, 'প্রথমোক্ত পন্থাটি রক্ষণশীল এই অর্থে যে এটি বিচার করে একটি অচল অবস্থাকে আর পরবর্তীটি র‍্যাডিকাল এই অর্থে যে এটি পরিবর্তনের দিকে যায়' :

'এল এস (লেভি-স্ট্রাউস) তাঁর নিজের প্রয়োজনে মার্কস থেকে যতই উদ্ধৃতি দিন না কেন ... আমার সন্দেহ হয় গঠনমূলবাদ এক রক্ষণশীল পর্বের কেতাদুরস্ত দর্শন।'

কার-এর টুকরো মন্তব্যে লেভি-স্ট্রাউস বিষয়ে বেশ কিছু কথা আছে, বিশেষ করে 'ল মঁদ'-এ তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে। এই সাক্ষাৎকারের শীর্ষকটি কার-এর ঘোর সন্দেহকে সুনিশ্চিত করে বলে মনে হয়: 'মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট ও সর্বগ্রাসী ভাবাদর্শ ইতিহাসের চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়।'[২২]

কার-এর সুদূরপ্রসারী সমালোচনা ও সব মিলিয়ে ইতিহাস-চর্চার অবস্থা সম্বন্ধে নঞর্থক মূল্যায়নের সঙ্গেই আছে ইতিহাসবিদ্যার পক্ষে তার নিজস্ব অধিকারবলেই গুরুত্বলাভ সম্পর্কে ইতিবাচক মতঘোষণা। তিনি জানান, 'সাধারণ ইতিহাসে'র প্রয়োজন আছে, যে-ইতিহাস আইনী, সামরিক, জনতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য শাখার ইতিহাসকে একত্র করবে ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করবে। একইভাবে তিনি জোর দেন যে, ইতিহাস তো শুধু সমাজবিজ্ঞানের অনুচর নয় যে সেটি ঐসব বিজ্ঞানের কাছে তার তত্ত্বের জন্যে যাবে ও সেগুলোকে উপাদান জোগাবে :

'আমি স্বীকার করি যে বর্তমানের অনেক ঐতিহাসিকই মৃত কারণ তাঁদের কোনো তত্ত্ব নেই। কিন্তু তাঁদের যে-তত্ত্বের অভাব তা হলো ইতিহাসের তত্ত্ব, বাইরে থেকে জোগান দেওয়া কিছু নয়। দরকার পড়ে এক দ্বিমুখী চলাচলের

আর্থনীতিক, জনতাত্ত্বিক, সামরিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ঐতিহাসিককে শিখতেই হবে। কিন্তু অর্থনীতিবিদ, জনতত্ত্ববিদ ইত্যাদিও মারা পড়বেন যদি না তাঁরা একটি বিস্তৃত ঐতিহাসিক

বিন্যাসের মধ্যে কাজ করেন, আর তা জোগান দিতে পারেন একমাত্র 'সাধারণ' ঐতিহাসিকই। সমস্যা এই . যে ইতিহাসের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিগতভাবেই পরিবর্তনের তত্ত্ব আর আমরা যে-সমাজে বাস করি তা একটি সুস্থিত ঐতিহাসিক ভারসাম্যে শুধু গৌণ বা 'বিশেষীকৃত' পরিবর্তনই চায় বা অনিচ্ছা সহকারে মেনে নেয়।'

কিন্তু কার অবশ্যই বিশ্বাস করতেন যে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল; এবং ১৯৭০-এর দশকে ব্রিটেনে সংখ্যালঘু র‍্যাডিক্যাল বা বিক্ষুব্ধ ঐতিহাসিকরা ছাড়া আর কেউ তাঁর পরামর্শকে স্বাগত জানাবে বলে তিনি আশাও করতেন না:

'যে-সমাজ বর্তমান সম্বন্ধে বিভ্রান্তিতে ভরপুর ও ভবিষ্যতে আস্থা হারিয়েছে, তার কাছে অতীতের ইতিহাস মনে হবে সম্পর্কহীন নানা ঘটনার অর্থহীন জগাখিচুড়ি। যদি আমাদের সমাজ বর্তমানের ওপর প্রভুত্ব ও তার ভবিষ্যতের জন্য মনন্দৃষ্টি ফিরে পায়, তাহলে ঐ একই প্রক্রিয়ার জোরে সেটি অতীত সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করতে পারবে।'

এই অংশটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৪-এ, ব্রিটেনে রক্ষণশীল মতবাদ ও রক্ষণশীল ভবিষ্যতে নতুন আস্থার অভ্যুত্থানের কয়েক বছর আগে। সেই থেকে, ও কার-এর মৃত্যুর পর থেকে ভবিষ্যতে আস্থার অভাব ও সেই সঙ্গে আগেই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের যে-গোঁড়ামি প্রচলিত ছিল সেই প্রয়োগবাদের একটি বিকল্প বেরিয়ে এসেছে। ইতিহাস সংক্রান্ত শিক্ষাক্রমের কেন্দ্রে স্বদেশপ্রেমিক ব্রিটিশ ইতিহাসকে পুনঃস্থাপন করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে লক্ষণীয় চেষ্টা করেছেন ব্রিটিশ রাজনীতিক ও ঐতিহাসিকরা। সার কিথ জোসেফ যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি স্কুলে ব্রিটিশ ইতিহাসে বেশি ও বিশ্ব-ইতিহাসে কম মনোযোগ দিতে বলেছিলেন; তাঁকে সমর্থন করেন লর্ড হিউ টমাস। আধুনিক ইতিহাসের রিজিয়স অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপক জি আর এল্টন তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় কেমব্রিজ-এ স্নাতক পর্যায়ের ইতিহাস পড়ানোয় সমাজবিজ্ঞানের ক্ষতিকর প্রভাবকে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইংল্যান্ডের ইতিহাস-চর্চা বিষয়টির ইতিহাসের ট্রাইপোজ-এ একটি মুখ্য স্থান পাওয়া উচিত। 'এই সমাজ যেভাবে ক্ষমতাকে সভ্য রূপ দিতে পেরেছে ও যেভাবে অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজের শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে' তা দেখাবে ইংল্যান্ডের ইতিহাস; 'মিথ্যা বিশ্বাস ও অবিরাম নতুনত্বের ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের হাতে জর্জরিত এই অনিশ্চয়তার যুগের পক্ষে তার

নিজের শিকড় জানা প্রচণ্ড দরকার।'[২৩] এইসব ঘটনা কার-এর কাছে একটি অসুস্থ সমাজের লক্ষণ বলে মনে হতো ; যে-সমাজ গৌরবজনক অতীতের স্মৃতিতে আরাম খুঁজতে চায়। সেইসঙ্গে ঐতিহাসিকরা যে সমাজের প্রচলিত নানা ধারাকে কতখানি প্রতিফলিত করেন চোখে-পড়ার মতো তার একটি উদাহরণ জোগায় এইসব ঘটনা।

কার-এর ইচ্ছে ছিল 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এর নতুন সংস্করণটি ইতিহাস-চর্চার সঙ্কটকে বিচার করবে আমাদের সময়ের সামাজিক ও মননগত সঙ্কটের বিস্তৃত প্রসঙ্গসূত্রে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে কাগজপত্র জড়ো করেছিলেন। সেগুলো তাঁর মূল বক্তৃতামালায় আলাদা বিষয় হিসেবে আলোচনা করা হয় নি। সাহিত্য এবং সাহিত্য-ও শিল্প-সমালোচনা এই দু ব্যাপারেই নানারকম টুকরো লেখা ঐ কাগজপত্রের মধ্যে আছে। কাজটি রয়েছে খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে। তাঁর যুক্তির সূত্রটি এই: ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মতোই সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয় বা রূপ নেয়। তাঁর টুকরো লেখা থেকে দুটি পরস্পরবিপরীত উদ্ধৃতি চোখের সামনে হাজির হয়। 'সব শিল্পই প্রচার'[২৪] অরওয়েল এই ঘোষণা করলেও মার্ক্স — যিনি নিজে শিল্পের ওপর সমাজের প্রভাব সম্পর্কে অনেক মন্তব্য রেখে গেছেন — তাঁর 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পর্যালোচনা'-র ভূমিকায় সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'শিল্পের ক্ষেত্রে এটি সুবিদিত যে তার কিছু উচ্চতম পর্যায়ে সমাজের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে তা কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না বা সেই কারণে বস্তুগত কাঠামোর সঙ্গেও সেগুলো খাপ খায় না ; এগুলো যেন তার গড়নের কঙ্কাল'।[২৫]

মার্ক্স যে-ব্যতিক্রমের কথা বলেছেন, কার-এর বিচারে বিশ শতকের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এই শতকের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য নৈরাশ্যবাদ,

নিষ্ক্রিয়তা ও আশাহীনতা। তাঁর কাছে হার্ডি ছিলেন 'এমন এক জগতের ঔপন্যাসিক যার কোনো অর্থ নেই, যেটি মূলত গোলমেলে, এই নয় যে এটি বিপথে গেছে বা ঠিক করা যাবে, বরঞ্চ সময়হীনতা, ভ্রান্তি ও অর্থহীনতার এক জগৎ — অতএব এক নির্বিকল্প নৈরাশ্যবাদ'। এ ই হাউজ্‌ম্যান মন্তব্য করেন যে 'কিছুটা অসুস্থ না হলে কবিতা লিখি নি বললেই হয়', [২৬] আর টি এস এলিঅট সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, 'আমার মনে হয় আমি ঐ বাক্যটি বুঝি।' কার-এর সুতীক্ষ্ম মন্তব্য : 'দুজনেই "রুগ্‌ণ" কবিতা লিখেছেন, কেউই বিদ্রোহী নন।' কার-এর টুকরো লেখায় এলিঅট থেকে একসারি উদ্‌ধৃতি তাঁর আশার অভাব ও নৈরাশ্যবাদের দৃষ্টান্ত হাজির করে। শেক্‌স্‌পিয়র-এর ৯৮ নং সনেটটি যেখানে এপ্রিলের জন্য উল্লাস, তখন এলিঅট-এর 'পোড়ো জমি' (দ ওয়েস্ট ল্যান্ড) এপ্রিলকে দেখে নিষ্ঠুরতম মাস হিসেবে। ১৯২০-তে লেখা "জরায়ন" (জেরনশন)-এ এলিঅট অভিযোগ করেন, 'ইতিহাস প্রবঞ্চক উচ্চাশাব চক্রান্ত গুঞ্জনে দম্ভের ছলায় করে নিয়ন্ত্রণ আমাদের'। [২৭] 'পোড়ো জমি' লন্ডন সেতু পার-হওয়া শ্রমিক জনতাকে মৃত হিসেবে গণ্য করে, আর ওয়াইন্ডহ্যাম লিউইস লেখেন 'আধ-মরা মানুষ'দের সম্বন্ধে যারা নিশ্চিহ্ন হলে কিছু আসে-যাবে না। [২৮] ব্যর্থতার প্রবক্তা কাফ্‌কা তাঁর শেষ জবানিতে নিজের লেখাপত্র ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছিলেন — এও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের পৃথিবী, কাফ্‌কা একবার বলেছিলেন, 'ঈশ্বরেব অন্যতম বদমেজাজ', আমাদের পৃথিবীর বাইরে 'ঈশ্বরের জন্যে ছিল অনেক আশা ... নেই শুধু আমাদের জন্যে'। [২৯] এমনকি অরওয়েল-ও, কার-এর কথা অনুযায়ী, 'শেষ পর্যন্ত এলিঅট-এর মতো একই অবস্থায় এসে পৌঁছন, মানবজাতি সম্বন্ধে হতাশা, বিশেষভাবে নিম্নতর শ্রেণীর প্রতি বিতৃষ্ণার রূপে — এক ধরনের শিরোমণিতন্ত্র'। দুটি আধুনিক ধ্রুপদী রচনা, কাভাফি-র কবিতা "বর্বরদের প্রতীক্ষায়" ও বেকেট-এর 'গোদো-র প্রতীক্ষায়'— দুটির নামেই তাৎপর্যপূর্ণ মিল ; আর এই দুটিই হাজির করে 'অসহার প্রত্যাশী নিষ্ক্রিয়তা'। হেরমান হেস্‌সে-অর্চনা এমন এক লেখককে

নন্দিত করে যিনি, কার-এর ভাষায়, 'এমন এক জগৎ থেকে আসা একজন স্বসংবেদনবাদী শরণার্থী যে যে-জগতে তিনি আর আস্থা রাখেন না'।

আরও কিছু টুকরো মন্তব্যে বিশ শতকের সাহিত্য-সমালোচনাকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। 'এক শ্রেণীর অনাগ্রহী বুদ্ধিজীবী যাঁদের নিয়ে সমাজের পরিশীলিত রূপটি গঠিত ও যাঁরা সমাজের উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে থাকেন' ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর এই দৃষ্টি আবার জাগিয়ে তোলেন এফ আর লীভিস। নতুন সাহিত্য সমালোচনা 'শুরু হয় আই এ রিচার্ডস-কে দিয়ে, যিনি সাহিত্যে বিষয়নিষ্ঠ (বৈজ্ঞানিক) ও বিষয়ীনিষ্ঠ (আবেগজাত) উপাদানের মধ্যে তফাত করেন'। তাঁর উত্তরসূরিরা 'ব্যুৎপত্তি বা প্রসঙ্গ সংক্রান্ত সব প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে পাঠের বিষয়নিষ্ঠ মানদণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে সাহিত্য-সমালোচককে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের সঙ্গে সমান করার চেষ্টা করেছেন'। ঘটনার এইসব বিকাশ সম্বন্ধে কার-এর মন্তব্য :

'১৯৩০, ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকের আঙ্গিকবাদীরা এবং ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের গঠনমূলবাদীরা সাহিত্যকে একটি 'বিশুদ্ধ' সত্তা হিসেবে বিচ্ছিন্ন করতে চান, যে-সত্তা অন্য কোনো বাস্তবতায় কলুষিত না-হয়ে ভাষার সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

'কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার মূল সম্পূর্ণতই সাহিত্যের মধ্যে প্রোথিত হতে পারে না, কারণ সমালোচক নিজেই থাকেন সাহিত্যের বাইরে ও অন্যান্য জগৎ থেকে নানান উপদান নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন।'

আর 'ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন' (একটি অপনাম, কারণ দর্শন সম্বন্ধে প্রথাগত যে-ধারণা, এটি তার থেকে পালিয়ে যাওয়া) 'কলাকৈবল্যে'রই মতো, কোনো ধারণার প্রতি এর দায়বদ্ধতা নেই।[৩০] নীতিশাস্ত্র বা রাজনীতিতে এর কোনো প্রয়োগ নেই, ইতিহাসের দিকে এটি মন দেয় না; 'এমনকি শব্দের মানে যে পাল্টায় সেই ধারণাও গরহাজির'।

কার-এর ইচ্ছে ছিল: নতুন সংস্করণের শেষ ক'টি অধ্যায়ে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চল্‌তি নৈরাশ্যবাদের বিরোধিতা করে, মানুষের অতীত যে সব মিলিয়ে প্রগতির উপাখ্যান — এর ওপর আবার জোর দিয়ে কথা বলবেন এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আস্থা ঘোষণা করবেন। 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এ তিনি লক্ষ্য করেন যে, ইতিহাসকে প্রগতি হিসেবে দেখার যে-ভঙ্গি দীপায়ন পর্বের যুক্তিবাদীরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন,

তা সবচেয়ে বেশি প্রভাব অর্জন করে যখন ব্রিটিশ আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা ছিল তুঙ্গে। অনেক ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীকে অবশ্য প্রগতির প্রকল্প খারিজ করার দিকে নিয়ে যায় বিশ শতকে পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্কট। নতুন সংস্করণের টুকরো মন্তব্যে কার প্রগতির যুগের তিনটি দিক আলাদা করে দেখান: পৃথিবীর বিস্তার, যেটি শুরু হয়েছিল ১৪৯০ সালে; আর্থনীতিক বিকাশ, সম্ভবত ষোল শতক থেকে যার সূচনা; জ্ঞানের বিস্তার, ১৬০০ থেকে। পৃথিবীর বিস্তার সম্বন্ধে সচেতন এলিজাবেথীয় যুগ ছিল এই প্রগতির যুগের প্রথম দীপ্ত পর্যায়। মহত্তম হুইগ ঐতিহাসিক মেকলে ইতিহাসকে চিত্রিত করেন এক বিজয়দীপ্ত প্রগতি হিসেবে, সংস্কার বিল-এ যার পরিণতি।[৩১] প্রগতি মূলত এক থেকে অন্য প্রজন্মে অর্জিত দক্ষতার সঞ্চারের ওপরেই নির্ভরশীল, ও তার উৎপত্তিও ঐ সঞ্চারের মাধ্যমেই — 'কাকে বলে ইতিহাস?'-এর নতুন সংস্করণে এ সম্বন্ধে চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয় থেকে আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করাই যে কার-এর উদ্দেশ্য ছিল সে-কথা তাঁর নানা টুকরো মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রগতি হিসেবে ইতিহাসে বিশ্বাস ক্রমেই বেশি করে কেতাবিরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মাঝেমাঝেই অকালে হতাশার অতলে ডুবে যাওয়া হয়েছে: ' 'মানবজাতির শেষ কয়েকদিন' (দ লাস্ট ডেজ অফ ম্যানকাইন্ড) নামে এক নাটকীয় উদ্ভট-রচনায় কার্ল ক্রাউস অস্ট্রো-হাঙ্গারীয় সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে মহোৎসব করেছিলেন।' কিন্তু বিশ শতক যত এগিয়েছে অতীতের প্রগতিতে সংশয় ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নৈরাশ্য তত বেশি শক্তিশালী ও আত্মঘোষী হয়ে উঠেছে। পপার, পঁচিশ বছর আগে যিনি 'আমাদের সময়ের ইতিহাস: জনৈক আশাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি' (দ হিস্ট্রি অফ আওয়ার টাইমস: অ্যান অপটিমিস্টস্ ভিউ) নামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনিই ১৯৭৯ সালে আর-একটি বক্তৃতা দেন ও তাতে মন্তব্য করেন, 'ঘটনা এই যে আমি প্রগতিতে বিশ্বাস করি না।'[৩২] কিছু

৩১ 'রচনাসমগ্র', ১৮৯৮, খণ্ড ১১, পৃ ৪৫৬-৮ এবং তুলনীয় পৃ ৪৮৯-৯১; কিন্তু কার এও প্রশ্ন করেন যে 'নিউজ়িল্যান্ড-এর অধিবাসী সম্পর্কে মেকলে-র মননদৃষ্টি ("রাঙ্কে-র পোপেদের ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ") কি প্রগতিতে বিশ্বাসের পরিপন্থী? মেকলে কল্পনা করেছিলেন, নিউজ়িল্যান্ড-এর এক ভাবী অধিবাসী সেন্ট পল-এর ধ্বংসের ছবি আঁকার জন্য লন্ডন সেতুর একটি ভাঙা অংশের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ঐ একই অনুচ্ছেদে তিনি নতুন পৃথিবীর ভাবী মহত্ত্বের উল্লেখ করেন' (মেকলে-র 'প্রবন্ধাবলি' (এসেজ), এইচ ট্রেভর-রোপর নির্বাচিত ও তাঁর ভূমিকা-সম্বলিত,

ঐতিহাসিকের কাছে প্রগতির ধারণা একটি বাতিল ঠাট্টা লেফেভ্‌র সম্বন্ধে রিচার্ড কব লেখেন যে, 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরলপ্রকৃতির মানুষ, প্রগতিকে বিশ্বাস করতেন'।[৩৩]

অতীতের মানবিক প্রগতি ও 'অতীতকে বোঝার ... সঙ্গেই থাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি বর্ধিত অন্তর্দৃষ্টি' — এই দু-এতেই বিশ্বাস করতেন কার। অতএব, তিনি হব্‌স্‌-এর সঙ্গে একমত হন যে 'অতীত সম্পর্কে আমাদের ধারণা থেকেই আমরা তৈরি করি ভবিষ্যৎ'।[৩৪] কিন্তু তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য যোগ করেন যে 'উল্টোটাও সমানভাবে সত্যি হতে পারে' : ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের মননদৃষ্টি প্রভাবিত করে অতীত সম্পর্কে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে। 'প্রকৃত উৎপত্তি আরম্ভে হয় না, হয় শেষে'[৩৫] — এই দিয়ে এর্নস্ট ব্লখ তাঁর 'আশার নীতি' (ডাস প্রিনৎসিপ হফনুং) বইটি শেষ করেন। এর মধ্যে আপ্তবাক্যের শক্তি ছিল।

সংশয় ও হতাশার সময়ে কার মনে করেছিলেন, অতীত সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মননদৃষ্টিকে পরীক্ষা করা ও স্থির করে নেওয়াটা ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। গত চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি বলে এসেছেন, কল্পরাজ্য ও বাস্তবতা — এই দুটি হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অত্যাবশ্যক প্রতিপার্শ্ব এবং 'সুস্থিত রাজনীতির চিন্তা ও সুস্থিত রাজনীতির জীবন পাওয়া যাবে একমাত্র সেখানে যেখানে এই দুটিরই স্থান আছে।'[৩৬] মধ্যবর্তী বছরগুলোয় তিনি কঠোর বাস্তববাদী রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকবছর আগে কার যে আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণা রচনা করেন, তাতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : 'আজ পৃথিবী বোধহয় অনাস্থাবাদী ও কল্পরাজ্যবাদীদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম মতের লোকে কোনো কিছুরই অর্থ খুঁজে পায় না আর দ্বিতীয়রা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো অসাধারণ সুন্দর অনির্ণেয় অনুমানের ভিত্তিতে সব ব্যাপারের অর্থ খাড়া করে। আমি দ্বিতীয় মতের লোকেদেরই পছন্দ করি।' কার-এর কাগজপত্রের মধ্যে 'আশা' নামে একটি প্রক্ষিপ্ত লেখায় মন্তব্য করা হয়েছে : 'কল্পরাজ্যের কাজ হলো দিবাস্বপ্নকে মুক্ত করা

... কল্পরাজ্য ব্যক্তিকে সর্বজনীন আগ্রহের সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। অলস (অপ্রণোদিত) আশাবাদের থেকে পৃথক সত্যিকারের কল্পরাজ্য।'

কার-এর মতে, বনেদি ব্রিটিশ পুঁজিবাদের দুই মহান ছাত্র, অ্যাডাম স্মিথ ও কার্ল মার্কস – দুজনেই সমাজের প্রতি এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিকে যুক্ত করেছিলেন এক অন্তর্নিহিত কল্পরাজ্যের সঙ্গে :

'এ স্মিথ, যিনি 'আধুনিক মানসিকতার তত্ত্ব' (থিওরি অফ মডার্ন সেন্টিমেন্ট্স্) লিখেছিলেন, তিনি 'জাতিসমূহের সম্পদ' (ওয়েল্থ্ অফ নেশনস্)-এ 'বিনিময় ও লেনদেনে'র প্রবণতাকে মানবিক কার্যকলাপের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন।

এ ছিল প্রতিভাবানের অন্তর্দৃষ্টি, ঠিক মানব-স্বভাবের মধ্যে নয়, কিন্তু সমাজের চরিত্রের মধ্যে, যে-সমাজ পশ্চিম ইওরোপে (ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) বিকশিত হতে চলেছিল; আর সেই অর্থে এটি সেই বিকাশকে এগিয়ে দিয়েছে।

পুঁজিবাদের মধ্যে যে-শোষণের মাত্রা যুক্ত তা সহ্য করতে শ্রমিকরা অস্বীকার করবে ও সেই অস্বীকৃতির ভারে পুঁজিবাদ ধ্বসে পড়বে — মার্কস-এর এই অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধেও কথাটা সত্য।

কিন্তু স্মিথ-এর অদৃশ্য হাতের জগৎ সংক্রান্ত কল্পরাজ্য ও মার্কস-এর সর্বহারার একনায়কত্ব — যে মুহূর্তে এদের ব্যবহারিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা যায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের উল্টো দিকগুলো বেরিয়ে আসে।'

অনেক আগে, ১৯৩৩-এই মার্কসকে কার উল্লেখ করেছিলেন এই বলে যে 'উনিশ শতকের সবচেয়ে বেশি দূরদর্শী প্রতিভা ও ইতিহাসের সফলতম প্রবক্তাদের একজন রূপে গণ্য হওয়ার দাবি'[৩৭] তাঁর আছে। 'মার্কসবাদ ও ইতিহাস' এবং 'মার্কসবাদ ও ভবিষ্যৎ' সংক্রান্ত তাঁর কাগজপত্রে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও তাঁদের প্রধান অনুগামীদের থেকে অনেক নোট করা আছে। এর থেকে স্পষ্ট যে, মার্কস ও মার্কসবাদ সম্বন্ধে একটি সযত্ন প্রণিধানকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর সাম্প্রতিক লেখাপত্রের বেশ কয়েকটিতে তিনি এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বলেন যে, তাঁর বন্ধু হার্বার্ট মার্কিউজ-এর মতো, তাঁরও বিশ্বাস : 'আজকের পশ্চিমে সর্বহারা — অর্থাৎ শিল্পে

৩৭ 'ফোর্টনাইটলি রিভিউ', মার্চ ১৯৩৩, পৃ ৩১৯।

সংগঠিত শ্রমিকরা, মার্কস শব্দটি দিয়ে যা বোঝাতে চাইতেন — বিপ্লবী নয়, হয়তো বা এমনকি প্রতিবিপ্লবী শক্তি।'[৩৮] তিনি লক্ষ্য করেন, সর্বহারার শাসন করার অক্ষমতা সংক্রান্ত সংশয়বাদের পরিণাম দাঁড়িয়েছিল 'ট্রট্স্কি-র শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যবাদে মাথা গোঁজা,'[৩৯] আর মার্কিউজ্-এর নৈরাশ্যবাদের ভেতর রয়েছে সর্বহারা সম্পর্কে এক নেতিবাচক হিসেবনিকেশ :

> 'যুক্তি ও বিপ্লব' (রিজ়ন অ্যান্ড রেভলিউশন)। নেতিকরণের ক্ষমতা সর্বহারার মধ্যেই নিহিত।
>
> নিপীড়নকারী সমাজ থেকে স্ব-ব্যক্তিত্বের মুক্তিতে আগ্রহী — ফ্রয়েড।
>
> (মার্কিউজ-এর) 'প্রেমপ্রকৃতি ও সভ্যতা' (এরস অ্যান্ড সিভিলাইজ়েশন)-এ নিপীড়নহীন সমাজ সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বহারার ক্ষমতা সম্বন্ধে সংশয়।
>
> 'সোভিয়েত মার্কসবাদ' (সোভিয়েত মার্কসিজ়ম)। রুশ সর্বহারার পক্ষে নিপীড়নহীন সমাজ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা দেখিয়ে দিয়েছে সোভিয়েত ইতিহাস — উন্নত দেশগুলোয় সর্বহারার ব্যর্থতাজনিত ব্যর্থতা।
>
> 'একমাত্রিক মানুষ' (ওয়ান-ডাইমেনশনাল ম্যান) দেখায় শিল্পভিত্তিক সমাজ সর্বহারাকে গ্রাস করে ফেলেছে, ফলে নীতিগতভাবে সমাজ অপরিবর্তনীয় হয়ে গেছে।
>
> পরিণাম হলো সম্পূর্ণ নৈরাশ্যবাদ — বাস্তব থেকে বামপন্থী তত্ত্বের বিযুক্তি : 'তত্ত্ব ও প্রয়োগ, চিন্তা ও কাজ মিলবে — এমন কোনো জায়গা নেই।'[৪০]

মার্কস সম্বন্ধে এই ধরনের সমালোচনা কার মোটের ওপর মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তেমন কোনো নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্ত টানেন নি। তাঁর জীবনীমূলক স্মৃতিচারণায় তিনি ঘোষণা করেন :

'পশ্চিমী সমাজ আজ যে ধরনের চেহারায় রয়েছে, পতন ও ক্ষয় ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনা আমি সত্যিই দেখতে পাই না। হয়তো এক নাটকীয়

বিনাশেই তার পরিণতি — যদিও তা অনিবার্য এমন নয়। আমার কিন্তু বিশ্বাস: এখানে বা অন্যত্র তলে তলে নতুন নতুন শক্তি ও আন্দোলনের অঙ্কুর গজাচ্ছে যেগুলোর চেহারা আমরা এখনও অনুমান করতে পারি না। এটাই আমরা অনির্ণেয় কল্পরাজ্য ... আমার মনে হয়, এটিকে 'সমাজবাদী' বলা উচিত, ও এই পর্যন্ত আমি মার্কসবাদী। কিন্তু কতগুলো কল্পরাজ্যবাদী শব্দগুচ্ছ ছাড়া মার্কস সমাজবাদের মর্মবস্তু স্থির করে দেন নি ; আর আমিও তা পারি না।'

তাহলে কার নিজে কীভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ও ক্ষয়ের হিসেবনিকেশ করেছিলেন ; কোন্ কোন্ 'নতুন শক্তি ও আন্দোলন'কে তিনি সনাক্ত করেছিলেন ? তাঁর টুকরো মন্তব্যের মধ্যে 'মার্কসবাদ ও ইতিহাস' নামে এক না-ছাঁকা খসড়ায় তাঁর উত্তরের অংশবিশেষ পাওয়া যায়। মনে হয়, ১৯৭০ নাগাদ এটি লেখা হয়েছিল। যদিও এটি অসম্পূর্ণ ও প্রকাশ করার আগে নিশ্চয়ই বেশ খাকিটা সংশোধিত হতো, তাহলেও এর থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কার-এর দৃষ্টিভঙ্গির মর্মটি পাওয়া যায় :

'অতএব, গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর চেহারা এতই পাল্টে গেছে যে তাকে আর চেনাই যায় না। পশ্চিম-ইওরোপীয় শক্তিগুলোর প্রাক্তন সব উপনিবেশ — ভারত, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া — তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা কায়েম করেছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে বিপ্লবের পথ গ্রহণ করেছে শুধু মেক্সিকো ও কিউবা ; কিন্তু অন্যত্র আর্থনীতিক বিকাশ পূর্ণতর স্বাধীনতার পথ দেখাচ্ছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র — প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্য — এবং আরও সাম্প্রতিককালে বিশ্বশক্তি ও বিশ্বগুরুত্বের অবস্থানে চীনের উত্থানই এই পর্যায়ের সবচেয়ে দর্শনীয় ঘটনা। এইসব পরিবর্তনের ফলে তৈরি হয়েছে এক অনিশ্চয়তার বোধ — যার পরিণাম এখনও ভবিষ্যতে নিহিত — এবং উনিশ-শতকীয় বিশ্ববিন্যাসের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা তীব্র বিপরীতধর্মী। অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার এই পরিবেশ থেকেই নতুন সমাজ সম্পর্কে সাম্প্রতিক মননদৃষ্টির জন্ম।

'রুশ বিপ্লব এবং তার পরে চীন ও কিউবার বিপ্লব কার্ল মার্কস-এর শিক্ষাকে ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিল — এই ঘটনাটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ-শতকী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষয় ও পতনের সবচেয়ে শক্তিশালী ভবিষ্যদ্‌বক্তা ছিলেন মার্কস। যে-পর্যায়ে তিনি লিখেছিলেন, এই ব্যবস্থা কিন্তু তখনও তার মধ্যগগনে। যাঁরা এই ব্যবস্থাকে চ্যালেন্‌জ্ জানাতে চান ও তার পতনে উল্লসিত হন তাঁরা যে মার্কস-এর অধিষ্ঠিত মর্যাদার শরণ নেবেন — তা স্বাভাবিক। আর এও স্বাভাবিক যে

উনিশ-শতকী পুঁজিবাদকে পালটানোর জন্য নতুন সমাজের মননদৃষ্টি মার্কসবাদ থেকে প্রেরণা নেবে। এইসব মননদৃষ্টি অবধারিতভাবেই কিছুটা কল্পরাজ্যবাদী; ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে মার্কস-এর লেখাপত্র নামমাত্র, এবং তার ধরন প্রায়ই কল্পরাজ্যবাদী। তাঁর কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ বা কাজের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এর মধ্যেই দেখা দিয়েছে বাদানুবাদ ও বিভ্রান্তি। কিন্তু মার্কস-এর বিশ্লেষণের ক্ষমতা অনস্বীকার্য; আর ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে যে-কোনো ছবিই — তা যতই কল্পনাভিত্তিক হোক — আঁকা যাক না কেন, তার মধ্যে মার্কসীয় ধ্যানধারণার বড় রকমের মিশেল থাকবেই।

'উৎপাদনশীলতা, উচ্চতম ধরনের উৎপাদনশীলতার পথ হিসেবে শিল্পায়ন এবং সবচেয়ে উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে আধুনিকীকরণের প্রবক্তা ছিলেন মার্কস। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' থেকে শুরু করে তাঁর সব লেখাপত্র পুঁজিবাদের কৃতিত্ব নিয়ে স্তুতিতে ভরা, যে-পুঁজিবাদ উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে মুক্ত করেছিল সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে আধুনিক, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত, প্রসার্যমাণ এক অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু মার্কস-এর নিজের বিশ্বাস ছিল, তিনি দেখিয়েছেন মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া পুঁজিবাদ তার ঐ সাফল্যের মাধ্যমেই নতুন নতুন শৃঙ্খল ঢালাই করছে যেগুলি উৎপাদনের পরবর্তী বিস্তারকে স্তব্ধ করে দেবে এবং বুর্জোয়া পুঁজিবাদীর হাত থেকে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় নিয়ে আসবে শ্রমিকদের নিজেদেরই একধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। একমাত্র এইভাবেই উৎপাদনের বিস্তারকে রক্ষা ও নিবিড় করে তোলা যাবে। ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে মার্কস যে অল্প কয়েকটি ছবি উপহার দিয়েছেন তার একটি হলো সেখানে 'সম্পদের উৎসধারা আরও অপর্যাপ্তভাবে প্রবাহিত হবে'।

'যে-পৃথিবীতে জনগণের বিশাল অংশ আধুনিক সভ্যতার এমনকি সবচেয়ে বুনিয়াদি বস্তুগত সুযোগসুবিধে পর্যন্ত এখনও অবধি ভোগ করতে পারে না, সেখানে একটি নতুন সমাজের জনপ্রিয় মননদৃষ্টি যে এইসব মতবাদের মাধ্যমে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। উন্নত দেশগুলোয়, যেখানকার মানুষ অতীতে বুর্জোয়া পুঁজিবাদের বিশাল সব কৃতিত্ব ভোগ করেছে, এবং যাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এই ব্যবস্থার অন্তঃক্ষমতা এখনই শেষ হয়ে গেছে — সেখানে নয়, বরঞ্চ মার্কস-এর নানান মতবাদ তাদের সবচেয়ে বেশি প্রত্যয়ী আবেদন রেখেছে পিছিয়ে পড়া

দেশগুলোয়, যেখানে বুর্জোয়া পুঁজিবাদ আসে নি, নয়তো এসেছে একটি আগন্তুক ও প্রধানত নিপীড়নকারী শক্তি হিসেবে। এ ব্যাপারেও আশ্চর্যের কিছু নেই (যদিও, মার্কস যা আশা করেছিলেন এটি তার বিপরীত)। রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয় একটি প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশে, যেখানে অর্থনীতি ও সমাজের বুর্জোয়া পুঁজিবাদী রূপান্তর সবে শুরু হয়েছিল। এর প্রথম কাজ, লেনিন বলেছিলেন, সমাজবাদী বিপ্লবে প্রবাহিত হওয়ার আগে 'বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ করা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে এমন সব দেশে যেখানে এমনকি বুর্জোয়া বিপ্লব শুরুই হয় নি। ভবিষ্যৎ সমাজ, যেটি বর্তমানে বাতিল-হওয়া বুর্জোয়া পুঁজিবাদী বিপ্লবকে অতিক্রম করে অর্জন করবে উৎপাদনের ওপর এক ধরনের সামাজিক ও পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনীতির শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ এবং তার সঙ্গে সহযোগী উচ্চতর উৎপাদন — তার মননদৃষ্টি আজ পশ্চিমী ইওরোপীয় জাতিগুলির প্রভাবক্ষেত্রের বাইরে সারা পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে।'

কার এর সঙ্গে যোগ করেন যে 'এই মননদৃষ্টির রাজনৈতিক দিক কিন্তু অস্বচ্ছ ও আলেয়ার মতো, মার্কসবাদ সেখানে বিশেষ সাহায্য করে না। রাশিয়ায় সর্বহারার সংখ্যা ছিল অল্প ও সেখানে শ্রমিকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সমাজের ধারণা খুব একটা প্রাসঙ্গিক ছিল না; কম উন্নত দেশগুলোয়, যেখানে সর্বহারার অস্তিত্ব নেই সেখানে এর কোনো প্রাসঙ্গিকতার কথা আদৌ আসে না।' এসব সত্ত্বেও এই দেশগুলোর বিপ্লব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে শেষ করে দিতে পারে ও কার-এর 'অনির্ণেয় কল্পরাজ্য' অর্জন করার সম্ভাবনা জোগাতে পারে:

'আমার মনে হয় আমাদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই প্রকল্পটিকে বিবেচনা করতে হবে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮-এ তিনি বলেন যে, বিশ্ববিপ্লব, যার প্রথম পর্যায় ছিল বলশেভিক বিপ্লব ও যেটি পুঁজিবাদের পতনকে সম্পূর্ণ করবে তা আসলে হয়ে দাঁড়াবে সাম্রাজ্যবাদের বেশধারী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশের জনগণের বিদ্রোহ।' [৪১]

নাম- ও বিষয়-সূচি

উ

এ

ঐ

ও

ক

গ

চ

জ

ট

ড

ত

থ

দ

ন

প

ফ

ব

য

র

ল

শা

স

হ্